আমার সময়, আমার গল্প

বুদ্ধদেব গুহ

: প্রাপ্তিস্থান :
কামিনী প্রকাশালয়
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক ঃ
শ্যামাপদ সরকার
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন
কলিকাতা—৭০০৩০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৯

প্রচ্ছদ ঃ
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

মুদ্রক ঃ
শ্রীমথুর মোহন গাঁতাইত
কামিনী প্রিন্টার্স
১২, যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ
কলিকাতা—৭০০০০৬

সুমিতা রায়,
কল্যাণীয়াসু

প্রবেশ

বউদি, ফোন!

সরমা বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল।

বিরক্ত সুমি শাওয়ারের কলটা বন্ধ করে উৎকর্ণ হয়ে বলল, চান করার সময়ও একটু শান্তি নেই তোমাদের জন্যে। কে ফোন করেছে এই অসময়ে?

বীণাদিদি।

ও বীণাদিদি? ধরতে বলো, ধরতে বলো। আমি আসছি এক্ষুনি। বলেই, দরজার হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখা ছাড়া-হাউসকোটটাই জল-ভেজা নগ্ন শরীরে জড়িয়ে ভিজে বাথরুম স্লিপার পায়ে গলিয়ে বাথরুমের দরজা খুলে প্রায় দৌড়ে এল ড্রাইংরুমে।

অনেকদিনের পুরোনো কাজের লোক সরমা বলল, আস্তে, আস্তে। পড়ে যাবে যে!

তারপরই বলল, দেখেছ। সারা ঘর জলময় করে দিলে গো। কার্পেটটাও ভিজিয়ে দিলে। নিজেই আছাড় খেয়ে মরবে যে! ফেরার পথে।

সুমি ফোনের কাছে পৌঁছোতে পৌঁছোতে সরমা বাথরুমের দরজা থেকে বেডরুম, বেডরুম থেকে ড্রয়িংরুমের সুমির ভিজে গা-গড়ানো জল মুছতে লাগল বিড় বিড় করতে করতে।

হ্যালো। বীণাদি? বলো, আমি সুমি।

ওপাশ থেকে কী বলা হল তা সরমা শুনতে পেল না। তবে লক্ষ করল যে, সুমিতার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

দেখা হয়েছিল? কী বললেন? সত্যি? আমি ভাবতেই পারছি না। ... কবে? ... এই শনিবার? না না অশেষ তো বলছিল সুমন ইতিমধ্যেই নেমন্তন্ন খাইয়ে দিয়েছে। ... বাঃ ... না কেন? অশেষের বন্ধু সুদীপের ছেলের জন্যে, আর কেন? সবিতাদির থ্রুতে আলাপ

হল, আর দ্যাখো কেমন ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেল। ... কী বলছ? হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি অশেষকে এক্ষুনি ফোন করছি। না না, আমাদের কোনো গাফিলতি হবে না। ওকে তো এখন দিনে দশঘণ্টা পড়াচ্ছি। তারপর মিস্টার হবসন-এর কাছে কোচিংও নিতে যাচ্ছে। ... হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি যাও। না, না কী যে বল। কোনোই অসুবিধা হয়নি আমার। চান তো এই পঁচিশ বছরে বহু হাজার বার করেছি, বেঁচে থাকলে আরও বহু হাজার বার করব। তুমি যা করলে বীণাদি, কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব, বলতে পারছি না। হ্যাঁ হ্যাঁ। অশেষকে বলব মেঘুদাকে ফোন করতে।

সুমিতার স্বামী একটি এককালীন ব্রিটিশ এবং অধুনা মাড়োয়ারি মালিকাধীন ফেরা-কোম্পানির বড়ো অফিসার। সে সবে লাঞ্চ রুমে ঢুকেছিল। এমন সময় তার পি. এস. মিস নাগবেকার দৌড়োতে দৌড়োতে এসে বলল, স্যার, ইটস ভেরি আর্জেন্ট। মিসেস বোস ইজ অন ইয়োর পার্সোনাল ফোন। প্লিজ টেক দ্যা কল। অশেষ কার্পেটের উপরে বসানো চেয়ার সজোরে ঠেলে উঠে দাঁড়াল।

কথা ক-টি বলেই, মিস নাগবেকার, মহিলা পি. এস-দের জন্যে নির্দিষ্ট লাঞ্চরুমের দিকে চলে গেলেন। এখন লাঞ্চ টাইম শুরু হয়ে গেছে। পি বি এক্সও বন্ধ।

চ্যাটার্জি টাইয়ের নট ঢিলে করতে করতে অশেষের দিকে চেয়ে বলল, তা-ও গার্ল-ফ্রেন্ডের ফোন হলে বোঝা যেত। বউয়ের ফোন পেয়ে এখনও এত দৌড়োদৌড়ি?

লাঞ্চ রুম থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে অশেষ বলল, —ব্যাপার আছে। এসে বলব।

সরমা বিরক্ত গলায় বলল, তোমার শরীরের আর চুল-গড়ানো জলে যে ঘর ভেসে গেল গো বউদি। কত আর নেই-কাজ করব আমি?

করো! করো! লক্ষ্মী সরমা! চাঁদুর বোধহয় হয়ে যাবে সেন্ট ফেজিয়ার্স-এ।

সেন্ট ফেজিয়ার্স কী গো?

আঃ। এখন বিরক্ত কোরো না। তোমার দাদা আসছেন ফোনে। বলেই, মুখ ঘুরিয়ে সরমাকে বলল, কাউকে বোলো না কিন্তু।

মুখ বিকৃত করে গুল-দেওয়া কেলে মাড়ি আর দাঁত বের করে সরমা বলল আমার বয়েই গেছে কাউকে বলতে। তাছাড়া, ছেন্টেরও আমি কিছু বুঝি না, ফেজিয়াসেরও নয়।

অশেষ হাঁপাচ্ছিল। একটু ভুঁড়ি হয়ে গেছে। খেলাধুলো সব গেছে, তার উপর নিত্যনৈমিত্তিক পার্টি তো লেগেই আছে। মালিকরা মদ সিগারেট ছোঁন না কিন্তু তাদের চাকরির এটা এখন অঙ্গ। উপরতলার সমাজে ঘোরা-ফেরা কাজ-কারবার করতে হলে মদ না খেলে চলে না। দেশ বদলে গেছে। সময় বদলে গেছে। এখন প্র্যাকটিক্যাল প্রাগম্যাটিক না হলে বেঁচে থাকা মুশকিল। এই নব্য নগরসভ্যতার র‍্যাট রেস্‌স-এ ওরা সকলেই শামিল হয়েছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে অশেষ বলল, বলো সুমি? বীণাদি ...কী বললে? হয়ে যাবে? সেন্ট

ফেজিয়ার্স এ? সত্যি? ও মাই! মাই। আই উইল গেট ড্রাংক টুনাইট। তুমি একটি সুইটি পাই ডার্লিং। আমি আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরব। চাঁদু কোথায়?

পড়ছে।

কী পড়ছে?

এখন সামস করছে।

ভেরি গুড। তুমি কী করছ?

চান করছিলাম।

আঃ ডার্লিং। যাও যাও ভালো করে চান করো আজকে। উই উইল বিট ইট আপ টুনাইট! ছাড়ছি! ...কী বলছ? কাউকে বলব না? চ্যাটার্জিকেও না? কেন? কী? ওর বোনপোও চেষ্টা করছে? সেন্ট ফেজিয়ার্সেই? মাই গুডনেস। থ্রু দ্যা সেম সোর্স? সত্যি! ভাগ্যিস বললে। না না। পাগল। আর বলি!

ফোন ছেড়ে দিয়ে লিফটের বোতাম টিপল অশেষ। ফোন ধরতে আসার সময় উত্তেজনায় লিফট ডাকার জন্যে অপেক্ষা করার তর সয়নি।

লাঞ্চ রুমে ততক্ষণে অনেকে এসে গেলেন। মকবুল বেয়ারা স্যুপও সার্ভ করে দিয়েছে। চ্যাটার্জি উলটোদিকের চেয়ারে বসেছিল। স্যুপ-স্পুন দিয়ে স্যুপ মুখে তুলে বলল, হলটা কী?

অশেষ বলল, চ্যাটার্জির চোখে চোখ রেখে ডাহা মিথ্যে কথা · তেমন কিছু নয়। না। সুমিতার এক ফারস্ট কাজিনের ফারস্ট প্রেগনান্সি। বেলভিউতে অ্যাডমিশন নিয়েছিল। এক্ষুনি খবর এসেছে যে, ছেলে হয়েছে।

ওঃ। চ্যাটার্জি বলল। তারপর বলল, বাপ-মায়ের অশান্তির শুরু হল। আই রিয়্যালি পিটি দ্যা প্যারেন্টস।

কেন? এ আবার কী কথা?

বাঃ। ছেলে হতে আর কী মুশকিল। ইজিয়েস্ট ব্যাপারই তো সেটা। এই মুহূর্ত থেকে স্কুলের অ্যাডমিশান নিয়ে ভেবে মাথার চুল পেকে যাবে। আমার একবছরের বড়ো দাদার বিয়ে হয়েছে দশ বছর। নিউ আলিপুরে থাকে। কোনো ইস্যুই হল না এই ভয়ে চার বছর। পাঁচ বছরের মাথায় প্রিন্স অফ ওয়েলস এলেন কিন্তু তাকে এখন স্কুলে ভরতি করতে জুলপি পেকে গেছে। শুধু তার নয়, আমাদের সকলেরই। দেখি, একটি সোর্স আছে, তাকে ধরেছি। তোমার ছেলের কী হল? হল কিছু?

নাঃ। স্কুলে ভরতি করার কোনো সোর্স না থাকলে ছেলেমেয়েকে পৃথিবীতে এনে ভাসিয়ে দিয়ে লাভই বা কী?

আমার দাদা-বউদিও তো তাই বলে।

কথাটা ভুল বলে না। সকলেই তো ভাই তোমার মতো ওয়েল-অফ নয় যে, ছেলেকে ডুন-স্কুল বা আজমিঢ়ে বা গোয়ালিয়রে পাঠাবে? সকলের শ্বশুরমশাই তো আর ইন্ড্রাস্ট্রিয়ালিস্ট নয়।

যোগেশদা মানে যোগেশ ঘোষ, চিফ্-এঞ্জিনিয়ার, পুব-বাংলার কোথায় যেন বাড়ি ছিল, খ্যাঁক করে হেসে উঠলেন বিদ্রুপের গলায়।

হাসছেন যে?

চ্যাটার্জি ও অশেষ দুজনেই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল।

তোমরা, ভাইডিরা কোন্ ইস্কুলে পড়ছিলা?

অশেষ এবং চ্যাটার্জি মুখ চাওয়াচাওয়ি করল একবার। অশেষ বলল, দ্যাটস ইরেলিভ্যান্ট। আমাদের সময় আর এখনকার সময় এক নয়।

ক্যান, আমাগো পোলারা কি ল্যাজ লইয়া জন্মাইতেছে?

যোগেশদা সেই মুষ্টিমেয় বাঙালদের একজন যিনি আজও বাঙাল বলে গর্ব বোধ করেন। পুব বাংলার ভাষায় কথা বলেন। বলেন, যাই কও আর তাই কও "আইসেন বইস্যেন" কইলে যতডা ভালোবাসা ভালোবাসা গন্ধ পাওন যায় তোমাগো আসুন বসুনে তার ছিটাফোঁটাও নাই।

মানুষটি বহু বছর ইংল্যান্ডেও ছিলেন যৌবনে। ইংরেজি বলেন সাহেবদেরই মতো অথচ বাংলা বলবেন, ইচ্ছে করে এমন করে। ওরা বুঝতে পারে না বললে বলেন, হেইডাই তো ভাষা আমার। বাঙাল হইয়া করলুম খেলুম মরলুম জ্বললুম কইর‍্যা জাত খোওয়াইতে পারুম না। আমি হইতাছি গিয়্যা লাস্ট অফ দ্যা মোহিকানস। বোঝলা না।

অশেষ অথবা চ্যাটার্জির পাঁচ গ্রেড উপরে আছেন। ওঁর লেভেলের অন্য অফিসাররা অশেষদের লেভেলের অফিসারদের সঙ্গে মেলামেশা বিশেষ করেন না, অত্যন্ত ফর্ম্যাল হয়ে থাকেন। লোকে বলে আর এক বছরের মধ্যেই বোর্ডে যাবেন উনি। অথচ মানুষটা ,মন কাঠাখোট্টা বাঙালই রয়ে গেলেন। একটুও আধুনিক, অথবা সাহেব হতে পারলেন না। এখনও বাড়িতে লুঙ্গি পরেন, শুঁটকি মাছ খান; ভাবা যায় না।

চ্যাটার্জি বলল ল্যাজ নিয়ে জন্মায় না কিন্তু আজকালকার দিনকাল কত কম্পিটিটিভ। ভালো স্কুলিং না হলে জীবনে কোথায় হারিয়ে যাবে ছেলে তার ঠিক আছে? ইংলিশ-মিডিয়াম ভালো স্কুলে না পড়লে কি কমপিট করতে পারবে কারও সঙ্গেই? অমানুষই হয়ে থাকবে।

আমার প্রশ্নডার জবাব কিন্তু পাই নাই। তোমরা কিন্তু কও নাই এখনও আমারে তোমরা কোন স্কুলে পড়ছিলা।

চ্যাটার্জির বাড়ি বর্ধমান জেলার এক অজগ্রামে। বর্ধমানেরই একটি স্কুলে সে পড়াশুনা করেছিল। ছাত্র ভালো ছিল। তার বড়োমামার মেজশালার সলিসিটর ফার্মে ঢুকে ল এবং অ্যাটর্নিশিপ পাশ করেছিল কলকাতায় এসে। মির্জাপুরের অন্ধকার মেস-এ থাকত। ল পরীক্ষাতেও দ্বিতীয় হয়েছিল। এই কোম্পানির ও এখন ল অফিসার। চাকরিতে ঢুকে কোম্পানি-সেক্রেটারি হবে। হয়তো বছর পাঁচেক লাগবে আর। এবং তারপর বোর্ডে যাবে। আজ আ ম্যাটার অফ কোর্স। আর অশেষদের বাড়ি ছিল খুলনাতে। দেশভাগের

পর তার বাবা কলকাতায় ভবানীপুরে শালাদের বাড়ি এসে ওঠেন। ওঁরা কলকাতারই বাসিন্দা হয়েছিলেন দু পুরুষ হল। ছেলেবেলার সেই অসম্মানের দিনগুলোর কথা কখনও ভুলতে পারে না। মিত্র ইন্সটিটিউশনে জায়গা না পেয়ে সে ভর্তি হয়েছিল গিয়ে হারাধন ইন্সটিটিউশনে। নিজেরও বড়ো হবার, পায়ে দাঁড়াবার খুব একটা জেদ ছিল। ভালো রেজাল্ট করে প্রেসিডেন্সিতে ঢুকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করবার পর কলকাতায়ই বসবাসকারী বাবার এক বাল্যবন্ধুর চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি ফার্ম-এ ঢুকে সে পরীক্ষা পাশ করে। পরে কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্সিও করে। ওর বাবা ছিলেন জমিদারি সেরেস্তার মুহুরি। ধুতির উপর হাফ-হাতাওয়ালা ফতুয়া পরতেন। পানজরদা খেতেন তাও বেশি নয়। এবং নস্যি। এ ছাড়া নেশাও ছিল না কোনো।

অশেষের পাইপ আর হুইস্কি।

ওদের দুজনের স্কুলের কথা শোনার পর যোগেশদা বললেন তমাগো কথা তো কনফেস করলা। এহনে আমার কথাডা কই? দ্যাশ ছাইড়া আসনের পর বাবায় তো আমারে দিল এক স্কুলে ভরতি করাইয়া কুমুদিনী পার্কের অপোজিটে। পাঁচ টাকা মায়না ছিলরে ভাই। কোন স্কুল কও দেহি? দুর্গাপতি ইন্সটিটিউশন। মান্‌ষে কইত আমাগো সময়ে "যার নাই কোনো গতি হে যায় দুর্গাপতি।" কিন্তু কইলে কী হয়? যখন তোমাগো ছেন্ট ফেজিয়ার্স-ভরতি হওনের লইগ্যা গ্যালাম গিয়া, ফাদার গোফার, কলেজের প্রিফেক্ট, স্কুলের নাম শুইনা কইলেন কী জানো? যা কইলেন তা শুইন্যা তো আমার ভিরমি লাগনের জোগাড়।

কী?

কইলেন, দ্যাটস আ ভেরি গুড স্কুল। সো মেনি গুড স্টুডেন্টস কেম ফ্রম দ্যাট স্কুল।

ডক্টর হিতেশ চক্রবর্তী। শুনছো নাম? আরে এহনে, আমাগো পশ্চিম বাংলার ডাইরেক্টর অফ হেল্‌থ সার্ভিসেস, হেই দুর্গাপতিরই ছাত্র। ভেরি হ্যান্ডসাম মানুষ রে ভাই। আর আরও জুনিয়র, ওই তোমাগো ফুটবলার? মুনি গোস্বামী? হেও তো আরও কত্ত পোলায়। স্কুল-ফুল সব বোগাস রে ভাই, আসলে হইতাছে ইন্ডিভিজুয়াল। বাড়িতে মা-বাপের ইন্টারস্ট যদি থাহে আর পোলার নিজের মগজে যদি মাল এট্টু থাহে তাইলে স্যা উপরে উইঠা আইবই আইব। তারে ঠেকায় কোন্ হালায়? তাই যদি না হইতরে ভাই, তাইলে তো হক্কল ভালো ভালো স্কুল-কলেজের হক্কল পোলায়ই লাইফে এক্কেরে ক্যান্টার কইর‍্যা থুইত! লাইফে হ্যাগো মধ্যে কয়জন ভাইস্যা গেছে আর আমরাই বা কয়জন আছি কও দেহি একবার?

চ্যাটার্জি বলল, যোগেশদা আপনি বুঝছেন না। দিনকাল সত্যিই বদলে গেছে। আমাদের ছেলেবেলার দিন কি আর আছে? এখন একটি ভালো স্কুলে ছেলের অ্যাডমিশান না করাতে পারলে তার জীবন অন্ধকার।

অশেষ বলল, সমাজে স্টেটাস থাকে না। বন্ধুবান্ধবের ছেলেমেয়েরা মিশবেই না আমাদের সঙ্গে।

তরে একটা হনুমান ছাড়া আর কিছুই কওন যায় না। ভাইবা দ্যাখো, ঠান্ডা মাথায়। ভালো স্কুলে ভালো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে এডুকেশান দ্যায় যে তার সন্দেহ নাই কিন্তু হেই শিক্ষা লইতে পারে কয়ডা পোলায়? যারে কয় রিসেভ্‌টিভিটি তাইই যদি না থাহে, তয় সে পোলার লবডংকা অইব। আরে তোমরা যা কইতাছ তাই যদি হওনের কথা ছিল তাইলে ত শুদা বড়োলোকের পোলারাই লাট-বেলাট হইত আনে। লাইফে কি তাই দ্যাখস নাকি? চারধারে চক্ষু মেইলা দ্যাখসও না নাকি তোরা?

আপনার ছেলে, যে এখন স্টেটস-এ আছে সে কোথায় পড়েছিল?

হেডার মাথাটা ত তার বাপের মতো ভালো ছিল। হেডারে দিছিলাম নরেন্দ্রপুরে। বউদিই লইয়া গিয়া দিয়া আইছিল। তারপর প্রেসিডেন্সি। বরাবর তো স্কলারশিপ লইয়াই পড়ছে।

তাইই বলুন। সকলের ছেলেরাই তো ব্রিলিয়ান্ট হয় না। যাদের মগজ শার্প নয় তারা কি জীবনে বড়ো হবার চেষ্টা করবে না?

ইডিয়টের মতো কথা কইতাছ তোমরা। কোনো পোলার মগজই পাঁচ বছরে শার্প থাহে না। মগজেরে পরিষ্কার করনের, ধার দাওনের তো তহনই আরম্ভ। তোমাগো লইয়া হত্যিই পারন যায় না।

লাঞ্চের পর নিজের নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে চ্যাটার্জি আর অশেষ বলল, বাঙালকে নিয়ে সত্যি পারা যায় না। কোন যুগে যে বাস করেন যোগেশদা। বড়ো জ্ঞান দেন সব সময়।

চ্যাটার্জি বলল, বাংলাদেশের কোন জায়গার বাঙাল উনি? কে জানে? আমি তো বাংলাদেশের গায়ের গন্ধ মুছে ফেলেছি।

যাইই বলিস, বাঙাল তুইও যদিও, তবু তুই যোগেশদার মতো গ্রস নোস। তোর মধ্যে রিফাইনমেন্ট আছে। বাঙাল ওরিজিনাল হলে, বড়ো ইগো থাকে তাদের কী বল?

অন্যমনস্ক-গলা অশেষ হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল, হয়তো। ওর বাবার কথা মনে পড়ে গেল। বাবারও ইগো ছিল। ভেঙে যেতে রাজি ছিলেন, কখনোই মচকাতে নয়। গত বছর বাবা মারা গেলেন ভবানীপুরের সেই গলির বাড়িতে। শেষ দিকটাতে বাবাকে বড়োই অবহেলা করেছিল অশেষ। এই দিনকালে ইচ্ছে থাকলেও পারা যায় না।

॥ ২ ॥

চাঁদুর বয়স পাঁচ। সে পাশের ঘরে শোয়। হালকা নীল কট। ডনাল্ড ডাক আর ডলফিন্‌দের রঙিন ছবি আঁকা তাতে। ছোট্ট বইয়ের আলমারি। পড়ার টেবল। নীলরঙা টাইলস-এর বাথরুম। জামাকাপড় রাখার ছোট্ট নীলরঙা আলমারি। রঙিন টি ভি-র পর্দায়

সুখী পরিবার এবং দারুণ সুন্দর অভ্যন্তরের যেমন দৃশ্য দেখা যায় ঠিক তেমনি করেই অশেষের ফ্ল্যাট বা বাড়ি কম বেশি একই রকম করে সাজানো। জীবন যাত্রায় বড়ো একঘেয়েমি। সকলেরই একই আশা-আকাঙ্ক্ষা, শুক্র শনিবার রাতে এর তার বাড়ি পার্টি, রবিবার সকালে ক্লাবে গিয়ে বিয়ার বা জিন বা ভডকা খাওয়া। অবস্থাপন্ন সমস্ত মানুষই বোধ হয় এই একই রকম ভাবে বাঁচছে। বিশেষত্ব কিছু নেই।

হালকা হলুদ রঙের সিল্কের নাইটি পরে চাঁপাফুল রঙের কম্বলের নীচে শুয়ে বেডরুমের নীল আলোর সুইচটাও নিবিয়ে দিল সুমিতা। হাই তুলল একটা। এরকমই হয়। কী হবে কী হবে করে এতদিন তুমি কীইড-আপ হয়েছিলে তো! আজ যখন বীণাদির কাছ থেকে খবরটা পেলে তখনই ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছ। যাইই হোক, অলস ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল।

দাঁড়াও অ্যাডমিশনটা হোক আগে। না আঁচালে বিশ্বাস নেই। কাউকেই বোলো না কিন্তু তুমি। কেউ জানলেই, ভাঙচি দেবে।

হুঁ। বীণাদি আর কী বললেন?

বললেন যে, টেস্ট কিন্তু নেবে।

নেবে? আতঙ্কিত গলায় বলল অশেষ।

বলেই উঠে বসল বিছানাতে। সে কী? তাহলে আর করলেনটা কী বীণাদি?

হ্যাঁ। প্রদীপ সেন নাকি তাইই বলেছেন ওঁকে। টেস্ট-এ রিজনেবলি ভালো করা চাই।

মাই গুডনেস। আমি তো ভেবেছিলাম সেন্ট লরেন্স, ক্যালকাটা বয়েজ স্কুল, ডনবসকো এবং পাঠভবনেও আর চেষ্টা করার দরকার নেই। এখন তো দেখছি ঢিলে দিলে একটুও চলবে না।

না। সুমিতা বলল। গলায় কান্নার সুর লাগল ওর। ওর দিকে সহানুভূতির চোখে চেয়ে অশেষ বলল, অ্যাডমিশন টেস্ট যে ছেলের না আমাদেরই তাই-ই বোঝা দুষ্কর। দ্যাখো, নিজেদের সব পরীক্ষা, সব বিপদ ধীরে ধীরে প্রায় কাটিয়েই উঠেছি বলা চলে। যখন ভেবেছিলাম, সুখের জীবন শুরু হবে ঠিক তখনই মনে হচ্ছে দুখের জীবনের আরম্ভ হল। অথচ আমাদের দুজনেরই এই সুখ অথবা দুখের উপরে কিছুমাত্রও হাত নেই। ছেলেমানুষ না হলে, ছেলের বউ ভালো না হলে ওদের নিয়ে যা অশান্তি তা তো আমরা অ্যাভয়েড করলেই পারতাম।

ছিঃ। কী যে বল! তুমি কি বলছ, চাঁদু না থাকলেই ভালো হত। খুশি হতাম আমরা? অমন করে বোলো না।

কী বলতে চাইছি বুঝছ না তুমি সুমি!

ব্রান্ডি খাবে নাকি একটা? ছেলের চিন্তা তো আছেই; আমার তোমাকে দেখেও কম চিন্তা হচ্ছে না।

সুমিতা অস্ফুটে কী যেন বলল, বোঝা গেল না।

পাশের ফ্ল্যাটে টিবড়েওয়ালারা ভি সি আর-এ কোনো ইংরেজি ছবি দেখছে। রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। গমগম করছে আওয়াজ। একটুও কনসিডারেশন নেই। একজন মানুষেরও কনসিডারেশান নেই অন্যর প্রতি। পথের মোড়ে ট্র্যাফিক কনস্টেবল এক মুহূর্ত না থাকলেই এই সময়টার, এই যুগের চরিত্রটা যেন আয়নায় ফুটে ওঠে। চাঁদুরা যে কেমন করে বাঁচবে এই যুগে। বড়োই কষ্ট ওদের কপালে।

অশেষ উঠে গিয়ে ড্রয়িংরুমের বাতি জ্বেলে সুমিতার জন্যে একটি কনিয়াক আর ওর জন্যে একটি হুইস্কি ঢেলে, সেলার বন্ধ করে বাতি নিবিয়ে দিল। চাঁদুর ঘরের ফুট-লাইটটা জ্বলছে। মৃদু আলোতে আভাসিত হয়ে আছে ঘর। পায়ে পায়ে এগিয়ে গ্লাসদুটো হাতে নিয়েই একেবার ছেলের বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পাশ ফিরে দুটি হাত জড়ো করে ঘুমের মধ্যে ছেলেটা কী যেন প্রার্থনা করছে। প্রার্থনা করছে কি ও—ও, ওর বাবা-মায়েরই মতো, যেন সেন্ট ফেজিয়ার্স-এ অ্যাডমিশনটা হয়ে যায়?

পাঁচ বছরের শিশু! এই স্কুলের অ্যাডমিশনের পরীক্ষাতেও ধরাধরি করে, কানেকশানস বের করে তাকে পার করাতে হবে। যদি ভরতি হয়ও, স্কুল লিভিং পরীক্ষায় যদি ভালো না করতে পারে তখন আবার আর এক পরীক্ষা কলেজে অ্যাডমিশানের। তারও পর কেরিয়ারের পরীক্ষা। ততদিন কি বাঁচবে আশেষ? যা হেকটিক লাইফ লিড করতে হয় ওকে। আজ মুম্বাই কাল চেন্নাই, পরশু ব্যাঙ্গালোর তরশু দিল্লি। আগে আগে বেশ একটা ফিলিং অফ ইমপরট্যান্স হত, আজকাল বড়ো ক্লান্ত লাগে। ভালো লাগে না একেবারেই। তারপর চাকরিতে ঢুকেও তো প্রত্যেক মুহূর্তেই পরীক্ষা। ল্যাং-মারামারি। ইঁদুরের মতো কাটাকাটি একে অন্যকে। পাঁচ বছর বয়স থেকে পরীক্ষার শুরু হল চাঁদুর। চলবে মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত। জীবন মানেই পরীক্ষা। এই জীবন চাঁদুদের বড়োই সংগ্রামের, খেয়োখেয়ির, বড়ো দ্বেষ, ঈর্ষা, বড়োই রেষারেষির হবে। চাঁদুর ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে ভাবছিল অশেষ, এই পৃথিবীতে কেন যে আনল ও আর সুমিতা বেচারিকে। শিশুর শৈশব নেই, কিশোরের কৈশোর নেই, যুবকের যৌবন নেই, প্রৌঢ়র বানপ্রস্থ নেই। প্রতিটি মুহূর্ত টেনশানের, প্রতিযোগিতার। অথচ, এই প্রতিযোগিতা কীসের জন্যে? ভালো চাকরি, ভালো রোজগার, স্টেটাস, ভালো ফ্ল্যাট, গাড়ি, ফোন ফ্রিজ, ভি সি আর? শুধু এইটুকু পাওয়ার জন্যেই কি একজন মানুষকে পৃথিবীতে আনা? এই প্রতিযোগিতাতে ছিন্নভিন্নই যদি হতে থাকে সবসময় তবে ওরা বাঁচবেটা কখন? জীবন মানে শুধু কি এই? এইই সব?

বেডরুমে এসে নীল লাইটটা জ্বেলে সুমি তাকে কনিয়াকটি দিয়ে নিজে গাল্প করল একবারে অনেকখানি হুইস্কি।

সুমিতা সচরাচর ড্রিংক করে না। ক-দিন হল কেমন যেন হয়ে গেছে। বিছানায় উঠে বসে সেও চুমুক দিল।

ওকে অন্যমনস্ক করার জন্যে অশেষ বলল, বিকেলে কী করলে?

ও। বলিনি তোমাকে বুঝি? চাঁদুকে মিস্টার হবসন-এর স্কুলে নামিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রসদনে গেছিলাম। শ্যামলদাদের সেই প্লে দেখতে। শ্যামলদা ইংরিজিতেই বললেন। কী দারুণ ইংরিজি বলেন। উনি কি ইংল্যান্ডের "হ্যারোতে" পড়াশোনা করেছিলেন? না 'ইটন'-এ?

চুপ করে রইল অশেষ কিছুক্ষণ। তারপর নিজের কানে আশ্চর্য শোনালেও কথাটা বলল সুমিতাকে। বলল, যোগেশদার কাছে শুনেছি, উনি নাকি বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়েছিলেন।

সে কী? লা-মার্টস বা সেন্ট জেভিয়ার্সেও নয়।

নয়। ওসব স্কুলে বড়োলোকের ছেলেরাই পড়তে পায়। শ্যামলদার বাবা তো খুব অল্পবয়সেই মারা যান। শিশুকালে তাঁর মা অনেকেই কষ্ট করেই ওঁকে বড়ো করেছিলেন। জান তুমি, যোগেশদা হয়তো ঠিকই বলেন। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল অবশ্য খুবই ভালো স্কুল, কিন্তু ইংলিশ মিডিয়াম তো নয়। মানুষ যদি নিজেকে বড়ো করতে চায় যোগেশদার ভাষায়, তার মধ্যে যদি নেওয়ার ক্ষমতা মানে রিসেভটিভিটি থাকে, তাহলে সেই সব ব্যক্তি নিজেদের গুণে একদিন প্রতিষ্ঠানের চেয়েও অনেক বড়ো হয়ে ওঠেন। আমি সুগতর কাছে শুনেছি যে, শ্যামলদা নাকি রেডিয়োর বি বি সি স্টেশন শুনে শুনেই অমন ইংরিজি উচ্চারণ রপ্ত করেছিলেন। সত্যি কি না জানি না অবশ্য। যে বড়ো হবে, তাকে তার পরিবেশ, অনুষঙ্গ, চারপাশের বিরূপতা কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না হয়তো।

সকলেই তো আর শ্যামলদার মতো ওরকম বড়ো হবার ক্ষমতা নিয়ে আসে না। আমাদের চাঁদু তো সাধারণ। আমি তুমিও তো সাধারণই। তাই ইচ্ছে করে ছেলেকে একটি ভালো স্কুলে দিই। তুমি যখন অ্যাফোর্ড করতে পার। তাছাড়া ভালো স্কুলিং-এর দাম তো আছে একটা।

নিশ্চয়ই আছে। তবে, সত্যিই হয়তো বাবা-মায়ের শাসন এবং ছেলের নিজের বড়ো হওয়ার তাগিদটাই আসল। স্কুলের চেয়ে, সেটা অনেকেই বড়ো ব্যাপার।

হঠাৎই ওরা দুজনে চমকে উঠল, দ্রুত কিন্তু লঘু পায়ে পাশের ঘর থেকে চাঁদুকে দৌড়ে আসতে শুনে। স্লিপিং স্যুট পরে চাঁদু তার ছোট্ট চটি ফট ফট করে দৌড়ে এল ও ঘরে। সুমিতা লাফিয়ে উঠল বিছানা ছেড়ে। আতঙ্কিত গলায় বলল, কী হয়েছে বাবা? ভয় পেয়েছ? স্বপ্ন দেখেছ?

দেওয়ালের কোয়ার্টজ ক্লক-এর দিকে চেয়ে দেখল অশেষ রাত বারোটা বেজে কুড়ি।

চাঁদু সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, মাম্মি, "সিজর্স" বানানে ক-টা এস? ক-টা এস?

অশেষ বলল, চারটে।

তাই? তাইতো। আমি তো ঠিকই জানি। সেন্ট ফেজিয়ার্সের সাদা ড্রেস-পরা ফাদার যে বললেন, আমি ভুল বলেছি।

তুমি স্বপ্ন দেখছিলে?

না বাবা। আমি অ্যাডমিশান টেস্ট দিচ্ছিলাম। চাঁদু ঘুম-ভাঙা আতঙ্কিত মুখের দিকে চেয়ে সুমিতার দু চোখ সমবেদনায়, অসহায়তায়, ক্রোধে, হতাশায় জ্বলে উঠেই পরমুহূর্তে জলে ভরে গেল। মুখ ফিরিয়ে নিল ও জানালার দিকে।

অশেষ চাঁদুকে কোলে তুলে ওদের বেডরুমের বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ওর ঘাড়ে, কানের পেছনে এবং হাঁটুতে ও গোড়ালিতে জল দিল। স্নায়ু সব ঠান্ডা হয় অমন করলে। ওর মা বলতেন। মা-ও এখন ভবানীপুরেই থাকেন সুরেশের সঙ্গে। বড়ো কষ্টেই থাকেন। কিছু টাকা দেয় অশেষ। জানে যে তা কিছুই নয়, কিন্তু আর পারে না। ওদের লাইফ-স্টাইল যে বদলে গেছে!

চাঁদু অশেষের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, বাবা! আমার ভয় করছে।

কোনো ভয় নেই। আমি আছি না। অশেষ বলল। ঠিক এমনি করে মা-ও বলতেন ওকে ছোটোবেলায়। মায়ের কাছে একমাসের উপর যেতে পারেনি। মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল।

চাঁদুকে বলল, পারবে, তুমি ঠিক পারবে টেস্টে। দেখো তুমি। এখন চলো ঘুমোবে। লাইক আ গুড বয়। তুমি হাঁদা জ্যাঠার মতো বাঘ শিকার করবে বল না? টিসুম। তবে? ভয় পাবে কেন? চাঁদু ঘোরের মধ্যে বলল, তা হলে ফাদার যে বললেন, না। সিজর্স-এর একটা এস।

ফাদার জানে না বাবা।

তা হয় না। চাঁদু বলল।

চাঁদুকে শুইয়ে, গায়ে ওর হালকা নীলরঙা কম্বলটা চাপিয়ে মশারি গুঁজে কপালে একটা চুমু দিয়ে অশেষ বলল, গুড নাইট বাবা। ঘুমোও এবারে।

বেডরুমে ফিরে এসে দেখল সুমিতা এক করুণ অসহায় ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। ওর হাতের কনিয়াকের গ্লাস ঢেলে কম্বল ভিজে গেছে। অশেষ কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকল, সুমি।

সাড়া নেই কোনো। অজ্ঞান হয়ে গেছে চাঁদুর মা।

অশেষ তাড়াতাড়ি ওর নাড়ি দেখল। তারপর ড. ভৌমিককে ফোন করল। এই মালটিস্টোরিড বাড়িরই দশতলায় থাকেন উনি। তারপর সারভেন্টস কোয়ার্টার্সের বেল টিপল। ড. ভৌমিক এলেন স্লিপিং স্যুটের উপর ড্রেসিংগাউন চাপিয়েই। সুরমাও এল প্রায় একই সময়ে। ড. ভৌমিকের ব্যাগটা নিয়ে বেডরুমে এল অশেষ আর সুরমা ড. ভৌমিকের সঙ্গে।

পরীক্ষা করতে করতেই জ্ঞান ফিরে এল সুমিতার, কিন্তু জ্ঞান আসার আগে ঘোরের মধ্যেই সুমিতা বলল, বিলিভ মি ফাদার। হি নোজ এভরিথিং। বিলিভ মি। ও নার্ভাস হয়েই ভুল বলেছে। সত্যিই কিন্তু ও জানে। ও কি অ্যাডমিশান পাবে না ফাদার?

ড. ভৌমিক বুঝলেন।

অশেষকে বললেন, কবে?

পরশু থেকে আরম্ভ। পর পর। সেন্ট লরেন্স, ডন বসকো, ক্যালকাটা বয়েজ, লা মার্টস, সেন্ট-ফেজিয়ার্স।

হুঁ। বলেই সুমিতার প্রেশার মাপলেন। তারপর নিজের ব্যাগ থেকে দুটি পাঁচ মিলিগ্রামের ক্যাম্পোজ বের করে দিয়ে বললেন, জল দিয়ে গিলে শুয়ে পড়ুন। কাল ঠিক হয়ে যাবেন।

ড. ভৌমিকের দারুণ প্র্যাকটিস। মানুষও নাকি খুব অমায়িক। চারখানা গাড়ি। লোকে পেছনে পেছনে দৌড়ে বেড়ায়। অশেষ শুনেছে যে, ওঁর বাবাও অত্যন্ত বড়ো ডাক্তার ছিলেন। উনিও নাকি বিদেশে গিয়ে অনেক ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন। আজই প্রথম বিপদে পড়ে ডাকল ওঁকে। নইলে ওদের ডাক্তার, ড. সেন।

ড. ভৌমিক লিফ্‌ট-এর সামনে দাঁড়িয়ে লিফ্‌ট-এর বোতাম টিপে বললেন, মিসেসের নার্ভাস ব্রেকডাউন মতো হয়েছে। নাথিং টু ওয়ারি বাউট। প্রেসক্রিপশান তো লিখে দিয়েই গেলাম একটা। ওষুধ আনিয়ে কাল সকাল থেকেই দিতে আরম্ভ করবেন।

লিফ্‌টের দরজা বোধহয় কেউ খুলে রেখে দিয়েছে। মালটিস্টোরিড বাড়ির চাকর আয়ারা রাতে যা খুশি তাইই করে। ড. ভৌমিক কিছুক্ষণ মুখ নীচু করে লিফ্‌টের অপেক্ষায় থেকে হঠাৎ বললেন, আমি জানি না মিস্টার বোস কলকাতায় আমরা এত বড়োলোক বাঙালি আছি, বাঙালি গভর্নমেন্ট আমাদের, আমরা সকলে মিলে কি আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে ক-টি ভালো স্কুলও তৈরি করতে পারি না? কলকাতায় তো বটেই, সমস্ত মফস্‌সল শহরেও?

স্কুল তো কতই আছে। কিন্তু স্কুলের মতো স্কুল কোথায়? মানে, যেখানে ভালো পড়াশোনা হয়, ইংলিশ মিডিয়ামে।

অশেষ বলল।

যে সব স্কুল আছে বাংলা মিডিয়ামের, তাদেরও কি আমরা আধুনিক ও ভালো করে তুলতে পারতাম না? ইংরিজি শিখতে বাহাদুরিটা কী লাগে? নিউমার্কেটের ফলওয়ালারাও তো ইংরিজি বলে। ইংরিজি শেখার চেয়েও বড়ো শিক্ষা চরিত্র গঠন। যে সাহেবরা আমাদের বাবাদের শোষণ করেছিলেন তাদের পোশাক, কমোড, হুইস্কি আর পাইপই নিলাম আমরা, চরিত্রটাই ফেলে দিলাম। তখনকার ইংরেজদের গুণও ছিল অনেক। কী বলেন?

আপনি কোন স্কুলে পড়েছিলেন ডাক্তার ভৌমিক?

আমি? বাংলাদেশের পাবনার এক অখ্যাত গাঁয়ের স্কুলে।

আপনার বাবা তো এম আর সি পি, এফ আর সি এস ছিলেন তাই না?

ড. ভৌমিক একবার তাকালেন অশেষের চোখে মুখ তুলে। বললেন, কে বলেছে আপনাকে? ভুল শুনেছেন। আমার বাবা এম বি-ও ছিলেন না, পুরোনো দিনের এল এম এফ ছিলেন। কিন্তু ডাক্তার ছিলেন ধন্বন্তরি।

সরি। আমি আপনার সঙ্গে আপনার বাবার কোয়ালিফিকেশান গুলিয়ে ফেলেছিলাম।

নীচে দরজা বন্ধ করার আওয়াজ হল। কারও দয়া হল বোধ হয়।

লিফটটা এসে গেল। অশেষ ভদ্রতা করে লিফট-এর গেট খুলে দিল। ড. ভৌমিক বললেন, না সেটাও ভুল শুনেছেন। আমি নিছকই একজন এম বি বি এস ডাক্তার।

আপনার ফিসটা?

হাসলেন ড. ভৌমিক। বললেন, আমি পুরোনো দিনের লোক, প্রতিবেশীকে আত্মীয় বলেই জেনেছি ছোটোবেলা থেকে।

লিফট-এর মধ্যে মুখ নীচু করে গেটের ভিতরের দিকটা টানতে টানতে বললেন, বোস সাহেব স্কুল এবং ডিগ্রির সঙ্গে শিক্ষার কোনোই সম্পর্ক নেই বোধহয়। হয়তো আয়েরও নেই। ওড়িশা থেকে আসা ভালো কাজ জানা কলের মিস্ত্রি, বিহার বা ইউ পি থেকে আসা পানের দোকানদার, এঁরা সবাইই কিন্তু মার্কেন্টাইল ফার্মের অনেক বাঙালি অফিসারের চেয়ে বেশি রোজগার করেন। একমাত্র ছেলেকে নিয়ে কী করতে চান আপনারা তাই ভালো করে ভেবে ঠিক করুন। কলকাতার ভালো ভালো স্কুলে যেসব ছেলেমেয়ে পড়ার সুযোগ পায় বা পেয়েছে, পরবর্তী জীবনে তারা কি সকলেই কেওকেটা হয়েছে? সো কলড খারাপ স্কুলের ছেলেমেয়েদের কাছে হেরে তারা কখনও গেছে কি যায়নি তাই নিয়েও একটি সার্ভে করার সময় বোধহয় এসেছে। একমাত্র সন্তানকে কী করে তুলতে চান তাই ভাবুন ভালো করে দুজনে। পরীক্ষা আপনাদেরই।

অশেষ লিফটের বোতাম টিপে রেখে দাঁড় করিয়ে দিল লিফটটিকে।

কাকুতিভরা গলায় বলল, কী করতে বলেন আপনি আমাদের, ডাক্তার ভৌমিক?

কিছুই বলি না। ছেলেকে শিক্ষিত করে তুলুন। জীবিকার সঙ্গে শিক্ষার কোনো বিরোধ যেমন নেই, তেমন কোনো কানেকশানও নেই। যা কিছু করেই একজন মানুষ জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। এমনকি যদি কড়াইশুঁটি কী কচুরির দোকানও দেয়। আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে, যাঁরা টাই পরে গাড়ি চড়ে অফিসে গিয়ে অন্যের বেশি মাইনের চাকর হয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন তাঁরাই শুধু শিক্ষিত আর অন্যরা সবাইই অশিক্ষিত? ছেলেটাকে শিশুকাল থেকেই কতগুলো প্রি-ডিটারমিনড আইডিয়াজ-এর চাকর করে তুলবেন না। ওদের মানুষ করে তুলুন। ভালো স্কুলে অ্যাডমিশান হলে ভালো, কিন্তু তা না হলে যে তার জীবন বৃথা হয়ে যাবে এমন মনে করার মতো মূর্খতা কিন্তু আর নেই। ফটফট করে ইংরিজি ফুটোলেই সে শিক্ষিত, সে জীবিকায় সফল হবে, তার কোনো মানেই নেই। তাছাড়া জীবিকার জন্যে তো জীবন নয়, জীবনের জন্যেই জীবিকা।

অশেষের হাতের আঙুল আপনা থেকেই ঢিলে হয়ে এল। লিফটটা উঠে গেল উপরে। ওর মনে হল, ড. ভৌমিক যেন ওকে নীচেই ফেলে রেখে নিজে অনেক উঁচুতে চলে গেলেন।

সুরমাও তার কোয়ার্টার্সে যেতে দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে অশেষ আর একটা হুইস্কি

ঢেলে বেডরুমে গিয়ে দেখল সুমিতার নিশ্বাস গাঢ় হয়ে গেছে। দশ মিলিগ্রাম ক্যাম্পোজ পড়াতে ঘুমে এলিয়ে পড়েছে ও।

গ্লাসটি হাতে নিয়ে দরজা খুলে ও বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বেশ ঠান্ডা পড়েছে কলকাতায় গতকাল থেকে। উলটোদিকের চোদ্দোতলা মালটিস্টোরিড বাড়িটির কিছু কিছু ফ্ল্যাটে তখনও আলো জ্বলছে। ওই সমস্তকটি ফ্ল্যাটেও কি পাঁচ বছরের শিশুরা জীবন ও জীবিকার প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যে কাঁচির ইংরিজি প্রতিশব্দ বানানে কটি "এস" আছে তা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত? না তাদের মা-বাবারা ভালো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে তাদের ভরতি করতে না পারায় চিন্তাতে সুমিতারই মতো নার্ভাস ব্রেকডাউনে ভেঙে পড়েছেন আলো-জ্বালা বেডরুমগুলিতে?

অশেষের চোখে হঠাৎই বাঙাল, খাঁটি, সোজা কথার মানুষ যোগেশদার মুখটি ভেসে উঠল। এক ঢোকে হুইস্কিটা শেষ করে দিল ও। ওর মনে হল এই মুহূর্তে ওদের মতো অনেক দম্পতিই শুধু নন, ওদের নয়নমণি চাঁদুদের মতো কিছু শিশুই শুধু নন, পুরো বাঙালি জাতটাই বোধহয় একধরনের নার্ভাস ডেবিলিটিতে ভুগছে। ক্যাম্পোজ খেয়ে ঘুমোলে সেই জড়তা হয়তো শুধু বাড়বেই। যা দরকার তা জেগে থাকার, দু চোখ খুলে রাখার, সবাই যা করে, যা ভাবে; তা না করে নিজের পরিবেশ ও নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে ঠান্ডা মাথায় বোধহয় একটু ভাবা দরকার। ভালো চাকরি আর বেশি মাইনেই যে তাদের অনেক আদরে আনা সন্তানের জীবনের একমাত্র গন্তব্য নয় এ কথাটা হঠাৎই মনে হল ওর। ভালো-থাকা, ভালো-পরার, ভি সি আর আর পয়সার চক্করে ফেঁসে, গরিব বাঙালিদের যা কিছুই গর্ব করার ছিল একদিন তার সবই বুঝি খোয়াতে বসেছে তারা।

সুমিতা কাল যা বলে বলুক, সকালে কোনো বাঙালি স্কুলে নিয়ে গিয়ে ভরতি করাবে চাঁদুকে। তারপর সেই স্কুল যাতে তার সন্তানকে যথার্থ শিক্ষিত করে তুলতে পারে সে জন্যে নিজে তো বটেই, চ্যাটার্জি, যোগেশদা, ড. ভৌমিক এবং অগণ্য বাঙালিদের কাছে সাহায্য চাইবে অশেষ। সরকারের ওপর সব দিক দিয়ে চাপের সৃষ্টি করবে। কেরলও তো কমিউনিস্ট। কিন্তু শিক্ষিতের হার সেখানে কত বেশি! অশিক্ষিত বেকার মানুষ বাড়লে ভোট পেতে সুবিধে নিশ্চয়ই হয়, কিন্তু রাজ্যের কী হয় তা ওঁদের বোঝার সময় এসেছে। এই জাতটিকে এমন ঘোরতর স্নায়বিক দৌর্বল্য থেকে টেনে তোলাটা শুধুমাত্র তার নিজের ছেলেকে অতি স্বল্পসংখ্যক অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেদের স্কুলে তথাকথিত শিক্ষিত করে তোলার স্বার্থপর ইচ্ছে থেকে অনেকই বড়ো ব্যাপার।

চাঁদু ডাকল, বাবা!

তাড়াতাড়ি ঘরে গেল অশেষ বারান্দা থেকে।

অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্টের নাম কী বাবা? ডনাল্ড ডাক?

না বাবা। রোনাল্ড রিগ্যান। কিন্তু এসব তোমার আর মুখস্থ করতে হবে না। শিশু ভোলানাথ পড়াব আমি কাল তোমাকে, অবন ঠাকুরের রাজকাহিনী, বিভূতিভূষণের পথের

পাঁচালী পড়ে শোনাব; দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুরমার ঝুলি, সুনির্মল বসুর ছন্দের টুং-টাং। কাল থেকেই দেখবে পড়াশোনাটা কত আনন্দের। কত মজার। আজ ঘুমিয়ে পড়ো লক্ষ্মী সোনা। সিজার্স-এর এস নিয়ে আর ভাবতে হবে না তোমাকে। কাঁচিই আমাদের অনেক ভালো। রাতারাতি এক অদৃশ্য কাঁচি দিয়ে তোমাকে এই মিথ্যে কষ্টর জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক সুন্দর দিশি জগতে ফিরিয়ে আনব আমি। ঘুমোও তুমি। আমার আদরের ধন। তোমার স্বপ্নে পরিরা আসুক। শুকসারি, সুয়োরানি দুয়োরানি। ফ্যান্টম আর সাদা-পোশাকের ফাদাররা নাই-বা এলেন।

বাবা। আমার সঙ্গে শোবে তুমি?

নিশ্চয়ই শোব।

অশেষ বলল।

চাঁদুর পাশে শুয়ে, ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল একদা ব্রিটিশ, অধুনা মাড়োয়ারি কোম্পানির ইংরেজি ফুটোনো চাকর। ওর বুকের মধ্যে ছেলেবেলার সব বোধ ফিরে এল। কানে এল গ্রামের রাত পাখির শীতার্ত স্বর, নদীর উপরের হাওয়ার হু হু শব্দ। নাকে এল প্রথম ভোরের খেজুরের রসের গন্ধ, পাকা ধান আর নদীর কুয়াশার গন্ধর সঙ্গে ভেসে। বড়ো বড়ো কই- মাছের ধনেপাতা ফুলকপি দিয়ে রাঁধা ঝোলের গন্ধ। বাঙালিয়ানার গন্ধ। ঘুমন্ত চাঁদুকে বুকে জড়িয়ে অশেষ বলল, তোকে আমি শিশুকাল থেকেই এই অপমানের অসম্মানের জগৎ থেকে বাঁচাব। শিশুকাল থেকে এই হিউমিলিয়েশানের মধ্যে বাঁচতে হলে তুই অমানুষ হয়ে যাবি। তোকে জবরদস্ত বাঙালি করে তুলব। দেখি তুই ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে টক্কর দিতে পারিস কি পারিস না জীবনে! বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, স্যার আশুতোষ, বিধান রায়, সত্যজিৎ রায় এবং অনেকেই যদি ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে না পড়েও বড়ো বাঙালি হতে পেরে থাকেন তো তুই বা পারবি না কেন? তোকে আমি আমার মতো এয়ার-কন্ডিশনড অফিসের স্যুট-পরা ফ্যাকাশে পুতুল করব না, রক্ত মাংসের বিবেকসমৃদ্ধ মানুষ করে তুলব। যেমন অনেক মানুষের দরকার এই মুহূর্তে, এই হতভাগ্য রাজ্যে।

দেখিস, চাঁদু।

বাবা! দেখিস তুই!

জে ফর জেলাসি

দেরিটা নেরুলকারের সঙ্গে মিটিং-এর জন্যেই হল। বৃষ্টিও আর-একটা কারণ!

গৌতম গাড়ি থেকে নেমে রেবেলোকে দশটা টাকা বকশিশ দিল তারপর ওভারনাইট ব্যাগটা নিয়ে দৌড়ে ঢুকল সান্টাক্রুজ এয়ারপোর্টের ভিতরে। একে চান্স টিকিট তায় এত দেরি। এই ফ্লাইটে যদি যেতে না পারে তা হলে মিস্টির কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। পিয়া বলবে, মুখবিকৃত করে, বাবা হওয়ার কী দরকার ছিল তোমার?

চান্স টিকিট-হোল্ডারদের যখন ডাক পড়ে কাউন্টার থেকে তখন এমনই হুড়োহুড়ি আর ধাক্কাধাক্কি লেগে যায় যে বিচ্ছিরি লাগে। দূরপাল্লার আনরিজার্ভড সেকেন্ড ক্লাসে ওঠার জন্যে হাওড়া স্টেশনে মজফফরপুর অথবা কাটিহারের যাত্রীরা যেমন ধস্তাধস্তি করেন যেন তেমনই অবস্থা। স্যুটেড-ব্যুটেড হলে কী হয়, প্রকৃত ভদ্রলোক আর এদেশে দেখাই যায় না বোধহয়। মানসিকতায় সকলেই সমান। এই ব্যাপারটা ওর রুচিতে বড়ো লাগে বলেই গৌতম চান্স টিকিট নিয়ে এয়ারপোর্টে আসতেই চায় না।

স্টিফেন বলেওছিল যে, থেকে যাও আমার বাড়িতে, আজকে ছোট্ট পার্টিআছে। স্মিতা পাতিল আর নাসিরুদ্দিন শাহকেও বলেছি। কাল সকালেই যেয়ো। কিন্তু মেয়েটার জন্মদিনের জন্যেই আজই ফিরতে চেয়েছিল গৌতম। পরশু এসেই শ্রীধরনকে বলেও দিয়েছিল ফেরার টিকিটের কথা। সেও গা না করে আজ সকালেই মাত্র ট্র্যাভেল-এজেন্টকে বলেছে। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কম্পিউটার ইনট্রোড্যুস করার পর থেকে টিকিট যথেষ্ট আগে না-কাটলে অসুবিধা সত্যিই হচ্ছে।

একটাই হ্যান্ড ব্যাগ ছিল। তাছাড়া চান্স নাম্বার সেভেন। এয়ার-বাসের ফ্লাইট। পেয়েও গেল বোর্ডিং-কার্ড।

ব্যাগেজ চেক তো অনেকক্ষণ আগেই অ্যানাউন্সড হয়ে গেছে, ফ্লাইটও অ্যানাউন্সড

হয়ে যাবে এক্ষুনি। তাই ও তাড়াতাড়ি ভিতরের দিকে এগোল। এমন সময় পেছন থেকে কে যেন ডাকল নাম ধরে ওকে। দাঁড়িয়ে পড়ে, পেছনে তাকাতেই দেখল স্নিগ্ধ। ছাইরঙের দামি সাফারি-স্যুটের বুকপকেট থেকে এগজিকুটিভ ক্লাসের চওড়া লাল আর সাদারঙা বোর্ডিং-পাস উঁচিয়ে রয়েছে সাম্প্রতিক-বড়োলোক স্নিগ্ধর উঁচু হয়ে-থাকা দম্ভেরই মতো।

গৌতম দাঁড়িয়ে পড়ল।

অনেকখানি সময় নিয়ে আঙুলের ফাঁকে-ধরা ফাইভ-ফাইভ-ফাইভ সিগারেটের প্রায় পুরোটাই অ্যাশট্রেতে গুঁজতে গুঁজতে বলল, অত তাড়া কীসের? চেক-ইন যখন করেছ তখন প্লেন তো তোমাকে ফেলে যেতে পারবে না।

গৌতমের রাগ হল একটু। কিন্তু চেপে গেল। রাগটা কেন হল তা তক্ষুনি ও বুঝল না। হয়তো স্নিগ্ধর বুকপকেট থেকে মাথা জাগিয়ে-থাকা এগজিকুটিভ ক্লাসের বোর্ডিং পাসটাই ওর মনে ঈর্ষা জাগাল।

স্নিগ্ধ ওর কাছে এলে দুজনে একই সঙ্গে সিকিওরিটি এনক্লোজারে ঢুকল। মুম্বাই এয়ারপোর্টে হ্যান্ডব্যাগেজ চেক করে না। এইটুকু সুবিধা। বডি-চেক করিয়ে দুজনেই ভিতরে ঢুকে পাশাপাশি দুটি চেয়ারে বসল, ল্যাভেটরিগুলো যেদিকে; সেই দিকে। অন্যদিকে জায়গাও ছিল না।

পকেট থেকে ফাইভ-ফাইভ-ফাইভের প্যাকেট বের করে স্নিগ্ধ গৌতমকে অফার করল।

ছেড়ে দিয়েছি।

গৌতম বলল।

কবে থেকে?

তা বছর পাঁচেক হল।

পাঁচ বছর? তার মানে পাঁচ বছর তোর সঙ্গে দেখা হয়নি আমার?

দেখা হয়েছে নিশ্চয়ই। এই তো মাস ছয়েক আগেও হল পুরোনো পাড়ার ঘন্টুদার মেয়ের বিয়েতে।

তাই। তা হবে।

সারাদিনই মিটিং করেছে। কথা বলাই গৌতমের কাজ। যে-কথার কোনো মানে নেই, যে-সব কথা শুধুই সময় নষ্ট করবার জন্যেই বলা হয়; তাতে ওর কোনোই ইন্টারেস্ট নেই। বড়ো বাজে এবং বেশি কথা বলা হয় এই পৃথিবীতে, যার একটা বড়ো অংশ বলা এবং শোনা না হলে সকলেরই হয়তো উপকার হত।

কোথায় উঠেছিলি?

স্নিগ্ধ আবার বলল।

তাজ-এ।

নীচুগলায় বলল গৌতম।

তাজমেহাল হোটেলে? নিউ-উয়িং না ওল্ড-উয়িং-এ?

চেঁচিয়ে বলল স্নিগ্ধ।

গৌতম কোনোরকমে বলল, নিউ-উয়িং-এ।

আমি যদি তাজ-এ উঠিই, তাহলে সবসময়ই ওল্ড-উয়িং-এই উঠি। ওল্ড-উয়িং ইজ ওল্ড-উয়িং। আজকাল অবশ্য আমি ওবেরয় টাওয়ার্স-এই রেগুলারলি উঠছি। আমার কার্ড আছে তো! বলেই, হিপ-পকেট থেকে পার্স বের করে কার্ডটা দেখাল।

গৌতম দেখল। দেখতে হল বলে।

গৌতমের অফিসের অনেকেরই ওবেরয়ের কার্ড আছে এবং তারা মুম্বাই-এ এলে ওখানেই ওঠে, কার্ড-হোল্ডারদের পক্ষে একটু সস্তা হয় বলে। ও তাজ-এ ওঠে কারণ ওর ডিভিশনের অফিসটা ফ্লোরা-ফাউনটেইনেই। ট্যাক্সি খরচটা বেঁচে যায়। তা ছাড়া, নিজের জন্যে কলম-টলম, পিয়ার জন্যে হ্যান্ডব্যাগ, মিস্টির জন্যে কোলাপুরি চটি, এইসব টুকটাক কেনাকাটা করতেও সুবিধা হয় কোলাবা এবং ফ্লোরা ফাউনটেইনে। কিন্তু এগুলো নিতান্ত ব্যক্তিগত কারণ। স্নিগ্ধকে বিনা কারণে অত এক্সপ্লানেশন দিতে বাধ্য নয় ও। বলবেও না।

কবে এসেছিলি? মুম্বাই-এ?

আবার বলল স্নিগ্ধ।

পরশু।

সকালের ফ্লাইটে না বিকেলের ফ্লাইটে?

সম্পূর্ণ অপ্রয়েজনীয় প্রশ্ন। তবুও উত্তর দিতেই হলে গৌতমকে। বলল, সকালে।

আমি এসেছি কাল রাতের ফ্লাইটে। অবশ্য কলকাতা হয়ে নয়। কলকাতা থেকে বেরিয়েছিলাম সোমবার। হায়দরাবাদ গেছিলাম। তারপর সেখান থেকে ব্যাঙ্গালোর। ব্যাঙ্গালোর থেকে দিল্লি। দিল্লি থেকে ওই মুম্বাই। এবং আজ আবার মুম্বাই থেকে কলকাতা। সত্যিই আর পারি না! টায়ার্ড অফ হপিং-ইন অ্যান্ড হপিং-আউট।

স্নিগ্ধ বলল।

ওর মুখ দেখে কিন্তু মনে হল যে ও মোটেই ক্লান্ত নয়। শারীরিক ভাবে ক্লান্ত হলেও হতে পারে হয়তো কিন্তু মানসিকভাবে ও যে প্রচন্ড গর্বিত তা ওর দীপ্ত মুখই বলছিল।

এক-একজন মানুষের গর্ববোধ আলাদা আলাদা। তাদের ফিলিং অফ ইমপর্ট্যান্স-এর ক্ষেত্রও আলাদা আলাদা। প্রত্যেকের চাওয়াই এই জীবনে আলাদা আলাদা। কে যে কীসে গর্বিত হয় বোঝা মুশকিল।

চাকরি করতে হয় বলেই গৌতম চাকরি করে। চাকরি করলে ট্র্যাভেল করতে হয় বলেই ট্র্যাভেল করে। প্রতিটি ফ্লাইটেই উড়ন্ত প্লেনের মধ্যে এই ব্যস্ততা, এই হোটেল সংক্রান্ত কথাবার্তা চেনা ও অচেনা মানুষের মুখে শুনে শুনে ও সত্যিই ক্লান্ত। মালিকের পয়সায় ঘোরে বলেই প্লেনে যাওয়া আসা করে ও। তাজমেহাল হোটেলে থাকে। নিজের

খরচে এসি চেয়ার-কার বা রিজার্ভড সেকেন্ড-ক্লাসেই আসত। কোনো আত্মীয়র বা বন্ধুর বাড়িতে, নয়তো খুঁজেপেতে কোনো সস্তার হোটেলেই উঠতে হত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই আসাটা হত অনেকেই আনন্দের। ট্রেনের জানলার পাশে বসে মিস্টি তার অফুরন্ত প্রশ্নে তার বাবাকে ভরিয়ে তুলত। বলত এটা কী বাবা? ওটা কী বাবা? আর পিয়া বুদ্ধিমতী হাসি-হাসি মুখ নিয়ে অপলকে তাকিয়ে বাবা আর মেয়ের কথোপকথন শুনত।

প্রশ্ন যখন অকৃত্রিম কৌতূহলে ভরা এবং টাটকা থাকে, তার জবাব দেওয়া তখন গভীর আনন্দেরই ব্যাপার। যেমন গৌতমের মেয়ে মিস্টির সব প্রশ্ন; কিন্তু স্নিগ্ধর প্রশ্নগুলো ঠিক প্রশ্ন নয়; একধরনের উত্তর। একধরনের বোকা বোকা আত্মপ্রচার সুপ্ত থাকে এই অহেতুক চিৎকৃত সব প্রশ্নে।

তোর গাড়ি আসবে তো রে?

স্নিগ্ধ বলল।

হুঁ।

তোর সেই ফিয়াটই আছে। না বদলেছিস?

হুঁ।

হুঁ মানে?

ওই!

আসলে গৌতম ফিয়াটটা বিক্রি করে দিয়ে মারুতি নিয়েছে একটা। মিস্টিরই ইচ্ছেতে। অফিস থেকে দেওয়া একটি কন্টেসা আছে অবশ্য। সেটা অফিসের ড্রাইভারই চালায়। কিন্তু এত কথা স্নিগ্ধকে বলার ইচ্ছে বা প্রয়োজন আদৌ বোধ করল না ও। এড়িয়ে গিয়ে, মুখে ওইটুকুই বলল; ওই।

দশ বছরের মেয়ে মিস্টি মারুতির পেছনের কাচের দরজাটা তুলে দিয়ে মোড়া পেতে বসে সেখানে। অনেকেই বলে যে, খুব ডেঞ্জারাস। পেছন থেকে ধাক্কা মারলে...

গৌতম তবুও মেয়েকে বারণ করে না। এখন মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকাটাই ডেঞ্জারাস। জন্ম থেকে মৃত্যু। গৌতমদের জীবনগুলো তাও কাটিয়ে দিল একরকম করে। মিস্টিদের যা জীবন, যা পড়াশোনা, এই বয়সেই ওদের যা কর্তব্য-দায়িত্ব,চব্বিশ ঘন্টার দিনে ষোলো ঘণ্টা কাজ, যে গভীর প্রতিযোগিতা; তাতে নানারকম "ডেঞ্জার "নিয়েই ওদের ঘর করতে হবে। ওদের জীবন হবে সত্যি সত্যিই হাইলি-ডেঞ্জারাস। প্রতিক্ষণই হাইপারটেনশানের। পিয়া বা গৌতমের সাধ্য কী যে তাদের ভালোবাসার সন্তানকে এই বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে। মাঝে মাঝেই মিস্টিকে এই পৃথিবীতে এনেছে বলে আপশোশ করে। মেয়েটার শৈশব বলে কিছুমাত্র নেই। এখন হয়তো কোনো শিশুরই নেই। একথা ঠিক যে, মিস্টিরা যা এবং যতরকম শিক্ষা পাচ্ছে তার ছিটেফোঁটাও ওরা পায়নি। গৌতমরা সাদামাটা বাঙালি স্কুলেই পড়েছিল। বলতে গেলে, অশিক্ষিতই ছিল ওরা একরকম মিস্টিদের বয়সে, মিস্টিদের তুলনায়। কিন্তু এও ঠিক যে দলবেঁধে ওরা

তুমুল বৃষ্টির মধ্যে খালি পায়ে ফুটবল খেলেছে কাক-ভেজা হয়ে, ঘুড়ি উড়িয়েছে। রথের মেলায় গেছে রাসবিহারী অ্যাভেন্যুর মোড়ে আর পদ্মপুকুরে পাঁপড়ভাজা খেতে আর তালপাতার ভেঁপু কিনতে। ফাঁকা নির্জনে ট্রাম রাস্তায় ট্রাম লাইনের পাশের ইলেকট্রিক পোস্টের সঙ্গে কান লাগিয়ে ট্রাম-যাতায়াতের আশ্চর্য আওয়াজ শুনেছে প্রাণ ভরে। বড়ো সহজেই গভীর সুখে আশ্চর্য হতে পেরেছে ওরা। তখন বিনি-পয়সাতে অনেকই আনন্দ পাওয়া যেত। অনেক সহজ সুন্দর অবসরের ছিল জীবন। মিস্টিদের এই এত বিষয়ের জ্ঞান, এই দ্রুতগতি জেট-প্লেন, এইসব ফাইভ-স্টার তাজমেহাল বা ওবেরয়-শেরাটন না থাকলেও জীবন তখন পরিপূর্ণ ছিল কানায়-কানায়। আনন্দের অনাভাবের জীবন। আজ এত কিছু হয়েও লাভ বোধহয় হয়নি কিছুই। মানুষের আসলে কী যে চাইবার ছিল মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবার জন্যে তাইই তো ভুলে গেছে আজকের মানুষ।

আমি তো বুক করে ফেললাম একটা।

স্নিগ্ধ হঠাৎ বলল।

ওর ভাবনার জাল ছিঁড়ে যাওয়াতে চমকে উঠল গৌতম।

মানুষের ভাবনার মতো দ্রুতগতি কোনো জেট-প্লেন কোনোদিনও বানাতে পারবে না মানুষ। মানুষের নিজস্বতার কাছেই, যা কিছুই সে জন্মসূত্রে মানুষ হওয়ার সুবাদে পেয়েছিল সেই সবকিছুর কাছেই তার সবচেয়ে বড়ো হার। জেট প্লেন আর ফাইভস্টার হোটেল কোনোদিনও একজন মানুষকে তার নিজস্বতা, তাকে যা দিতে পারত, তা দিতে পারবে না।

বুঝলি, বুক করেই ফেললাম।

এবারে কথা বলতেই হল গৌতমের।

বলল, কী?

স্ট্যান্ডার্ড-টু-থাউজান্ড। প্রায় আড়াই লাখ মতো পড়বে অন রোড। বলেছি, সাদা অথবা কালো দিতে। কালোতে পালিশ বেশি ভালো ওঠে। কালো কিন্তু দেখিনি! তুই কি দেখেছিস?

নাঃ।

গৌতম বলল। সংক্ষেপে। একটা হাই তুলে।

একটা মারুতি, একটা অ্যাম্বাসাডার আর একটা কন্টেসা আছে অবশ্য। কিন্তু আমার মেয়ের খুবই শখ স্ট্যান্ডার্ড-টু-থাউজান্ডের। ওর ক্লাসের তিনজন মেয়ের আছে। আজকাল, বুঝলি না, এই সবই হচ্ছে স্টেটাস-সিম্বল।

হুঁ।

গৌতম বলল।

ভি. সি. আর কিনেছিস?

স্নিগ্ধ শুধাল আবার।

না।

কথাটা মিথ্যে বলেনি। আবার পুরোপুরি সত্যিও নয়। পিয়ার দাদা সিঙ্গাপুরে গেছিলেন কাজে। পিয়ার জন্যে একটি ভি. সি. আর নিয়ে এসেছেন। ছোটোবোনকে দান করেছেন। কিন্তু ছবিটবি দেখা হয় খুবই কম। সেদিন মোৎজার্ট-এর জীবনীটা দেখেছিল। খুবই ভালো ছবি। কিন্তু উদ্‌বৃত্ত সময় পেলেই পিয়া এবং ও বই পড়ে গান শুনেই কাটায়। রবিবার বিকেলে ময়দানে এখনও রিলিজিয়াসলি ফুচকা খেতে যায় সকলে মিলে। নয়তো ভেলপুরি।

গৌতমের চাকরিটা সত্যিই মস্ত বড়ো। কিন্তু মস্ত মালটিন্যাশনাল কোম্পানির মস্ত চাকর ছাড়াও যে ওর অনেকেই এবং নিজস্ব পরিচয় আছে তা কোনোক্রমেই ও ভুলে যেতে চায় না। ছোট্ট ছোট্ট সুখ নিয়েই জীবন। যে সব সুখ, যে সব আনন্দ, চাকরিটা কালকে ও ছেড়ে দিলে অথবা রিটায়ার করলেও রাখতে বা করতে পারবে শুধু সেই সমস্ত সুখ এবং আনন্দতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না। চারপাশে চাকচিক্যময় চাকরদের ঝকমকানিতে ওর চোখ এমনিতেই ধেঁধেঁ থাকে।

অন্যদের মতো হতে চায় না ও।

আমি তো বাহাত্তর ইঞ্চি সোনি রিমোট-কনট্রোল-কালার টিভি আর একটা রিমোট কনট্রোল ভি. সি. আর নিয়ে এলাম এইবার হংকং থেকে। বাড়িতে অবশ্য ছিল একটা। টেলেরামার আই-টি-টি।

স্নিগ্ধ বলল, আশেপাশের অনেককেই শুনিয়ে।

বাঃ।

গৌতম বলল।

গৌতমের বাঃ বলার অপেক্ষা না করেই স্নিগ্ধ বলল, রবিবারে কী করিস?

বাড়িতেই থাকি।

গৌতমের মনে হচ্ছিল স্নিগ্ধর লাগাতার কথা শুনে যে এই কথোপকথন আসলে দুজনের জন্যে আদৌ নয়। স্নিগ্ধ নিজের সঙ্গেই নিজে কথা বলে যাচ্ছিল আসলে। নিজেকে অ্যামপ্লিফাই করছিল। গৌতম উপলক্ষ্য মাত্র। গৌতমের সঙ্গে দেখা না হলে ও অন্য কাউকে ধরেই এ কথাগুলো বলত।

আসলে, স্নিগ্ধর কোনো প্রশ্নেরই পুরো উত্তর দিচ্ছিল না গৌতম। স্নিগ্ধ ওর ছেলেবেলার প্রতিবেশী। খেলার সঙ্গীও ছিল। তারপর নিজের নিজের জীবনের অয়নপথ আলাদা হয়ে গেছিল ওদের।

প্রত্যেক মানুষের জীবনের মধ্যেই তার স্বাতন্ত্র্যের বীজ সুপ্ত থাকেই। কেউ কেউ সেই বীজ থেকে গাছ জন্মাতে পারে, কেউ আবার সেই বীজ যে ছিল আদৌ তা বুঝতে পর্যন্ত পারে না। যাদের গাছ বাড়ে, তাদের কারও বা বাড়ে বাইরের দিকে আর কারও ভিতরে।

জীবনই ওদের দুজনকে অনেক বদলে দিয়েছে। বাইরে থেকে মনে হয় অনেকই মিল দুজনের। আসলে তা আদৌ নয়।

আমি তো এভরি সানডেতে সকালবেলা ওয়াইফ আর ডটারকে নিয়ে টলিতে চলে যাই। আই মিন টলিগঞ্জ ক্লাবে। ডটার ঘোড়া চড়ে। ওয়াইফ সাঁতার কাটে। আর আমি গল্‌ফ খেলি। তারপর ক্লাবেই ব্রেকফাস্ট খেয়ে আসি। কোনো-কোনোদিন লাঞ্চও করি। কখনও বা হোল-ডে স্পেন্ড করি। দেয়ারস নো গেম লাইক গল্‌ফ।

তুই ডাংগুলিটা কিন্তু খুবই ভালো খেলতিস। আর খেস্তিদিদের বাড়ির সামনের ভাঙা ফুটপাথে মারবেল। পিট্টু খেলাও। মনে আছে? ডাংগুলি খেলা নিয়ে গাডলুর সঙ্গে তোর মারামারি হয়েছিল একবার?

অনেকক্ষণ পর একসঙ্গে এত কথা বলে ফেলে হাঁফিয়ে গেল গৌতম।

স্নিগ্ধ লজ্জিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। কলকাতার ফ্লাইট। কাছাকাছি দুজন বাঙালিও ছিলেন। তাঁরা গৌতমের কথা শুনতে পেলেন কি না তা চকিতে মুখ ঘুরিয়ে স্নিগ্ধ একবার দেখে নিল।

তারপর নীচুগলায় বলল, অ্যান্টি-ক্লাইম্যাকস করলি তুই গৌতম।

স্নিগ্ধ ভয় পেয়ে গেছিল। চেনা লোকেরা তো তাকে চেনেই। অচেনা লোকেদের কাছেও একটা ইমেজ গড়ে তুলতে বেশ নেশা-নেশা লাগে। তাদের কাছে ছোটো হতে সেই কারণেই খারাপও লাগে।

কেন? গৌতম বলল।

কোথায় গল্‌ফ আর কোথায় ডাংগুলি?

দুটোই তো খেলা। সব খেলাতেই কমবেশি আনন্দ তো থাকেই। আর আমাদের সেই ছেলেবেলাকার আনন্দের সঙ্গে তো আজকের আনন্দের তুলনা হয় না।

উত্তরে কী বলবে ভেবে না পেয়ে স্নিগ্ধ বলল, তা হলেও...

বলেই, চুপ করে গেল।

কলকাতার ফ্লাইট অ্যানাউন্সড হল এবারে।

গৌতম ভাবল, বাঁচা গেল এতক্ষণে স্নিগ্ধর হাত থেকে।

স্নিগ্ধও ভাবল, বাঁচা গেল গৌতমের হাত থেকে। কোথায় যে কী বলতে হয় তা জানে না। গৌতমটা আসলে ওদের ছেলেবেলার হরিশ মুখার্জি রোড থেকে বেরোনো ছাপোষা মানুষদের বাস ছিল যে গলিতে, সেই গলিতেই রয়ে গেছে মনে মনে। ওর লাইফ এই জেট-সেট-এজ, ওর সায়েবদের, থুড়ি মারোয়াড়িদের বিরাট কোম্পানির চাকরিও ওকে বদলায়নি বিশেষ। সে ওই হরেন রায়ের ছেলে গৌতম রায়ই রয়ে গেছে। ছ্যাঃ। টিপিক্যাল মিডল-ক্লাস মেন্টালিটির ঘরকুনো বাঙালি। কিস্‌সু হবে না ওদের। ওরা বদলে যাওয়াকে বড়োই ভয় করে।

গৌতম ভাবছিল, প্লেনে উঠেই চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়বে চেয়ারটা রিক্লাইন করে।

আজকাল ভাববার বড়ো একটা অবকাশই পায় না। যখনই এরকম ট্যাভেল করে তখনই ও একটু ভাববার সময় বের করে নেয়। তবে প্রতি ফ্লাইটেই চেনা জানা লোক অনেকেই বেরিয়ে যায়। তাঁদের অনেকেই কথা বলতে স্নিগ্ধর মতোই ভালোবাসেন। তবে স্নিগ্ধ, স্নিগ্ধরই মতো।

চান্সটিকেটে ভালো লেগ-রুমওয়ালা সিটও অনেকসময় পাওয়া যায়। খারাপের ভালো দিকও থাকে। শেষ মুহূর্ত অবধি ভি আই পি-দের জন্যে রেখে তখন ভালো সিটগুলো ওঁরা রিলিজ করেন বোধহয়। এদেশে ভি আই পি বলতে চোর-জোচ্চোর রাজনৈতিক নেতা বা আমলাদেরই শুধু বোঝায়। লেখক, গায়ক, বাজিয়েরা এদেশে নন-এনটিটি। আজ তেমনই ঘটেছে গৌতমের ভাগ্যে। সামনের গেট দিয়ে উঠেই একেবারে প্রথম রোতে-সিট। বাঃ।

বাঁদিকে জে-ক্লাসের কম্পার্টমেন্টের দিকে ঘুরে গিয়েই স্নিগ্ধ বলল, সি উ্য।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল গৌতম।

প্লেনটা সময়েই ছাড়বে। মনে মনে হিসেব করল। গাড়ি নিয়ে আসবে ছত্রবাহাদুর। বাড়ি পৌঁছোতে পৌঁছোতে, বাই-পাস দিয়ে গেলেও, সাড়ে আটটা বেজে যাবেই। মিস্টির স্কুলের বন্ধুরা ততক্ষণে সবাই চলে যাবে। পিয়া রাগ করবে। কিন্তু করার কিছু নেই। সকালের ফ্লাইটে যদি আসতে পারত। কিন্তু ওই নেরুলকারই তো ডোবাল মিটিংটা আজ লাঞ্চ অবধি গড়িয়ে দিয়ে।

ভাবনার মধ্যে ডুবে গেছিল গৌতম। প্লেন টেক-অফ করেছে। সিটবেল্ট লাগাবার এবং নো-স্মোকিং-এর সাইন সুইচড অফ হয়ে গেছে। ক্লান্ত লাগছিল, সারাদিনই ঘোরাঘুরি এবং মিটিং করছে। তাছাড়া, কাল হোটেলের ঘরে রাত দুটো অবধি ভিডিয়োতে ছবি দেখেছিল। ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল।

ঘুমোলি নাকি?

চোখ মেলে দেখল অ্যাইলে দাঁড়িয়ে তার সিটের মাথায় হাত রেখে স্নিগ্ধ। বুকের পকেটে সেই লাল-সাদা বোর্ডিং কার্ডটা উঁচু হয়ে আছে।

স্নিগ্ধ বলল দাঁড়া। আসছি।

বলেই, জে-ক্লাসের ল্যাভেটরিতে না গিয়ে ইকনমি ক্লাসের ল্যাভেটরিতে গেল প্লেনের পুরো দৈর্ঘ্য পেরিয়ে। কে জানে, কেন? ও যে জে-ক্লাসের প্যাসেঞ্জার তাই দেখাবার জন্যে?

ফিরে এসে গৌতমের পাশে ফাঁকা সিটটাতে বসে পড়ে অরেঞ্জবাটন প্রেস করে এয়ার হোস্টেসকে ডেকে বলল, দুটো গ্লাস আর বরফ দিতে। তারপর গৌতমকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়েই আবার বলল, আসছি এখুনি।

সামনে জে-ক্লাসের এনক্লোজারে গিয়েই ফিরে এল সিভাস রিগালের একটি পাইট নিয়ে। বলল, তোর কপালে ছিল। বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসেছিলাম গত মাসেই।

গৌতম কিছু বলল না। গ্লাসে যখন হুইস্কি ঢালছিল স্নিগ্ধ, তখন ও বলল, অল্প দিস কিন্তু। আমি কালেভদ্রে খাই।

চিয়ার্স!

চিয়ার্স। তোর ফেভারিট ব্র্যান্ড কী? জাস্ট নেম ইট। তাকে পাঠিয়ে দেব।

স্নিগ্ধ বলল।

কিছুই না। নান ইন পার্টিকুলার।

গৌতম বলল।

সান্টাক্রুজ এয়ারপোর্টে দেখা হওয়ার পর থেকে এতক্ষণেই গৌতমকে একটুও ইমপ্রেসড করতে না পেরে স্নিগ্ধ রীতিমতো ফ্রাস্টেটেড ফিল করছিল।

গৌতমও ফ্রাস্টেটেড ফিল করছিল স্নিগ্ধকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে না পেরে। সেই তখন থেকে সিন্দবাদ নাবিকের মতো চেপে বসে আছে ঘাড়ে।

ওরা দুজনে বন্ধু কখনোই ছিল না। বন্ধু অবশ্য একজীবনে ক-জনই বা হয়। একসময়ের অভিন্ন হৃদয় বন্ধুরাও দূরে যাবার পর, বিয়ে করার পর কত সহজেই ভিন্ন হৃদয় হয়ে যায়। এসবই ও নিজের জীবনে দেখেছে। নানা করণেই তাই নতুন সম্পর্ক কারও সঙ্গেই পাতাতে চায় না গৌতম। যে সব সম্পর্ক মাত্রা পেয়েছিল তাদেরই নিজ নিজ মাত্রাতে ধরে রাখা গেল না যখন, তখন নতুন কোনও সম্পর্কতেই আর বিশ্বাস করে না ও।

ছেলেবেলাতে ওরা দুজনেই নিম্ন-মধ্যবিত্ত সাধারণ পরিবেশের একই পাড়ায় বসবাসকারী দুটি পরিবারভুক্ত ছিল। একই শ্রেণির। জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ প্রায় পেরিয়ে এসে আবার ওরা একই শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। যদিও এ এক অন্য শ্রেণি। সম্পূর্ণই অন্য। তবুও স্বার্থগত সমতার কারণে এক শ্রেণির মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব খুবই তাড়াতাড়ি এবং সহজে হয় বলেই হয়তো স্নিগ্ধ চাইছিল ছেলেবেলার সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবিত করতে। কিন্তু গৌতম চাইছিল না। গৌতম জানে যে, স্নিগ্ধর সঙ্গে বন্ধুত্ব বড়ো বয়সে হবে না আর ডাংগুলি মারবেল আর পিট্টু খেলার দিনে সবকিছুই অন্যরকম ছিল। তখন অসাধ্যও সাধন করা যেত। তা ছাড়া গৌতম এও শুনেছে যে, স্নিগ্ধ কী করে বিরাট বড়োলোক হয়েছে। অথচ সমাজ ওকে মেনে নিয়েছে। মাথায় করে রেখেছে। ব্যাবসাটা স্নিগ্ধর অনেকগুলো মুখোশের একটা মুখোশ। পড়াশোনাতে স্নিগ্ধ বাজে ছিল। ক্লাস এইটে না নাইনে একবার ফেলও করেছিল। অঙ্কের স্যার নাকে বড়ো এক টিপ নস্যি নিয়ে ওকে ডাকতেন, "এই যে স্নিগ্ধ গর্দভ" এদিকে এসো। শুনেছে, স্নিগ্ধদের সেকশনের ছেলেদের কাছে। গৌতম ছিল স্কুলের গর্ব এবং স্নিগ্ধ অন্যতম কলঙ্ক। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষাতে শেষের দিক থেকে থার্ড হয়েছিল, স্নিগ্ধ যারা পাশ করেছিল তাদের মধ্যে। থার্ড ডিভিশনই পেয়েছিল। তারপর ও কোন কলেজে পড়েছিল জানে না। দেখা হয়ে গেছিল বছরকয়েক আগে। এমনি করেই মুম্বাই এয়ারপোর্টে। তারপর প্রায়ই দেখা হয়েছে এখানে-ওখানে। গতবছর রোটারির মিটিং-এ। চেম্বার অফ কমার্সের একটি সাবকমিটির মেম্বার হিসেবেও

দেখা হয়েছিল। স্নিগ্ধ হয়তো কোনোদিন চেম্বারের প্রেসিডেন্টও হয়ে যাবে। তাতে গৌতমের যাবে আসবে না কিছুমাত্র। ও চিরদিনই নিজেকে এই স্নিগ্ধদের থেকে অন্য ক্লাসের বলে জেনে এসেছে। স্নিগ্ধ আজ যত বড়ো ব্যাবসাই করুক, সিভাস-রিগ্যালই খাক রোজ অথবা স্ট্যান্ডার্ড-টু-থাইজ্যান্ড বুকই করুক অথবা একজিক্যুটিভ ক্লাসে ট্র্যাভলই করুক, গৌতমের ক্লাসে ও কোনোদিনই উঠতে পারবে না।

একটা ড্রিংক শেষ করেই স্নিগ্ধ বলল, আর একটা নে।

না।

কেন? কী হল?

এবার সামান্য প্রচ্ছন্ন বিরক্তি ফুটে উঠল স্নিগ্ধর গলায়।

এমনিই। আমার লিমিট একটা।

তুই চিরদিনই বড়ো হিসেবি।

জানি।

যারা হুইস্কি খাবার সময়েও হিসেব করে খায়, তারা মানুষ সুবিধের নয়।

জানি।

আবার বলল গৌতম।

স্ন্যাকস সার্ভ করবে বলে অ্যানাউন্স করল। জে-ক্লাসের খাওয়াটা সামান্য ভালো ইকনমি ক্লাস থেকে। তাছাড়া, টেক অফ্-এর পরে ওডিকলোন মাখানো ঠান্ডা ফেস টাওয়ালও দেয় ওই ক্লাসে, ক্লান্ত ঘর্মাক্ত প্যাসেঞ্জারদের টাটকা হয়ে নেবার জন্যে।

আরও একটা হুইস্কি ঢেলে বোতলটা সাফারি স্যুটের পকেটে ভরে স্নিগ্ধ বলল, এই রাখ। আমার একটা কার্ড। উই মাস্ট মিট মোর অফট্যান।

কার্ডটা নিয়ে, ওর স্যুটের পকেটে রাখল গৌতম।

তোর কার্ড নেই?

স্নিগ্ধ শুধোল।

বাক্স-ভর্তি কার্ড ছিল ব্রিফকেসে। গোটাচারেক ছিল পার্স-এও। কিন্তু গৌতম বলল, আনতে ভুলে গেছিলাম এবারে।

তোর অফিসের নাম আর নাম্বার কত? মানে, ফোনের?

গৌতম ইচ্ছে করেই অন্য একটা কোম্পানির নাম বলল। তারপর ভুল এক্সচেঞ্জ। ভুল ফোন নাম্বার।

স্নিগ্ধ সেই লাল-সাদা বোর্ডিং পাস-এর পেছনে লিখে নিল।

তারপর বলল, চলি।

গৌতম ঠান্ডা গলায় বলল, আয়।

ছেলেবেলার সহপাঠী, খেলার সাথি, এক পাড়ার ছেলের আশ্চর্য শীতল ব্যবহারে, আন্তরিকভাবে দুঃখিত, অনেক খেটে বড়োলোক হওয়া একটু বোকা কিন্তু খুব সরল, হতভম্ব স্নিগ্ধ জে-ক্লাসে গিয়ে ওর সিটে বসল।

স্নিগ্ধ ভাবছিল, জীবনের পথে কে কোথা থেকে রওয়ানা হয়েছিল সেটা কোনো ব্যাপারই নয়, কে কোথায় পৌঁছোল সেটাই আসল। পৌঁছোতে পারাটাই ...। জীবনে স্বচ্ছল হওয়ার স্বপ্ন দেখে সব মানুষই। কিন্তু স্বচ্ছল হতে পারার মধ্যে যেমন আনন্দ আছে এক ধরনের তেমন দুঃখও আছে গভীর। বড়ো একা লাগে, পরিত্যক্ত। স্বচ্ছল মানুষ মাত্রই তা জানে। সকলকে জড়িয়ে ধরে থাকতে চাইলেও হাত ছাড়িয়ে চলে যায় সকলেই। যাদের জড়াতে চায়, তারা কাছে থাকে না; যারা থাকে, তাদের চায় না ও। তারা সব ধান্দাবাজ, নিজেদের স্বার্থেই ভিড় করে শুধু।

গৌতমটা খুবই ভালো খেলত। লেফ্‌ট উইংগার ছিল। ওর স্বভাব, ব্যবহার চেহারা সব কিছু দেখেই ওকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করত। স্নিগ্ধর মা বলতেন, গৌতমের মতো হতে পারিস না? সোনার টুকরো ছেলে।

জীবনে স্বচ্ছল হওয়া, গাড়ি করা, বাড়ি করা, কেওকেটা হওয়া, নামি ক্লাবের মেম্বার হওয়া ওইসবই তো "হওয়া"। অথবা, এই-ই সব নাকি? মা তো এই "হওয়ার" কথাই বলেছিলেন। হয়েওছে আজ স্নিগ্ধ। কাউকে ঠকায়নি, চুরি করেনি, অনেক খেটে এই ব্যাবসা এক হাতে দাঁড় করিয়েছে। চল্লিশ বছর অবধি কোনো সুখের মুখই দেখেনি। তাই অতৃপ্ত বাসনাগুলোকে যে একটু হুড়োহুড়ি করে পূর্ণ করছে তা ও জানে। মা অনেকদিন আগেই চলে গেছেন। তখনও স্নিগ্ধ এরকম বড়ো করেনি ব্যাবসা। মা থাকলে, খুবই খুশি হতেন। মা নেই বলেই আজ গৌতমকে কাছে পেয়ে মায়ের কথা মনে পড়ছে খুবই।

স্নিগ্ধ অবশ্য নিজের কথা একটু বলে। একটু বেশিই বলে যে, তা ও জানে। কিন্তু এই বাজে পৃথিবীতে অন্য মানুষের প্রশংসাও তো মুখ ফুটে একজনও করে না। সে কারণেই ও নিজের প্রশংসা নিজেই করে। অন্যর গর্ব চুক্তি তো ও করেনি। ভিক্ষাও চায়নি কারও কাছে। নিজের কথা বলে একটু আনন্দ পায়, ভালো লাগে। ও যে চালিয়াতি করার জন্যে করে, তা নয়। অনেকে যদিও ভুল বোঝে ওকে। স্কুলের পরীক্ষায় কবে ফেল করেছিল, কোনো সময় ফুটপাথে পিট্টু বা মারবেল খেলত সেইজন্য চিরদিনই গৌতম তাকে হেয় করে যাবে এটাই বা কেমন কথা?

স্নিগ্ধ বড়ো করে আরও একটা হুইস্কি ঢালল। খুবই দুঃখ হল ওর। নিজের জন্য। গৌতমেরও জন্যে। কিছু মানুষ নিজেদের গড়ে তোলা একটা শক্ত খোলার মধ্যেই জীবনটা কাটিয়ে যায়। নিজেদের মতো আর "কেউই" নয় এই ভেবে। খোলাটা ভেঙে বাইরে বোরাতে পারলে তারা জানতে পেত জীবনে সত্যিই অনেক আনন্দ আছে। এত কষ্টের মধ্যেও। নিজের জন্যও কষ্ট হল স্নিগ্ধর। ভাবল, কিছু পেলে, কিছু ছাড়তে হয়ই। জীবনের খেলাতে এই রকমই নিয়ম। ফুল ফুটলে, কাঁটার ঘের থাকেই। কিছুই করার নেই।

স্নিগ্ধ ভাবছিল, এগজিক্যুটিভ ক্লাসকে জে-ক্লাস বলে কেন কে জানে?

জে-ফর জেলাসি। তাই জন্যেই কী?

বোঁদেদা

বোঁদেদার সঙ্গে প্রথমদিন দেখা হওয়ার কথাটি পরিষ্কার মনে আছে। বোঁদেদাকে একবার যিনি দেখেছেন তাঁর পক্ষে কখনোই ওঁকে ভোলা সম্ভব নয়। অবশ্য তাঁর সার্কলও ছিল বিরাট। কলকাতা তো বটেই, ভারতবর্ষের এবং বিদেশেরও সব জায়গাতেই তাঁর জানাশোনা মানুষের কমতি ছিল না।

আলিপুরের উডল্যান্ডস এস্টেটে একটি বহুজাতিক সংস্থার ডিরেক্টরের ফ্ল্যাটে পার্টি। উডল্যান্ডস নার্সিং হোমের উলটোদিকে। অফিসে অনেক ঝামেলা ছিল তাই যেতে দেরি হয়ে গেছিল। পৌঁছে দেখি পার্টি বেশ জমে উঠেছে। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে লনের শোভা দেখতে দেখতে প্রিমিয়াস স্কচ-এর গ্লাসে সবে প্রথম চুমুক দিয়েছি ঠিক এমন সময় একজন লম্বাচওড়া ভুঁড়িওয়ালা ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন আমার দিকে।

ভদ্রলোককে আগে দেখিনি। তবে মুখ দেখে মনে হল বেশ তুরীয় অবস্থায় আছেন। উনি এসেই সম্পূর্ণ অপরিচিত আমাকে বললেন, বোকাটা! বসে বসে কেউ মাল খায়?

অতজন সুন্দরী মহিলার সামনে সম্পূর্ণ অপরিচিত কেউ হঠাৎ বোকা বললে বুদ্ধিমানেরও খারাপ লাগার কথা। তবে ভদ্রলোক যে মানুষ ভালো সে কথা তাঁর মুখেই লেখা ছিল।

আমি আমতা-আমতা করতেই উনি বললেন, হ্যাঁরে। সায়েবরা কী বলেছে জানিস না?

কী?

আমি এবারে *যথার্থ* বোকারই মতো বললাম।

বোঁদেদা বললেন, সায়েবরা বলেছে, "হাউ মেনি ড্রিঙ্কছিল ক্যান উ্য স্ট্যান্ড?" তাঁরা কি এ কথাও বলেছিল "হাউ মেনি ড্রিংকস ক্যান উ্য সিট?"

আমি হেসে ফেললাম ওঁর কথায়।

তারপরই কে যেন ওঁকে ডাকলেন ড্রইংরুমের ভিতর থেকে। উনি চলে গেলেন। এবং উনি চলে যেতেই হোস্ট কুটুদা আমার কাছে তাড়াতাড়ি এসে বললেন, আপসেট হওনি তো জীবু?

হেসে বললাম আপসেট হব কেন? চমৎকার রসিক মানুষ। খুব ইনটারেস্টিংও।

ইতিমধ্যেই আবার ওঁকে আমারই দিকে ফিরে আসতে দেখা গেল। রায়সাহেব বললেন, এই যে বোঁদেদা, তোমার কথাই হচ্ছিল। আলাপ আছে?

নেই কিন্তু হতে কতক্ষণ?

এ হচ্ছে পুরোনো বন্ধু আমার। লেখে।

লেখে? কী লেখে? জাবেদা? না প্রেমপত্র?

আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম। ওঁর কথাতে। এবং কথা বলার ধরনেও।

বলতে পার দুই-ই। পেশাতে ও ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট কিন্তু নেশাতে লেখক।

ডেঞ্জারাস কম্বিনেশন।

মন্তব্য করলেন, বোঁদেদা।

বলেই বললেন, নামটা তো বললে না হে।

ওর নাম জীবনানন্দ।

ও তাই বলো। জীবনানন্দ দাশ তো।

অস্বস্তি এবং বিড়ম্বনায় আমার কান লাল হয়ে উঠল।

একজন মহিলা প্রতিবাদের গলায় বলে উঠলেন সাহিত্যর কত খবরই আপনি রাখেন বোঁদেদা! জীবনানন্দ দাশ তো অনেকদিনই গত হয়েছেন।

আরে ওই হল। পোয়েটেরা আসলে কোনোদিনই গত হন না। তাঁরা হচ্চেন গিয়ে ইমমরটল। সব পোয়েটই। কবিতা সম্বন্ধে আমারও একসময় একটু উইকনেস ছিল। বুয়েচিস বোকা। আমিও একসময় কিছু লেকালেকি করেছিলাম।

কবিতা? আপনি?

ভদ্রমহিলা, মিসেস সুন্টু সেন, চোখ কপালে তুলে জিগ্‌গেস করলেন।

ইয়েস ম্যাম। আমি। এই বোঁদে বাঁড়ুজ্যে। কেন? বিশ্বেস হচ্ছে না? অবশ্য হোল-লাইফে মাত্র দুটোই লিখেছিলাম। মানে কবিতা।

বললাম মাত্র দুটোই যখন লিখেছিলেন তখন মনে নিশ্চয়ই আছে।

বিলক্ষণ!

তবে শোনানই না হয়।

শোন তবে বোকাটা! তোকে তুইতোকারি কচ্চি বলে চটিসনি তো? বিধান রায়ের মতো আমিও কাউকে আপনি বলতে পারি না। হ্যাঁ যা বলছিলুম, প্রথমটা হচ্চে গিয়ে :

"এক ঠোঙা খাবার নিয়ে যায় মতিলাল।

তাই দেখে দূর থেকে মারলে ছোঁ চিল!!"

কাছাকাছি যারাই ছিলেন সকলেই তো বোঁদেদার কবিতা শুনে থ।

মিসেস সুন্টু সেন বললেন, এ কীরকম কবিতা হল?

কেন? তোমাদের আধুনিক কবিতার চেয়ে এই প্রাচীন কবিতা কোন দিক দিয়ে খারাপ? তোমরা তো লিকে ফ্যালো চাঁদমুখ করে : "প্রিয়তমা, আমার সঙ্গে তোমার দেকা হবে গতকাল।" আমার কবিতায় মতিলালের 'ল'-এর সঙ্গে চিলের 'ল'-এর মিল কি নেই?

তা আছে। আমি বললাম।

তারপর বললাম আর দ্বিতীয় কবিতাটি? মাত্র দুটিই যখন লিখেছিলেন, মনে আছে নিশ্চয়ই।

মনে আর থাকবে না? সেটি অবশ্য ছিল দেশাত্মবোধক কবিতা। কিন্তু আমার স্কুলের বাংলার মাস্টের অশ্লীল বলিয়া বিবেচনা করতঃ আমার কবিদশা অতঃপর নাশ হয়। এখন অবশ্য দেশসেবা এবং অশ্লীলতা প্রায় সিনোনিমাসই হয়ে উঠেছে। কী বলচিস?

কবিতাটা বলুন।

মিসেস সুন্টু সেন বললেন।

তখন ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। বুয়েচিস। কলকাতার ফুটপাথে ফুটপাথে মানুষ মরে পড়ে আছে। তা দেকে আমার শিশু বুক দুঃকে উতলে উঠত। একদিন গলে-যাওয়া হৃদয় নিংড়ে লিখলাম :

"দুর্ভিক্ষে সারাটা বঙ্গ করে হাহাকার
লোক নেই, পড়ে আছে ল্যাঙট তাহাব।"

সকলেই হেসে উঠলেন।

তোমরা তো হাসবেই অর্বাচীনের দল। নইলে বাঙালির এমন অবস্থা হয় আজ?

মিসেস সুন্টু সেন গম্ভীর হয়ে বললেন তা নয়, মানেটা ঠিক বুঝতে পারিনি তো তাই।

মানেটা বোঝা কঠিন কি হল? মানুষটা না খেয়ে মরে গেচে। করপরেশনের গাড়ি বডি তুলে নিয়ে গেচে। কিন্তু বেচারির ল্যাঙটটি রাস্তায় পড়ে আচে। তোমাদের আধুনিক কবিরা হলে এই কবিতাই লিখে তার নাম দিয়ে দিত "এপিটাফ"। হইহই পড়ে যেত কবি মহলে। সাধু! সাধু! বলত সকলেই।

কুটুদা ইন্টারাপ্ট করে বললেন, এই দুটি কবিতাও কিন্তু তোমার লেখা নয় বোঁদেদা। *এ দুটোই আমাদের রঘুদার কবিতা। রঘু ব্যানার্জির। কলকাতায় অনেক মানুষই এই* কবিতার কথা জানেন। রঘুদার নিজের মুখ থেকেই তাঁরা শুনেছেন অনেকবার।

বোঁদেদা বললেন, শোনেননি, এমনও অনেকে আচেন। তোরা এই মিসম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টের দল বুদ্ধি একটু কম ধরিস। সকলেই জানে যে দু দুটো রঘুদার কবিতা। তবে তোদের কারও শুনতে কি খারাপ লেগেচে? নাম বলেই যদি শালা আবরিত্তি করব তো রঘু বাঁড়ুজ্যের কবিতা কোন দুঃখে র‍্যা? রবেঠাকুর কী দোষ করে? পরের জিনিস

নিজের বলে মনে করাকে চুরি করা বলে না। মনটা যদি খুঁত খুঁত করে তবেই সেটা চৌর্যবৃত্তি।

আমি যেহেতু দেরি করে গেছিলাম কুটুদা কিছুতেই তাড়াতাড়ি ছাড়লেন না। সকলেই একে একে চলে যেতে লাগলেন বুফেতে খাওয়া সেরে। তখন বুঝিনি যে আমাকে বোঁদেদার লাশ সামলাবার জন্যেই আটকে রাখছেন উনি। বোঁদেদাকে কুটুদা বিলক্ষণ চিনতেন। আমার সঙ্গেই এই প্রথম আলাপ।

খাওয়াদাওয়ার পর কুটুদা বললেন, বোঁদেদা আপনি কি গাড়ি এনেছেন?

নিশ্চয়ই। কেন? কাউকে লিফট দিতে হবে নাকি? বোকাকে? কি রে বোকা?

এই রে। এই অবস্থায় নিজে গাড়ি চালাবেন কী করে?

আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে নীচু গলায় কুটুদা বললেন।

তোমার ড্রাইভার আছে জীবু?

আবারও নীচু গলায় কুটুদা শুধোলেন।

না। কিন্তু এ-তো আর বাইসাইকেল নয় যে একাই দু হাতে জোড়া-সাইকেল চালিয়ে চলে গেলাম কিড়িং-কিড়িং করে!

একটু পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে কুটুদা বললেন, ঝামেলি হবে। গ্রেট ঝামেলি। মাঝে মাঝেই বোঁদেদা এমন করেন। সবসময় কিন্তু নয়। ইচ্ছে করেই আমাকে হয়রানি করার জন্যে করছেন কি না কে জানে। একটা ব্যাপরে আমার উপরে খুব রেগে রয়েছেন। এমন গুগলি মার্কা লোক কমই দেখেছি।

লিফ্‌ট অবধি আমি আর কুটুদা বোঁদেদাকে ধরে তো নিয়ে গেলাম। গন্ধমাদন পর্বত বইতেও পবননন্দনের এত ঝক্কি পোয়াতে হয়নি। মনে হচ্ছিল ভূমিকম্প হচ্ছে। একবার পর্বত আমার গায়ে ভর করছেন, আর-কবার কুটুদার গায়ে। তবে বাঁচোয়া এই যে ভূমিকম্পই ছিল তখন, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়নি। কিন্তু চিত্তির হল লিফ্‌ট থেকে নীচের ল্যান্ডিং-এ নামতেই। বড়ো বড়ো কোম্পানির বড়ো বড়ো সাহেবরা থাকেন এখানে। এ বাড়িতে পার্টি লেগেই থাকে, কিন্তু মাতাল দেখা যায় না বড়ো। দাঁড়িয়ে থাকা পর্বতপ্রমাণ মানুষটি অদৃশ্য করাতে কেটে গিয়ে গদ্দাম আওয়াজ করে চোখ বুঁজে ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে গেলেন ওই রেসপেক্টেবল পরিবেশের শ্রাদ্ধ করে দিয়ে।

কুটুদা নিজেকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, দেকেচো! ভালো স্কচ-এর এই দোষ। কখন যে ধস নামাবে তা সেই জানে। যেন, ডিলেড-অ্যাকশন টাইম বম্ব।

আমি বললাম, এবার থেকে আপনার বাড়ির পার্টিতে বিশুদ্ধ বাংলাই খাওয়াবেন। সঙ্গে খিচুড়ি আর প্যাঁজের চাট। বেয়ারা-বাবুর্চি, ভেটকি-মেয়োনিজ, চিকেন-আ-লা-কিয়েভ এ সবের বাহুল্য আদৌ দরকার নেই। যা হবার, তা ছোটো ব্রিস্টলের মতো তড়িৎ-ঘড়িৎই হয়ে যাবে।

বোঁদেদা ফ্ল্যাট হয়ে তখনও পপাতধরণীতলে শুয়ে আছেন। মরেই গেলেন কি না

বোঝা যাচ্ছে না। ঠিক সেই সময়ই একটি ঝকঝকে কালো মার্সিডিস গাড়ি থেকে নেমে ডিনার জ্যাকেট পরা, বো-লাগানো একজন সাহেব ল্যান্ডিং-এ ল্যান্ড করলেন। খয়েরি গোঁফ জোড়া। কুচুটে চোখ জোড়া। চেহারা দেখে মনে হয় আয়ারলন্ডে বাড়ি।

কুটুদা লজ্জিত গলায় অধোবদনে বললেন, গুড নাইট এরিক। এরিক-নামক সেই গুঁফো সাহেব পাইপের গোল্ড ব্লক টোব্যাকোর ধোঁয়া ছেড়ে, আড়চোখে হাতঘড়ির দিকে চেয়েই সাঁতরাগাছির ওলের মতো ছিটেল মুখ ফাঁক করে বললেন, গুড মর্নিং কুটু! ভেরি গুড মর্নিং ইনডিড।

ঘড়িতে দেখলাম সোয়া একটা বাজে।

সাহেব বললেন, নিড এনি হেল্প? উ্য লুক ভেরি পারটার্বড।

কুটুদা বললেন, নো, নো। থ্যাংক উ্য ভেরি মাচ এরিক। বাট হি উইল বি নর্ম্যাল, আই মিন, সোবার। সুন।

এরিক লিফট্-এ উঠে উপরে চলে গেলেন।

কুটুদাকে শুধোলাম কে?

আমাদের কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। কুটুদা এমবারাসড গলায় বললেন।

দারোয়ানদের ডেকে তাদের সাহায্যে তো বোঁদেদাকে প্রথমে বসানো হল। তারপর দাঁড়ও করানো হল সোজা করে। কুও ডেভিস সিনেমাতে দেখা গলিয়াথ-এর মতো উঠে দাঁড়ালেন বোঁদেদা। কুটুদার প্রেস্টিজ তো পাংচারড হয়ে গেল দারোয়ানদের সামনে। কাঁদো-কাঁদো গলায় আমাকে বললেন, জীবু, বোঁদেদার গাড়িটা রেখে দিচ্ছি এখানে। তুমি ওঁকে একটু পৌঁছে দাও।

কথাটা ওভারহিয়ার করে বোঁদেদা বললেন, আমি জীবনে পরের গাড়িতে চাপিনি। যতদিন বাঁচি চাপবও না।

কুটুদার কুচুটে মুখের দিকে আমি চেয়ে রইলাম। বিপদে বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছেন। গলিয়াথ-এর দু হাত দুজনে ধরে হাঁটি-হাঁটি পা পা করে পার্কিং-লট এ গিয়েই দেখি, খাইছে! এ যে বেন্টলি গাড়ি। সাদা রঙা। আজকালকার লিমুজিনের মতো লম্বা প্রায়। লাট্টু গিয়ার। কুটুদার বোঁদেদাকে কাচের বাসনের মতো সাবধানে তুলে দিয়েই আমাকে বললেন কানে কানে স্লাম্বারে আছে জীবু। ডিসটার্ব না করে স্ট্রেট চালিয়ে চলে যাও। এই বেলা।

অসহায়ের মতো আমি বললাম, আমার গাড়ি।

সে দায়িত্ব আমার। কাল সকাল আটটার মধ্যে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে আমার ড্রাইভার। আর কথা বাড়িও না। স্ট্রেইট চলে যাও।

কী বিপদ! যাবটা কোথায়? মানুষটার পুরো নাম পর্যন্ত যে জানি না। ঠিকানাও জানি না। বোঁদে গলেছে বলেই তো যে-কোনো মিষ্টির দোকানে গিয়ে সেঁটে দিয়ে আসতে পারি না। এই প্রাগৈতিহাসিক মডেলের বেন্টলি গাড়ি জীবনে চোখে দেখিনি, চাপা তো

দূরের কথা। কোন ফুটোতে গাড়ির চাবি গলাব সেটা পর্যন্ত জানা নেই। কিন্তু আমার এত সব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্যে অপেক্ষা না করে আমার গাড়ির চাবিটা আমারই পকেট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তিন লাফে ডেঞ্জার এরিয়া ক্লিয়ার করে লিফ্‌টের গর্তে ঢুকে গেলেন। ভাবলাম এমন স্ট্র্যাটেজিস্ট না হলে কি উন্নতি করা যায়?

সামনে চেয়ে দেখলাম উর্দিপরা দারোয়ানেরা বিরক্ত হয়ে অপেক্ষা করছে আপদেরা কখন বিদায় হবে। ঘড়িতে দেখলাম রাত দেড়টা।

বোঁদেদা ঘাড় এলিয়েই স্বগতোক্তি করলেন, ঘড়ি দেকিসনিরে বোকাটা! নাইট ইজ ভেরি ইয়াং। সে সোমথ বেটি লজ্জা পাবে যে র‍্যা!

চাবিটা ডেসপারেট হয়ে র‍্যানডম ফুটোময় ডাশবোর্ডের ফুটোতে ঢুকোতে চেষ্টা করতে লাগলাম। একটা ফুটোতে এঁটেও গেল। চাপ দিতেই গাড়ির এঞ্জিন গর্জন করে উঠল।

বোঁদেদা চোখ বন্ধ করেই বললেন, কেমন বলচে শুনেচিস? যেন মৌজুদ্দিনের গলা। শালা! এই নইলে ব্যাটাচেলের গাড়ি।

সম্বন্ধ করে বিয়ে করেছে এমন নববিবাহিত স্বামী যেমন অতি ভয়ে ভয়ে নববিবাহিতা স্ত্রীর অঙ্গ এবং প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করে তেমনই দ্বিধাকম্পিত হাতে, থুড়ি পায়ে; আমি অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিলাম, লাট্টু গিয়ারকে ফারস্ট গিয়ারে ফেলেই। খানদানি গাড়ি বলে ব্যাপার। গাড়ি আনাড়ি ড্রাইভারের ভয় অগ্রাহ্য করে স্মুথলি এগিয়ে চলল। দু কদম এগোতেই বোঁদেদার নাক ডাকতে লাগল। একেবারে কুম্বকর্ণ পারসোরনিফায়েড।

বিপদটা ঘটল গেট থেকে বেরুতেই। ডানদিকে ঘুরতে হবে এবারে। ব্রেকে পা দিতেই দেখি ফুস্‌স-স্‌-স্‌। উডল্যান্ড নার্সিং হোমের দেওয়লে প্রায় ধাক্কাই লাগাবার উপক্রম হল। নার্সিং হোমের দারোয়ানরা তো তেড়েই এল। একজন ঘাড় নীচু করে অন্যজনকে বলল, পিয়ে হুয়ে হ্যায় ক্যা?

এদিকে কুটুদার বিল্ডিং কমপ্লেক্স-এর দারোয়ানেরা আমাদের রেসকিউ-এ ছুটে এল। বড়োলোকদের চেয়ে তাদের দারোয়ানদের ইজ্জত জ্ঞান অনেকেই বেশি। আফটার অল আমরা উডল্যান্ডস এস্টেটসের মেহমান।

তিনপাক-ফলস স্টিয়ারিংটা বনবন করে অনেকক্ষণ ঘুরিয় গাড়িটাকে ডানদিকে একটু ঘুরোতেই দেখি বোঁদেদা আমাকে ধমকে বললেন গাড়ি ঠিকসে চালা রমদীন। নইলে তোর মেয়ের বিয়েতে যে কুড়ি হাজার টাকা দেবো বলেছিলাম তার একটি পয়সাও দোবো না।

এই রে নেশার ঝোঁকে আমাকে বোধ হয় ড্রাইভার ভাবছেন। স্কচ হুইস্কির ব্যাপারই আলাদা। এই ঘুম পাড়ায়, এই জাগায়।

এদিকে ব্রেক ফুসস্‌-করায় গাড়ি প্রায় উডল্যান্ডস নার্সিংহোমের দেওয়ালেই গিয়ে ধাক্কা মারে আর কি। সেই গভীর রাতে গাবলু গুবলু বাচ্চা প্রসব করা সারে সারে শুয়ে থাকা বড়োলোকের বউয়েদের গর্বমাখা সুখে বিঘ্ন ঘটিয়ে দারোয়ানদের চাপা দিতে দিতেও না

দিয়ে গাড়ি গোঁ গোঁ করে এগিয়ে চলল। বড়ো রাস্তায় পড়ে আন্দাজেই বাঁ দিকে আবার বনবন করে স্টিয়ারিং কাটালাম। দু পাক ঘোরালে এক ইঞ্চি কাটার এফেক্ট হয়। কিন্তু যাবটা কোথায়? কাতর গলায় ঘুমন্ত বোঁদেদাকে প্রশ্ন করলাম।

বোঁদেদা বললেন, চোপ শালা নিমকহারাম। তোর গাঁয়ের সবক-টা লোকই নেমকহারাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটছে লক্ষ করলাম। চোখ না খুলেই বোঁদেদা গাড়ি কোনো মোড়ে এলেই বলতে লাগলেন বাঁয়ে। ডাইনে সোজা ইত্যাদি। কিছুক্ষণের মধ্যেই উত্তর কলকাতার কেনিয়ান সাফারি র‍্যালির রাস্তায় পৌঁছে গেলাম। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু।

হঠাৎই বোঁদেদা বললেন সোনাগাছি পেরিয়ে এলাম, না রে? চোখ বন্ধ করেই বললেন।

হ্যাঁ। বোধহয়।

বোদয় মানে কী করে শালা? নেকুপুসু আমার। যাসনি কখনও?

বিরক্তির গলায় বললাম, না।

কেন?

গুরু পাইনি।

তাই? আমি নে যাব তোকে। গুরুর অভাব কী? গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা মিলে এক।

এবার ডানদিকে চল। তোকে মিদের দোকানের পান খাওয়াব। বেনারস থেকে মঘি আনে। এ কী রে এই সন্দেবেলায় দোকান বন্ধ করে শালা বাড়ি চলে গেল। দ্বিতীয় পক্ষর বউ তো। কিন্তু এগারোটা পর্যন্ত তো খোলা রাখেই।

বললাম, এখন দুটো বেজেছে।

বেলা দুটো? বলিস কী করে? অথচ রোদ নেই মাইরি একটুও। শালা একই বলে ঘোর কলি।

আস্তে। আস্তে। ওই সামনে বাঁয়ের গেট। বোঁদেদা বললেন। ব্রেক চাপলাম শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে। কুসস্-স্স। স্টিয়ারিং ঘোরলাম বাঁইবাঁই করে। ক্যালামিটি না ঘটিয়ে টায়ে টায়ে গেটে ঢুকে থামালাম গাড়ি এক বিরাট প্রাসাদের ভিতরের পর্চ-এ।

গাড়ি থামতেই আমি বললাম, আমি এবার যাব বোঁদেদা।

যাবি? কোথায় যাবিরে বোকা খোকা? আমার সুন্টুপুটুং ঘুচুংপুচু? বাঁড়ুজ্যে বাড়িতে ঢোকা সহজ কিন্তু বেরুনো সহজ নয়। সে তওয়ায়েফ, ওয়াইফ অথবা পোঁদ-লাল বাঁদর কী ঠোঁট লাল টিয়া যেই হোক না কেন।

ঘু-ঘুচু! বলে ডাকলেন বোঁদেদা। একজন লোক এসে দাঁড়াল। তাকে দেখে মনে হল সে দিনে ঘুমোয় রাতে জাগে। চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই বাড়ি পানাগড়ে না পানাজিতে।

বোঁদেদা বললেন, ড্রাম্বুই আর সিগার আন।

অবাক হয়ে আমি বললাম, রাত আড়াইটের সময়?

নাতো কী? তুই শালা আমার আসলি দোস্ত। তুই যা করলি, জবাব নেই। কুটুকে কেমন কুটুস দিলুম এককানা? তুই যা করলি, রামপেয়ারিও করত না আমার জন্যে।

সে কে?

সে বেনারসে থাকে। কী ডেডিকেশন। বেনারসের জিনিসই আলাদা। সে রাবড়িই বল, সিদ্ধিই বল, আর মেয়েছেলেই বল।

আমি বললাম, আপনার কোনো ছোটো গাড়ি নেই? অ্যাম্বাসাডর অথবা ফিয়াট? আমি বাড়ি যাব।

নারে বোকা। বোকাটা। বাঁড়ুজ্যেরা ছোটো গাড়ি চাপে না, ছোটো পেগ খায় না।

আমি বাড়ি যাব। আবার বললাম আমি।

তুই কি কিন্ডারগার্টেনের বাচ্চা নাকি রে? থেকে থেকে কেবলই বলচিস মিস হিসি করব, মিস হিসি করব। ঝিকে ডেকে দেব তোকে হিসি করিয়ে দেবে। তুই কি শালা ঝৈন না কি?

ঝৈন মানে?

আরে বোকা স্ত্রীতে যে আসক্ত সে স্ত্রৈণ, আর ঝিতে যে সে ঝৈন।

ড্রাম্বুই আর সিগার এল। বোঁদেদা বললেন, খা-খা। এই ড্রাম্বুই আর সিগার দিয়েই উইনস্টন চার্চিল হিটলারের সঙ্গে যুদ্ধে জিতেছিল। তোরা কি ভাবিস অরেটরি দিয়ে? নেভার ইন দ্যা হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইড সো মেনি হ্যাভ ওওভ সো মাচ, টু সো ফিউ। নারে বোকা! অরেটরি দিয়েই যুদ্ধ জেতা গেলে নেহরুর অরেটরিতে এতদিন দেশের লোকের দুঃকু ঘুচে যেত। আসল হচ্ছে এই ড্রাম্বুই আর সিগার।

॥ ২ ॥

একবার আমাদের কয়েকজনকে বোঁদেদা তাঁর বাগান বাড়িতে নিয়ে গেছিলেন। সাঁওতাল পরগনাতে। মাছের সঙ্গে ফ্রেঞ্চ বোর্দো ওয়াইন মাংসের সঙ্গে স্প্যানিশ বুলস-ব্লাড রেড ওয়াইন। প্রন ককটেলের সঙ্গে সাদা অস্ট্রিয়ান স্নাপস। গরম করে সার্ভ করা জাপানিজ 'সাকে' রাইস ওয়াইন। তারপর দু কোর্স ডিনার। খাসির চৌরি, চাব, লাব্বা, পায়া, কবুরা। সঙ্গে তক্কর। তারই মাঝে মাঝে নিম্বু-পানি, হজমি।

একদিন রাতে নিজেই মহুয়া ডক্টর করলেন। চারগাছা করে পুরুষ্টু লবঙ্গ আর এক চামচে চিনি তাওয়াতে লাল করে তেল ছাড়া ভেজে মহুয়ার বোতলে ফেলে ভালো করে ঝেঁকে যখন গ্লাসে সার্ভ করলেন দেখতে হল একদম রাম-এর মতো। বললেন, দ্যাখ মহুয়ার গন্ধ চলে গেছে। কোথায় লাগে এরকমাছে জ্যামাইকান বিকার্ডি রাম।

বড়োলোক, রাজা মহারাজা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাইক্যুন অনেকেই দেখেছি জীবনে বোঁদেদার মতো এমন 'রইসি' কারও মধ্যেই দেখিনি। আমাদের জিপে করে রাতে শিকারে নিয়ে

গেলেন। বড়ো বড়ো চোখ দেখে টাইগার টাইগার বার্নিং ব্রাইট বলে জঙ্গলের মধ্যের এক বাথানের মোষ মেরে দিলেন রাইফেল দিয়ে। কোনো বিকার নেই। বললেন, গুলিটা বিঁধেছে দ্যাখ একেবারে দু চোখের মধ্যে। একেই বলে বোঁদের কপাল। ব্যাটা যদি শুধু ভাইষা না হয়ে বাঘোয়া হতো তো জমে যেত। তাঁর অনুচরেরা গিয়ে গেঁজে থেকে টাকা বের করে মোষের দাম প্লাস হাজার টাকা কম্পেনসেশান দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিল।

॥ ৩ ॥

আমার লানডান প্রবাসী বন্ধু ছুটু এসেছে অনেকদিন পর। ওকে নিয়ে গেছি গ্র্যান্ডের চৌরঙ্গি বার-এ। পরে পলিনেশিয়াতে ডিনার খাওয়াব। সবে একটা করে হুইস্কির অর্ডার করেছি হঠাৎ বোঁদেদার আবির্ভাব। আবির্ভাব বলাই ভালো প্রবেশ না বলে। যে কোনো ক্লাবে বা বার-এ বোঁদেদা ঢোকা মাত্র বেয়ারা থেকে শুরু করে স্টুয়ার্ডরা পর্যন্ত ফটাফট সেলামের আর গুড ইভনিং-এর ঝড় তুলত।

বোঁদেদা বললেন, কী রে বোকা। সঙ্গে এই চালাকটি কে?

ছুটুর পরিচয় দিয়ে বললাম আমার বাল্যবন্ধু। আমরা একসঙ্গে ইংল্যান্ডে ছিলাম। ও রয়েই গেছে।

বেশ করেছিস্ রে চালাক। এই দেশ আর ভদ্দরলোকদের জায়গা নেই। পোলিটিশিয়ান-গুলোর বুজরুকিতে সর্বনাশ হল। কিন্তু তোর বাল্যবন্ধুকে তো একটা ভালো ট্রিট দিতে হয়। কী বলিস? তবে দুসস্ শালা ফিরপোই নেই। কলকাতাটা কানা হয়ে গেছে। তা এক কাজ কর। আমার শরীরটা সকাল থেকেই খারাপ। বুকে একটা ব্যথা বোধ করছি। একটু চাঙ্গা হওয়া দরকার। ভালোই হয়েছে তোদের সঙ্গে দেখা হয়ে।

ই-সি-জি করিয়েচ?

দুসস্ শালা। ওই র‍্যাকেটে আমি নেই। ই-সি-জি, ই-ই-জি ব্লাড ক্লোরোস্ট্রোল, ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেশার, নিকুচি করিচি। ভগবান এত মানুষ গড়েচেন কেউ বেঁটে কেউ লম্বা, কেউ ফরসা কেউ কালো, কেউ মেটা কেউ রোগা আর কোন বইবেলে লিকেচিল শুনি যে প্রত্যেকের ওইসব গুণাগুণ এক হবে? আমার বাবার ওজন ছিল সাড়ে তিন মণ। অথচ এমন এনার্জিটিক মানুষ আর দেখলাম না। মদের মোচ্ছব করতেন। আর ... নাই-বা বললাম। তেরানব্বুই বচর বয়সে মায়ের কোলে মাথা রেকে গহরজান বাইজির রেকর্ড শুনতে শুনতে চললুম বলে চলে গেলেন। যকনি এয়েচ এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট আর এক্সপায়ারি ডেট লিখে পাঠিয়েচেন ব্রম্মা। যেদিন যে ভেট আসবে কান্তি বকশি, সুনীল সেনেরা ঘেমে গিয়েও বাঁচাতে পারবে না রে বোকা।

বলেই বললেন, চল, আজ অ্যান্টিকুয়ারিয়ান হুইস্কি দিয়ে শুরু হোক। এখানে একটা করে মেরে দিয়েই চল আজ বার-ক্রলিং করব। কলকাতার সব ক্লাবে।

বোঁদেদা কলকাতার সব ক্লাবেরই মেম্বার। ওখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া হল স্যুইমিং

ক্লাবে। মানু বোঁদেদাকে দেখে সেলাম ঠুকল। এলমোর মরিস আর পি টি বাসু বললেন, হোয়াট বোঁদে? লং টাইম নো সি?

ওখান থেকে বেরিয়ে অর্ডনান্স ক্লাবে। স্কচ ছিল তবে জনি ওয়াকার। দুসস্ শালা, জিভটাই যাবে অ্যান্টিকুয়ারিয়ানের পর। চল পালাই। বোঁদেদা বললেন।

সেখান থেকে বেঙ্গল ক্লাবে। অ্যান্টিকুয়ারিয়ান ছিল না সিভাস রিগ্যাল খাওয়া হল। সেখান থেকে ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবে। রবার্ট ডিপেনিং আর জর্জ ট্রব বিলিয়ার্ড খেলছিল। বিলু বর্মনও ছিল। হইহই করে উঠল সকলে বোঁদেদাকে দেখে। ওখানেও সিভাস মেরে একটা করে যাওয়া হল সি সি এফ সিতে। সালিম লজ্জা পেয়ে বলল, স্কচ নেই। বোঁদেদা বললেন, 'কমিটি মেম্বারদের বলিস এনে রাখতে'। সি সি এফ সি থেকে বেরিয়ে বেঙ্গল রোয়িং ক্লাব। পথে ডালহৌসি ইন্সটিওট্যুট-এলে একবার টুঁ মেরে একটা করে খাওয়া হল। ছুটু নার্ভাস হয়ে গেল। বলল সাহেবরাও এতরকম হুইস্কি চোখে দেখেনি।

বোঁদেদা বললেন তোদের সায়েবরা দেকেচেটা কী? রামপেয়ারিকে দেকেচে। এমন ঘুঘুর-সই ঘুঘুর-সই করে দেবে না যে মনে হবে টাকা মাটি মাটি টাকা। ফিলজফির হাইট জানবি ওই-ই!

চালাক ছুটু বোকার মতো চেয়ে থাকল।

আমি বললাম, পরে বলব। বিস্তারিত।

ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে হোয়াইট লেবেল খাওয়া হল। তখন নেশা চড়েছে। বাছবিচারের বিলাস নেই। তারপর লেক ক্লাব। সুক্কুর খাতির করল খুব। কিন্তু স্কচ নেই। প্রীতিরঞ্জন রায়, প্রেসিডেন্ট অ্যাপোলজেটিক হলেন। সেখানে একটা করে পিটার স্কট মেরে সোজা ক্যালকাটা ক্লাবে। মন্টু, গভর্নরের মতো মর্যাদায় রিসিভ করল বোঁদেদাকে। খোকাদা দৌড়ে এলেন। সেখানে পর পর দুটো সিভাস মেরেই বললেন, চল গ্র্যান্ডে ফিরে যাই।

আমি বললাম, ডিনার কিন্তু আমি খাওয়াব। পলিনেশিয়াতে।

চুপ। বড়দা থাকতে ছোড়দারা কতা বলে না। পাক্কি-বিরিয়ানি খাব মুগোল রুমে। তারপর পিংক-এলিফ্যান্টে নেচে, গার্ডেন কাফেতে ড্রাম্বুই আর সিগার খেয়ে বাড়ি।

ক্যালকাটা ক্লাবের সিঁড়িতে এসে বোঁদেদা বললেন, বোকা। তোর গাড়ির চাবিটা রামদীনকে দিয়ে দে। তোরা চল আমার সঙ্গে। সেদিন একটি রুপোলি সানবিম-ট্যালবট গাড়ি এনেছিলেন বোঁদেদা। রুপোলি ভেলভেট বডির কুশান।

বুঝলাম মাথায় কিছু একটা খেলেছে।

ড্রাইভিং সিটে বসে গাড়িটা ব্যাক করেই জোরে এক পাক মেরেই শচীন ব্যান্ডো মশায়ের গাড়িকে প্রায় ধাক্কা দিতে দিতে না দিয়েই গাঁ-গাঁ করে ব্যাক করে একজিট গেট দিয়ে বেরোলেন। দারোয়ানেরা ভয়ে লাফিয়ে উঠে সরে গিয়ে প্রাণ বাঁচাল। সার্কুলার রোডের মোড়ে আসতেই পুলিশ বুঝতে পারল না উনি এগোচ্ছেন কী পেছোচ্ছেন। আলো সবুজ হতেই একেবারে ক্যাপ্টার করে চল্লিশ কিমি-তে গাড়ি পেছোতে লাগল।

প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে উঠলাম আমরা। বললাম, এ কী? কী?

বোঁদেদা বললেন, আজ শালার সব মিনিবাসের হারামজাদা ড্রাইভারদের পিন্ডি চটকে দোব। কালঘাম ছুটিয়ে দেব স্টেট-বাস, প্রাইভেট বাসেরও। শালারা দিনে পাঁচটা করে মানুষ মারচে আর কী করম অ্যানঅ্যাবেটেড চলেচে বল! শালার দেশে তো অ্যাডমিনিস্ট্রেশান নে-ই, মানুষও কী কুকুরের বাচ্চা হয়ে গেছে। সব কিছুই সহ্য করে নেয়। নিজে যতক্ষণ না চাপা পড়ছে ততক্ষণ সব ঠিক হ্যায় এমনই একটা ভাব! দ্যাখ না বোকা! আজ কী করি!

আর দেখা! আমাদের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল। মিনিবাস, প্রাইভেট বাস, স্টেট বাস সব দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে এদিক-ওদিক দৌড়োতে গিয়ে সেমসাইড করে ফেলার অবস্থা। প্রচণ্ড বেগে একটা হুড খোলা রুপোলি গাড়িতে একজন স্থিরচিত্ত এবং দুজন অস্থিরচিত্ত মানুষকে লাফাতে লাফাতে যেতে দেখে বাস ট্রামের জানালা দিয়ে মুখ বের করে, মানুষজন সব চেয়ে রইল।

আর পেছনে যেতে থাকা বোঁদেদার গাড়ির মুখোমুখি অথবা পেছন পেছন আমার নিজের গাড়িতে বোঁদেদার ড্রাইভার রামদীন তারস্বরে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে লাফাতে লাফাতে ডান হাত বের কর বারণ করতে করতে আসতে লাগল। ট্রাফিক-পুলিশরা চ্যাঁচাতে আর লাফাতে লাগল দাড়ি-না-কামানো মুখে ফার্স্ট ইয়ারে পড়া জোর করে চুমু-দেওয়া প্রেমিকার মতো। তাদের সাদা-কালো ইউনিফর্মগুলোকে মনে হতে লাগল মেয়েদের স্কুলের ইউনিফর্ম।

বোঁদেদা হাসতে হাসতে বললেন, বেড়ে লাগছে র‍্যা। প্রতি হপ্তায় একবার এরকম করতে পারলে মিনিবাসওয়ালারা সব ঠান্ডা হয়ে যেত। জানত যে বাবাদেরও বাবা থাকে।

আপনাকে ধরতে আসছে বোঁদেদা।

ছুটু ভয়ার্ত গলায় বলল।

আমাকে কে ধরবে র‍্যা?

টিকিট দেবে পুলিশ।

আমি বললাম, এখানে তোদের লানডানের মতো টিকিট-ফিকিট দেয় না। হয় কিসসুই করে না, নয় থানায় নিয়ে গিয়ে প্যাঁদায়।

লিন্ডসে স্ট্রিটের মোড় পেরিয়ে ওকে বোঁদেদা বললেন বুকের ব্যথা-ফ্যাথা সব গায়েব। দারুণ চাঙ্গা লাগছে এখন।

ছুটু বলল এবারে দেশে আসা যথার্থ সার্থক।

দুজন সার্জেন্ট এবং একটি পুলিশ ভ্যান আমাদের ফলো করছিল। মানে মুখোমুখি আসছিল। ওরা এগোচ্ছিলেন। আমরা পেছোচ্ছিলাম।

থানায় নিয়ে যাবে। ভয়ার্ত গলায় বলল ছুটু।

ছাড় তো। ড্রাইভিং-এর জন্যে থানায় নিয়ে গেল আগে ওই পুলিশ ভ্যানের সবক-টি

ড্রাইভার, দুধের গাড়ি, কর্পোরেশনের গাড়ি, আর মিনিবাসের ড্রাইভারদের থানায় নিক। পেঁয়াজি মারার জায়গা পায়নি।

ধরবে এবার কিন্তু—

ছুটু আরও ভয় পেয়ে বলল। আমি চুপ করেই ছিলাম।

বোঁদেদা বললেন, আমি নিজে ধরা না দিলে কোনো শালার সাধ্য নেই যে আমায় ধরে। বলেই অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে ব্যাক করেই গ্র্যান্ডের সামনে গাড়িটা লাগিয়ে দিলেন। আমার গাড়ি বন্ধ করে রামদীন দৌড় এল। সার্জেন্ট দুজনও মোটর সাইকেল থেকে নেমে এগিয়ে এলেন। পুলিশ ভ্যানটা দাঁড়িয়ে রইল।

ধরবে এবারে।

ভীষণ ভয় পেয়ে ছুটু বলল।

দরজা খুলে নামলেন বোঁদেদা। দুজন ভিখিরি দু'হাত তুলে এবং একটা ল্যাজ-নাড়ানো ময়লা-খোঁটা নেড়ি-কুত্তা তার রুখু ল্যাজের ফ্ল্যাগ হয়েস্ট করে স্যালুট জানাল।

একজন সার্জেন্ট বললেন, ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।

ধরো না।

বলেই, বোঁদেদা ওই নোংরার মধ্যে ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে গেলেন।

আমি হেসে ফেললাম। কেউ তো জানে না বোঁদেদাকে। কুটুদার ফ্ল্যাটে লিফট-এর সামনে যে খেলা খেলেছিলেন এও সেই খেলা।

সার্জেন্ট বললেন, উঠুন উঠুন।

বোঁদেদা নট নড়নচড়ন নট কিছু। আজকের অভিনয়ের তুলনা নেই কোনো। শম্ভু মিত্রও লজ্জা পেতেন দেখলে। বোঁদেদা যেন সত্যি সত্যিই মরে গেছেন এমন করে পড়ে রইলেন ওই ধুলোর মধ্যে নির্বিকারে। ভিড় জমে গেল। সার্জেন্টরা বললেন, পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে যাব। এমন চালাকি আমাদের দেখা আছে।

আমি বললাম, আগে হোটেলে নিয়ে যাই। তারপরে যা করবার করবেন। সার্জেন্টরাও হাত লাগালেন। লবি ম্যানেজার তো দেখেই ছুটে এসে ডাক্তারকে ফোন করলেন। রেসিডেন্টদের মধ্যেও ডাক্তার ছিলেন কয়েজন। কী একটা মেডিক্যাল কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করতে এসেছিলেন তাঁরা। রিসেপশান থেকে ফোনে একজন ডেকে আনল ওঁদের দুজনকে। চারজন ডাক্তারই দেখলেন। আমি ভাবছিলাম কখন বোঁদেদা বলবে, কী রে বোকাটা? কিন্তু বোঁদেদা আর উঠলেন না। একজন ডাক্তার বললেন, হি ইজ ডেড। অন্যরাও মাথা নাড়লেন।

বোঁদেদা বলতেন, বুঝলিরে বোকা। বাঁচার অনেক রকম হয়। এক মিনমিন করে বাঁচা। আর গমগম করে বাঁচা। তুই ভুলেও ভাবিসনি যে আমি কোনোদিন উডল্যান্ডস বা বেলভিউতে খাট আলো করে কারো সিমপ্যাথির জন্যে শুয়ে থাকব একটি দিনও। দেকিস।

কথার খেলাপ করেননি মানুষটি।

সগর রাজা

দিদি, জামাইবাবু গেলেন কোথায়? এখনও এলেন না তো। তিনটে বাজতে চলল। শরীর ভেঙে যাবে যে। খাবেন কখন?

প্রথমা বললেন, তোর জামাইবাবুর শরীর পাথরে তৈরি। যম ভাঙলেও ভাঙতে পারে, সে ভাঙার পাত্র নয়।

রিটায়ার্ড মানুষ, সারাদিন করেন কী? বলছিলে তো বেরিয়েছেন সেই সকাল পাঁচটাতে।

হ্যাঁ। একটা ডিম-এর পোচ আর এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়ে যান। আর ফেরার কোনোই ঠিক নেই।

কী করবেন এত টাকা? এখন প্রয়োজনটা কী?

টাকার জন্যে করেন না, যা করেন বরং গ্যাঁটের কড়ি খরচ করেই করেন।

সোশ্যাল ওয়ার্ক? মিশনারিজ অফ চ্যারিটিজ-এর ব্রাঞ্চ আছে বুঝি?

না। তা নয়। তবে অন্য কিছু। ওয়ান-ম্যান ট্রাস্ট। ওয়ান ম্যান মিশান।

কী যে হেঁয়ালি কর দিদি! বুঝি না আমি। তুমি বল না কিছু? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো বলে।

বলে, কী হবে। চিরদিনই তো ওই রকমই।

মন হচ্ছে, তোমার খুব রাগ।

কার উপরে?

জামাইবাবুর উপরে।

অনুরাগ তো কোনোদিনও ছিল না।

তা বলে, বিরাগ ছিল বলেও তো জানি না।

না। তাও বলতে পারি না।

তবে?

দ্বিতীয়া বলল।

বলব, এক ধরনের উদাসীনতা ছিল। না ছিল অনুরাগ, না বিরাগ।

প্রথমা বলল।

তবে? রিটায়ার্ড করেছেন সাত বছর হল। শালিখ এত ভালো হয়েছে, স্টেটস-এ এত বড়ো চাকরি করছে। ফিঙের বিয়ে দিলে জামশেদপুরে। ব্রিলিয়ান্ট জামাই। তোমাদের তো এখন ইটারনাল হানিমুনই করার কথা।

হানিমুন যারা করে তারা বিয়ের পরদিন থেকেই করে। তোদেরই মতো। সময়ে শুরু না করলে আর হানিমুন করা যায় না।

বিয়ের পর পূর্ণচন্দ্রে বেড়াতে গেলেই কি আর মধুচন্দ্রিমা হয় দিদি। বিয়ের পরে পরে ও বলত, "ম্যানিব্যাগে মানি নেই, হানিমুনে হানি।"

ক-বছর যেন হল তোদের?

দেখতে দেখতে ন-বছর।

দশ বছরের পার্টি দিবি না?

কীসের পার্টি? মারামারির? ভুল বোঝাবুঝির?

আহা! সকলেই যেন তোর জামাইবাবুর মতো বেরসিক?

সকলেই সমান দিদি! কারও রাগ দেখা যায়, আর কারও রাগ অন্তঃসলিলা, এই যা!

বলিস কী রে! বিজনকে দেখে তো বোঝা যায় না। এমন ভালোমানুষ ছেলে মুখে রা-টি নেই।

পরের বরকে কে আর কবে বুঝেছে বল দিদি।

গুর্জরি তো অন্য কথা বলে।

কে গুর্জরি?

পাশের বাড়ির। আমাদের নেবার। তোরই মতো বয়েস হবে।

কী বলেন তিনি?

সে বলে, পরের বরকে বোঝা যত সোজা নিজের বরকে বোঝা তার চেয়ে অনেকই কঠিন।

ম্যাদামারা, অফিস করেই ফুরিয়ে যাওয়া স্বামী হলে অন্য কথা। তবে রিয়্যাল এনার্জেটিক, সাকসেসফুল পুরুষ হলে, সে অন্যের স্বামীই হোক, হোক কী ব্যাচেলর, তাদের বোঝার চেষ্টাতেও আলাদা উন্মাদনা আছে।

দ্বিতীয়া বলল।

যা বলেছ দিদি!

বাবাঃ। দিতু, তোর মধ্যে যে এমন আগ্নেয়গিরি ছিল, তা তো আগে আদৌ জানতে পারিনি আমরা কেউই।

জানবে কী করে? আগ্নেয়গিরি মাত্রই হাজার হাজার বছর ঘুমোয়। কুম্ভকর্ণের বাবা সব। তার জ্বালামুখের জ্বালা যখন চরমে ওঠে তখনই না সে জেগে উঠে ভিতরের লোহা পাথর সব গলিয়ে উৎসারিত, উৎক্ষিপ্ত করে।

তোমাদের সেই চিত্তরঞ্জন জায়গাটি কিন্তু ভারী সুন্দর হয়ে গেছে। দেখলেও ভালো লাগে। কী করে এমনটি হল বলো তো?

ভালো করে চোখ চেয়ে দেখেছিস কি সৌন্দর্যের কারণটা কী?

চোখ না চেয়েও বলতে পারি। আগে ছোট্ট "ডি" টাইপ না "ই" টাইপ কোয়ার্টার্সে থাকতে তোমরা। এখন নিজেদের কী সুন্দর বাংলো!

সেটা তো হল শুধু আমাদের বাংলোর কথা। তুই তো পুরো চিত্তরঞ্জনের সৌন্দর্যের কথাই বলছিস। তাই তো?

বোধহয় তাই-ই! আজ সকালে ট্রেন থেকে নেমেই মনে হল তোমাদের এখানে যেন কোনো বিপ্লব ঘটে গেছে। নীরব কোনো বিপ্লব। লাল শালুর ব্যানার নিয়ে শোভাযাত্রা হয়নি, অন্য কোনও ব্যানার নিয়েও নয়; লাঠি বা গুলিও চলেনি। অথচ এখানে অবশ্যই ঘটেছে কিছু।

বলেই বলল, আমি কিন্তু খুব রাগ করেছি, জামাইবাবু তার একমাত্র শালিকে স্টেশানে নিতে আসেননি বলে!

দ্বিতীয়া বলল।

হুঁ। রাগ তো হওয়ারই কথা। তবে একমাত্র শালি বলেই হয়তো যায়নি!

প্রথমা হাসছিলেন।

বললেন, বলেছিস ঠিকই। বিপ্লব একটা ঘটেছে। কিন্তু সেটা কী তা বল দেখি। কীসের বিপ্লব?

দাঁড়াও। এখনি বলতে পারব না। ভাবতে দাও। একদিন সময় দাও, ভেবে বলব।

বিশ্রাম করবি না? ঘুমোবি নাকি একটু? খাওয়ার পরে গড়াস না একটু ছুটির দিনে?

দুপুরে? নাঃ বাবা। মুটিয়ে যাব। তুমি কি দুপুরে ঘুমোও নাকি আজকাল?

আমি? হ্যাঁ ঘুমোই।

সত্যি! তোমার কী সুন্দর ফিগার ছিল দিদি। যখন গীতবিতান থেকে ফিরতে, পাড়ার মোড়ে রতনদাদারা ধপাধপ পড়ে যেত তোমাকে দেখে।

আমাদের সময়টাই অন্যরকম ছিল। কত ভদ্র-সভ্য ছিল মানুষ। রূপগুণের অ্যাডমিরেশানের রকমটাও অনেক আলাদা ছিল। অন্যকে 'পেড়ে' না ফেলে নিজেরাই পড়ে যেত! বল?

যাই বল, তুমি সত্যিই কিন্তু ভীষণ মুটিয়ে যাচ্ছ। হচ্ছিল তোমার ফিগারের কথা। কোন কথাতে চলে এলে।

হেসে ফেললেন প্রথমা।

বললেন, হ্যাঁ। বলতে চেয়েছিলাম যে, যতদিন দেখার লোক থাকে, তোর দিকে অ্যাডমায়ারিং চোখে চেয়ে দেখার লোক; আশা থাকে, ভবিষ্যৎ থাকে, ততদিন ফিগার-টিগারের মতো এই সব বাহুল্য নিয়ে মেতে থাকাটা শোভা পায়। এখন আমার ফিগার কেমন তার চেয়েও অনেক বড়ো কথা আমার কাছে, আমার বাত আছে কী নেই? আর্থরাইটিস, রিউম্যাটিজম; ডায়াবিটিজ আছে কী নেই? ব্লাড প্রেশার ফ্লাকচুয়েট করে, কী করে না। তাছাড়া, আমার শরীরের দিকে আর কোনো পুরুষই তো উৎসুক চোখে তাকায় না, ফিগার ভালো রেখে লাভ কী?

তোমার সঙ্গে কথা বলাই মুশকিল। পুরুষেরা তো অধিকাংশই শুয়োর, নয়তো গাধা। ওরা আবার সৌন্দর্যের আসল পূজারি কবে থেকে হল!

তুই তাহলে আসল পুরুষ দেখিসনি।

নকলের সঙ্গে দিন কাটাই, নক্কালদের ভিড়ে আসল দেখার সময় হল কোথায়?

তোর সঙ্গে কথা বলাই মুশকিল। আমার বয়সে এসে পৌঁছো, আমার কথা বুঝবি। কেমন ফালতু ফালতু লাগবে নিজেকে। আর কারওই কোন প্রয়োজনে তো লাগবি না। ছেলের তোকে দরকার হবে না, বউমাই তার সব। মেয়েরও তোকে দরকার হবে না, জামাইই তার সব হবে। তাদের ভবিষ্যৎ তাদের Spouse এর কেরিয়ার, তাদের উন্নতি, তাদের ছেলে মেয়ের স্কুলিং, তাদের সেকেন্ড জেনারেশানের ভবিষ্যৎ নিয়েই তারা চব্বিশ ঘণ্টা ব্যতিব্যস্ত থাকবে। একটা সময়ে, আমাদের জীবনে যে ওদের চিন্তাটাই আমাদের সব কিছু ছিল; সর্বস্ব, ওরা ছাড়া আমাদের অন্য কোনো অস্তিত্ব যে ছিল না, এই কথাটা যখন ছেলেমেয়েরা অবলীলায় ভুলে যাবে, তখন খুবই রাগ হবে নিজেদের উপরে। মূর্খ বলে মনে হবে। কিন্তু এখন করার আর কী আছে বল? ওদের ভালোই তো আমাদের ভালো। এই কথা বুঝিয়ে মনকে চোখ ঠারি। কিন্তু ওদের ভালোটা যে আমাদের ভালো নয় সে-কথাটাও প্রাঞ্জলভাবে বুঝতে পাই।

দুপুরে ঘুমোও? তুমি? রোজ?

রাতে যে ঘুম হয় না।

কেন?

আমার বয়সে পৌঁছো, জানবি। সারা রাতই প্রায় জেগে থাকি। হাই তুলি। নানা কথা ভাবি। শালিখ আর ফিঙের ছেলেবেলার কথা মনে হয়। তোর জামাইবাবুর প্রথম যৌবনের কথা। মানুষটার আমাকে ছাড়া এক মুহূর্ত চলত না। এখন ওঁর আমাকে শারীরিক ভাবে তো নয়ই, মানসিক ভাবেও আর কোনো প্রয়োজন নেই। নিজের জগতে বুঁদ হয়ে থাকে।

আমার কিন্তু এবারে রাগ হয়ে যাচ্ছে দিদি!

হঠাৎ? কেন? কার উপরে?

জামাইবাবুর উপরে। এসেছি প্রায় আট ঘণ্টা। তিনি তো জানেন যে, আমি আসব।

জানে বইকী। সেই তো স্টেশানে পাঠাল আমাকে। নিজে বাজার করেছ সাত-সকালে উঠে। আশ্চর্য! তুই কী কী খেতে ভালোবাসিস সব এত বছর পরেও মনে করে রেখেছে কিন্তু। আমি ভুলে গেছি যদিও।

সত্যি? যেমন?

খেলি তো! যেমন, চিংড়িমাছ, যেমন ভেটকি মাছের কাঁটা-চচ্চড়ি, যেমন ধোকার ডালনা, যেমন ছানার পায়েস।

সত্যি। মনে রেখেছেন জামাইবাবু!

দেখলাম তো যে, রেখেছে।

কিন্তু গেছেন কোথায় তাও কি বলে যাননি? তোমাকে কোনোদিনই কি বলে যান না?

নাঃ। তবে সম্ভবত কচি ব্যানার্জির বাড়িতে গেছে। বন-মহোৎসবের পরে।

ও হ্যাঁ, এখন তো অরণ্য-সপ্তাহ না কী যে চলছে কলকাতায়। মোড়ে মোড়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হোর্ডিং দেখি।

শহরের মোড়ের হোর্ডি-এ অরণ্য সপ্তাহ?

হ্যাঁ। নইলে ভোটাররা জানবেন কেমন করে?

কিন্তু কচি ব্যানার্জির বাড়িতে কী? কে তিনি?

তাঁর স্ত্রীর বয়স কম। শরীরের বাঁধুনি ভালো। লাস্যময়ী। চাইনিজ রাঁধেন ভালো।

জামাইবাবু কি চাইনিজ খাবেন ওঁর বাড়িতে?

হেসে বলল, দ্বিতীয়া।

কী কী খাবেন অথবা খাবেন না তা আমি কী করে বলব! কিছুমাত্র নাও খেতে পারেন। চোখে দেখার সুখও তো একটা মস্ত বড়ো সুখ, না, কি? দর্শনের সুখও কি বড়ো কম হল এই বয়সে! একটু কথা বলার, একটু কাছে থাকার ...

আহা! সে সুখ তো সব বয়সেরই।

মনের মতো মানুষ যে সব সময়েই অন্য মন খুঁজে বেড়োয়।

কিন্তু তুমি মানা কর না?

মানা? কেন, মানা করব কেন?

আমার মধ্যে, আমার শরীর মনে কত অপূর্ণতা। তা নিয়েই তো মানুষটা চাঁদমুখ করে জীবন কাটিয়ে গেল। বিধাতা যদি আমাদের পূর্ণ করেই সৃষ্টি করতেন তবেও তো না হয় অন্য কথা ছিল। অপূর্ণতাই তো নারী ও পুরুষের জীবনের সার কথা; অমোঘ নিয়ম। পরিপূরক হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টাই তো সারা জীবনের সাধনা। পূর্ণতা তো ব্যতিক্রম। একটা concept মাত্র। কথার কথা। বাংলাতে বললে 'সংজ্ঞা' বা 'আদর্শও' বলা যেতে পারে।

সুন্দর বলেছ দিদি। এমন করে তো ভাবিনি কখনও।

॥ ২ ॥

ওদের খাওয়া হয়ে গেছিল অনেকক্ষণ। প্রথমা এবারে একটু শোবেন। প্রতি রবিবার দুপুরে রেডিয়োর নাটক শোনেন। ভালো বাংলা ছবি থাকলে বিকেলে দেখেন। উত্তমকুমারের ছবি থাকলে তো দেখেনই।

একটা হাই তুলে প্রথমা বললেন, আমি তাহলে গিয়ে শুই একটু?

শোও।

তুই কী করবি?

ভাবছি। যা গরম!

তোদের এয়ারকন্ডিশানড ঘরে থাকা অভ্যেস। পুজো থেকে দোল অবধিই এখানে ভালো সময়। তবে এখন গুমোট হয়ে আছে তাই। বৃষ্টি হলেই দেখবি প্লেজান্ট হয়ে যাবে।

ওটা কী গাছ দিদি?

কোনটা?

হই যে।

ওটা, কেসিয়া নড়ুসা।

একটি বইয়ে পড়েছিলাম কেসিয়া নড়ুলাস।

জানি না। লেখক নুডলস খেতে খেতে লিখেছিলেন হয়তো। অমন নাম তো শুনিনি। নিশ্চয়ই ভুল লিখেছিলেন। সর্বজ্ঞ তো কেউই নন। তবে আমার তো সবই শোনা বিদ্যে। তোর জামাইবাবু এলে ঠিক বলতে পারবেন।

তোমার ইন্টারেস্ট নেই গাছগাছালিতে?

আছে। অত বড়ো বড়ো গাছে নয়। আমার শ্রাবস, ফার্নস, অর্কিডস, সাকুলেন্টস, ব্রমেলিয়াডস এসব ভালো লাগে।

এমন সময় কাঁকুরে পথে একটি সাইকেলের টায়ারের কিরবররর, আওয়াজ শোনা গেল। তারপর গেটটা খোলার আওয়াজ। সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে জামাইবাবু ঢুকলেন।

দ্বিতীয়াকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন গিরিজাপ্রসন্ন, এই যে অদ্বিতীয়া। কী খুশি যে হলাম। তোমার ওল্ড ফ্লেমকে মনে পড়ল তাহলে! বাবাঃ, আমার একটা মাত্র শালি। দুদিন না দেখতে পেলেই বুকের মধ্যেটা কেমন করে ওঠে।

ঢং করবেন না। ন বছর পরে। তাও আমাকেই আসতে হল।

বুড়ো মানুষকে ক্ষমা করে দিয়ো।

দ্বিতীয়া দাঁড়িয়ে উঠে বলল, বুড়ো বলে তো মনে হচ্ছে না একটুও। দিদিই বরং বুড়িয়ে গেছে।

আহা বেচারা। ওর যে কত স্যাক্রিফাইস। ছেলে মেয়েকে শরীরের সৌন্দর্য দিয়েছে,

রক্ত মাংস; মনের ভালোবাসা; এমন হনুমানের মতো স্বামীর অত্যাচার সহ্য করেছে সারাটা জীবন। কিন্তু কই? আমি তো আমার বউকে ইয়াংই দেখি। সেই ফুলশয্যার রাতেরই মতো। আসলে সেই সালংকারা চেহারাটা, সেই সুগন্ধি স্মৃতিটাই জ্বলজ্বল করে কিনা।

সাইকেলটা রেখে এসে প্রেমের কথাগুলো বললে হত না। যত্ত ঢং।

প্রথমা বললেন।

গিরিজাপ্রসন্ন গারাজের মধ্যে সাইকেলটা ঢুকিয়ে রাখলেন।

দ্বিতীয়া দেখেছিল যে একটা স্কুটারও আছে। গাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন সম্ভবত ফিঙের বিয়ের সময়ে। অবস্থা পড়ে গেলে, রিটায়ার করলে, অধিকাংশ মানুষেরই মনে নানারকম কমপ্লেক্স জাগে। দিদি জামাইবাবুকে ব্যতিক্রম বলে মনে হল দ্বিতীয়ার।

খাবে তো? নাকি মণি খাইয়ে দিয়েছে?

কোন মণি? নয়নমণি? না ফণী রায়ের মণি?

ঢং। যেন জানে না।

ও। বাঁড়ুজ্যের বউয়ের কথা বলছ? পরশমণি?

আজ্ঞে।

কিন্তু আমার যে ছোঁওয়াবার মতো আজ কিছুমাত্রই নেই যে সোনা করব ছুঁইয়ে। তা, কী আর খাওয়াবে সে?

আপনি নাটকের দলে নাম লেখান না কেন জামাইবাবু?

কেউ যে ডাকল না। সারাটা জীবন তো মহড়াই দিয়ে চলেছি।

কী খেয়ে এসেছ তার বাড়িতে?

প্রথমা জিজ্ঞেস করলেন।

কেন? ডাল-ভাত, রুটি-মাংস।

খাওয়াল কী তা আমি জানব কী করে?

দেখেছ ডার্লিং অদ্বিতীয়া। তোমার দিদির কী রসজ্ঞান! যদি খাওয়াবেই, পরশমণি, নয়নমণিই; তবে ওই সব সাদামাটা ডাল ভাত-মাংসের ছাঁট কোন দুঃখে খেতে যাব। আমি কি ডালমেশিয়ান কুকুর? না স্পিৎজ? খাওয়াবেই যদি তো ... ...

তুমি কী বল, ডার্লিং?

তুমি যদি কোনোদিনও কোনো পরপুরুষকে কিছু খাওয়াবে বলে মনস্থই কর তবে কী তুমি ডাল-ভাত ছাড়া অন্য কিছু খাওয়াবার কথা ভাববে, না ভাববে না?

দ্বিতীয়া হেসে ফেলল।

বলল, চলুন, হাত ধুয়ে নিন। আমি আগে খেতে চাইনি। দিদিই বলল যে, আপনার ফেরার কোনোই ঠিক নেই।

যথার্থই যে পুরুষ, তার ফেরার কোনোদিনই ঠিক থাকে না। উলিসিস থেকে শক্তি

চাটুজ্যে থেকে, গিরিজাপ্রসন্ন সেন পর্যন্ত। তবে তোমার মতো কেউ যদি রোজ বসে থাকত তবে যখনই ফিরতে বলতে, কাঁটায় কাঁটায় ঠিক তখনই ফিরে আসতাম।

শুনছ। আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। সম্ভবত প্রেশারটা বেড়েছে।

প্রথমা বললেন।

শালি জামাইবাবু একসঙ্গে হলে দিদিমাত্রেরই প্রেশার বাড়ে। ওষুধটা খেয়েছ তো?

হ্যাঁ।

আজকে ডাবল-ডোজ খেলে পারতে।

দ্বিতীয়া, আমি শুতে চললাম রে। তোর জামাইবাবুকে খাওয়াস।

॥ ৩ ॥

বিকেলে গিরিজাপ্রসন্ন দ্বিতীয়াকে নিয়ে হাঁটতে বেরোলেন।

দুপুরে জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আবহাওয়া সত্যিই প্লেজান্ট হয়ে গেছে। জামাইবাবুর লম্বাচওড়া শক্তসমর্থ চেহারা এখনও সেরকমই আছে। ষাটবছর বয়স অবধিও টেনিস খেলেছেন। শুনেছে, অনেকেরই কাছে যে, টেনিস এমনই একটা খেলা, যা মৃত্যুদিন অবধিও খেলা যায়। কেন ছেড়ে দিলেন, কে জানে! গিরিজাপ্রসন্নর সবই ভালো, শুধু নামটি ছাড়া। বড়ো সেকেলে নাম।

দ্বিতীয়া বলল, জামাইবাবু, সত্যিই বলুন তো ওই মণি বা মণিদের, যাদেরকার কথা বলছিল দিদি, তিনি বা তাঁরা কি সত্যিই আপনার হার্ট-থ্রব। পুরুষেরা পঁয়ষট্টিতে কেমন হন, মানে কেমন আকার ধারণ করেন সেটা জেনে রাখলে, আমার বরকে ওই বয়সে বোঝা সহজ হয়ে যেত।

ডার্লিং! পুরুষেরা তো কুকুর নয় যে, সবাই একইরকম হবে। একইরকম হয় কুকুর, শুয়োর, গাধা এই সব প্রাণী। তাদের মধ্যে আবার একেক প্রজাতি একেকরকম। ল্যাব্রাডর গান — ডগ আর ডালমেশিয়ান যেমন একইরকম হবে না, তেমন রামচন্দ্র যে শিকার-করা বন্য বরাহর মাংস খেতেন, সেই ফলমূল খাওয়া বরাহ আর বস্তির নোংরা খেকো শুয়োরে তফাত অবশ্যই ছিল। এবং থাকবে।

আঃ। বলুন না, সত্যিই মণি বলে কেউ আছেন? আপনার?

একজন নয় গো ডার্লিং। আমার অনেক মণি। আমি মণিময়। এই দ্যাখো সামনেই তিন তিনটে আকাশমণি। এ ওর মুখে চেয়ে আছে।

দ্বিতীয়া চোখ তুলে দেখল, তিনটি সুন্দর গাছ। বড়ো গাছ।

বা। এদের নাম বুঝি আকাশমণি?

হ্যাঁ। অন্য নামও আছে। রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছিলেন অগ্নিশিখা। আফ্রিকাতে বলে, আফ্রিকান টিউলিপ।

দ্বিতীয়া লক্ষ করছিল যে, গিরিজাপ্রসন্ন হেঁটে যাচ্ছেন আর দুপাশের অগণ্য মানুষ

তাঁকে নমস্কার করছে। কেউ বলছে, নমস্তে সেন সাব, কেউ বলছে, নমস্কার স্যার, কেউ বলছে, ভালো তো গিরিজাদা? কেউ বা সাইকেল, স্কুটার, মোটর সাইকেল অথবা গাড়িও থামিয়ে, হাত বাড়িয়ে হাতে হাত রেখে কথা বলছেন। কেউ হ্যান্ডশেক করছেন। এই যে এত মানুষের, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের ভালোবাসা, এটা কিন্তু ভয়মিশ্রিত ভালোবাসা নয়। নিখাদ ভালোবাসা। সম্পূর্ণই স্বার্থহীন। এক ধরনের সম্ভ্রমও মেশানো আছে এই ভালোবাসাতে তা বুঝতে পারছিল দ্বিতীয়া, কিন্তু সেটা কী কারণে যে, তা বুঝতে পারছিল না।

আপনি কি ইলেকশানে দাঁড়াবেন? জামাইবাবু?

গিরিজাপ্রসন্ন হাসলেন।

বললেন, দাঁড়ালে তো আমিই বত্রিশ-পাটি বিগলিত করে সকলের কাছে ভোট ভিক্ষা চাইতাম! আমাকে দেখে কি তাই মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে না কি যে, আমি অলরেডি ইলেক্টেড।

তা অবশ্য ঠিক।

পরনে ধুতি পাঞ্জাবি, পায়ে কাবলি জুতো। ধুতি পরা তো ভুলেই গেছে বাঙালিরা।

ভারী সুন্দর দেখছিল দ্বিতীয়া তার জামাইবাবুকে। এই বয়সেও লম্বাচওড়া ঋজু চেহারা, চওড়া কবজি, এক মাথা কোঁকড়া চুল, সল্ট অ্যান্ড পেপার; কবজিতে বাঁধা একটি চমৎকার ঘড়ি। বাবা, দিদির বিয়ের সময়ে এক মক্কেলকে দিয়ে সুইজারল্যান্ড থেকে আনিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এটা ...

এটা সেই ঘড়ি?

না গো শালি। শ্বশুরমশায়ের দেওয়া ঘড়ি আমি নিজে শ্বশুর হওয়ার পর জামাইকে দিয়ে দিয়েছি।

এটা কী ঘড়ি?

এটা টাইমেক্স। আমাদের দেশেই এত সব ভালো জিনিস হচ্ছে এখন, মিছিমিছি বিদেশির প্রয়োজনই বা কী?

একজন মিস্ত্রিগোছের মানুষ উলটোদিক থেকে আসছিলেন সাইকেল চড়ে। সাইকেল থেকে নেমেই, ভক্তিভরে মাথা নীচু করে প্রণাম করে তিনি খুশির হাসি হেসে বললেন, নমস্কার গাছবাবু। দশটার মধ্যে আটটাই বেঁচেছে। বড়োও হয়েছে অনেক। তিন বছরের মধ্যে ছায়া দেবে। একদিন গিয়ে দেখে আসবেন। সেদিন দুমুঠো ডালভাতও খেয়ে আসবেন আমাদের বাড়ি। গাঁয়ের সকলের অনুরোধ।

যেমনভাবে লাগিয়েছিলাম, তেমন গোল করেই লাগানো আছে তো! নাকি তুলে এদিক-ওদিক করেছ?

না, না। কী যে বলেন। এক বছরের মধ্যেই এমন চেহারা হবে কেউ ভাবেনি। এ গাছের বাড় তো মেয়েছেলের বাড়ের চেয়েও বেশি। কী সুন্দর যে দেখতে লাগে কী বলব! বড়োবাবু একটা নামও দিয়ে দিয়েছেন।...

বাঃ। চমৎকার। কিন্তু বড়োবাবু মানে?

লেদ-শপ-এর বড়োবাবু। তাঁরও বাড়ি তো আমাদের গ্রামেই।

তা কীসের নাম দিয়েছেন উনি?

কেন? ওই গাছেদের কুঞ্জর। নাম দিয়েছেন 'গিরিজা-কুঞ্জ'। আমরা প্ল্যান্টে সকলে মিলে চাঁদা তোলা আরম্ভ করেছি যে যেমন দিতে পারে।

কীসের জন্য?

'গিরিজা-কুঞ্জে' পার্কের মতো বেঞ্চ লাগাব গোল করে ন'খানা। লোহার ফ্রেমের উপরে মোটা কাঠের তক্তা লাগানো থাকবে। বিজা কিংবা শালকাঠেরও। শক্ত হবে, রোদ বৃষ্টিতে নষ্টও হবে না শিগগিরি।

বিজা কাঠ কী? দ্বিতীয়া শুধোল।

হ্যাঁরে বাবু। ওই গাছের কাঠ দিয়েই গোরুর গাড়ির চাকা হয়। তবেই বোঝো!

যখন করব, আপনার সঙ্গে পরামর্শ করেই করব। সাদা রং কবে দেব সব বেঞ্চে।

মানুষটি চলে গেলে, দ্বিতীয়া বলল, কী গাছ জামাইবাবু?

সোনাঝুরি। তবে সোনাঝুরি লাগাবার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। সোনাঝুরি দেখতে ভালো যদিও কিন্তু ইউক্যালিপ্টাস, সোনাঝুরি এসবে মাটি খারাপ করে দেয়। তাছাড়া একোলজির পক্ষেও ভালো নয়। গাছে কীটপতঙ্গ হয় না, পাখি বসে না, বাসা করে না, পাখির সঙ্গে আরও অনেক কিছুরই যোগাযোগ আছে। যদি জঙ্গলে হত তো তোমাকে বোঝাতে পারতাম। এই শহরে তো সাপ নেই, ময়ূর নেই, ইগল নেই, বেজি নেই, অনেক কিছুই নেই। তবু, যেখানে যেটুকু পারি, করি। কী ভালো যে লাগে শালি, তোমাকে কী বলব!

দিদি আজই দুপুরবেলাতে বলছিল, গাছ মেয়েদের কাছে পুরুষেরই মতো।

হয়তো। আর পুরুষের কাছে, মায়ের মতো। আমার এই ইডিপাস কমপ্লেক্সটি কিন্তু আছে। এবং এর জন্য গর্বিত। গাছই আমার প্রাণ, আমার প্রেমিকা বাঁড়ুজ্যের বউ মণি আমাকে কী খাওয়াবে, কতটুকু খাওয়াবে, আমি যে মণিময় দ্বিতীয়া! প্রতি পথের পাশে পাশে আমার মণিরা দিনে রাতে আমার প্রতীক্ষাতে থাকে। কোনো কোনোদিন শ্রাবণের প্রবল বর্ষণের মধ্যে টোকা মাথায় দিয়ে সাইকেলে চেপে আমি ওদের দেখতে বেরোই। আঃ। কত রকমের সাবানই যে আছে ওদের স্টকে! এক-একজনের গায়ে এক-একরকম গন্ধ। আর বৃষ্টির পরে তা যেন খোলতাই হয় আরও।

কখনও আবার মাঝরাতে বেরোই। চৈত্র-পূর্ণিমাতে বা দোলপূর্ণিমাতে। মাঘি পূর্ণিমাতেও আসি। কখনও ঘোর অমাবস্যাতে। প্রেমিকার কোনো রূপই তো আর ফ্যালনা নয়। বল

হুঁ।

দ্বিতীয়া বলল, অস্ফুটে।

ওদের মধ্যে অধিকাংশই আমার চেয়ে বয়সে বড়ো, কেউ বা ছোটো, অনেকেই ছোটো। কারও সঙ্গে আমার মা-মাসির সম্পর্ক কারও সঙ্গে শাশুড়ির, কারও সঙ্গে স্ত্রীর কারও সঙ্গে শালির, কারও সঙ্গে ছেলের; কারও সঙ্গে মেয়ের।

বলেই বললেন, ভেটকু আর সল্লিকে সঙ্গে নিয়ে এলে না কেন দ্বিতীয়া? ওদের গাছ চেনাতাম। গাছ যারা শিশুবয়স থেকে চিনতে শেখে ভালোবাসতে শেখে তাদের ভালোবাসা ডাইহার্ড হয়। এখন আমাদের বাঁচামরার সঙ্গে পৃথিবীর বাঁচামরার সঙ্গে গাছেদের বাঁচামরার প্রশ্ন জড়িয়ে-মড়িয়ে গেছে। মানে, ওরা বাঁচল, তবেই আমরা বাঁচব; এই পৃথিবী বাঁচবে।

বাঃ। কী সুন্দর গন্ধ। কী উঁচু গাছ রে বাবা!

দ্বিতীয়া বলল।

হ্যাঁ।

কী গাছ এটা?

হাসতে হাসতে শিশুর মতো বললেন গিরিজাপ্রসন্ন আরে! কনকচাঁপা। ছেলেবেলাতে পড়েছ মনে নেই, "তার গোঁফ জোড়াটি পাকা, মাথায় কনকচাঁপা"। সেই কনকচাঁপা। বেচারি একা — একাই কাটিয়ে দিল সারাটা জীবন নির্মলকাকুর মতো। কিছুদিন হল আর একটিকে এনে লাগিয়েছি আমি। তবে বড়ো অসমবয়সি হয়ে যাবে এ প্রেম। তবু তো হবে। প্রেম প্রেমই! শেষবেলাতে এলেও এল! তুমি নবোকভ-এর 'লোলিতা' পড়েছ?

ওঃ। পড়েছি। সিকেনিং।

আরএকবার পোড়ো। তুমি বলছ কী। ইংরেজির ছাত্রী ছিলে তুমি! আমি তো রেলগাড়ির ইঞ্জিন বানানো ইঞ্জিনিয়ার। ইংরেজি ভাষাটাকে নিয়ে, নিখিল ব্যানার্জি যেমন করে সেতার বাজাতেন, তেমন করেই বাজিয়েছেন নবোকভ। আমার অবশ্য বইটির কথা মনে এল অসমবয়সি প্রেমেরই কথাতেই। শারীরিক প্রেম।

প্রেমের পরিণতি কি শরীরই? জামাইবাবু?

নির্ভর করে। হতেও পারে, নাও হতে পারে। পাত্রপাত্রীর উপরেই সব নির্ভর করে। আমার যে এই গাছেদের সঙ্গে প্রেম এর মধ্যেও শরীর আছে কিন্তু।

হেসে ফেলল দ্বিতীয়া, গিরিজাপ্রসন্নর কথা শুনে।

বলল, গাছেদের শরীর?

হ্যাঁ। তাকিয়ে দ্যাখো। যে কোনো গাছের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। দ্যাখো, যেখানে দুটি ডাল বাইফারকেট করেছে। সেখানে নজর করে দ্যাখো, কী দেখছ?

কী?

দুটি উরু নয় কি? উরুসন্ধি আর জঘন? উল্লটোদিক দিয়ে দ্যাখো, মানে, আপসাইড ডাউন করে। কি? নয় কি?

সত্যিই তো।

স্তম্ভিত হয়ে বলল, দ্বিতীয়া। আশ্চর্য। কত হাজার গাছ দেখলাম, কখনোই নজর করে দেখিনি। সত্যি! আপনি হয় পারভার্ট নয় জিনিয়াস।

জিনিয়াস-এর সঙ্গে পারভার্সিটির মিল অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়। তবে আমি দুটোর একটিও নই।

চোখে যা পড়ে, তাই কি আমরা দেখি, না দেখতে শিখেছি? চোখ তো সকলকেই দিয়েছেন বিধাতা, দেখবার চোখ ক-জনকে দিয়েছেন বল।

তা ঠিক।

এদিকে-ওদিকে চেয়ে নিজের মনে স্বগতোক্তির মতো বলল দ্বিতীয়া।

তারপর বলল, আপনি কিন্তু বেশ অসভ্য আছেন।

মেয়েরা যদি পুরুষকে ভালোবাসে তাকে পাগল বলে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন। আর আমি বলছি, অসভ্যও বলে।

গিরিজাপ্রসন্ন বললেন।

অসভ্য!

বলল, দ্বিতীয়া। দ্বিতীয়বার।

এটা কী গাছ?

কুরচি। আমার নাতনি হলে তার নাম রাখব কুরচি।

আর নাতি হলে?

শিমুল।

আর ছেলের ঘরে নাতি হলে? শালিখ তো শুনছি আমেরিকার মেয়ে বিয়ে করবে।

তাতে কী। করুক না। যার যা খুশি করুক। যার যার জীবন তার তার। যে যাতে খুশি হয়।

মেমসাহেব রাগ করবে না দিশি নাম রাখলে?

বিদিশি নামেই রাখব। ছেলে হলে রাখব জ্যাকারান্ডা। জ্যাকারান্ডার ফুল দেখেছ কখনও? এই কইদিন আগেই ফোটা শেষ হল। গরমের শুরু থেকে ফুটবে আবার। ফিকে বেগনি। আমার বিয়ের সময়ে তোমার যে বয়স ছিল। ক্লাস নাইনে পড়তে না তখন তুমি?

হুঁ।

ঠিক সেই বয়সি মেয়েদের শেষ রাতের স্বপ্নর মতো হালকা, নরম আলতো বেগনিরঙা হয় জ্যাকারান্ডার ফুল।

দ্বিতীয়বার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, গিরিজাপ্রসন্নর রোম্যান্টিকতায়।

ভাবল, এমন জামাইবাবুর সঙ্গে থেকে যে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে এতটা কাল, সেটা তারই মন্দভাগ্য।

আর মেয়ে হলে?

মেয়ে হলে তার নাম রাখব পনসাটিয়া।

ইশ। নামগুলো শুনে আমারই ইচ্ছে করছে আমার আরও একটি ছেলে বা মেয়ে হোক।

এক্কেবারে না। দুটিই যথেষ্ট। আমার এই সুন্দর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে শুধুমাত্র গাছ বাড়ানো আর সন্তান কমানোর উপরেই। সবাইকে বলবে, বুঝেছ? শিক্ষিত-অশিক্ষিত গরিব-বড়োলোক, সব্বাইকে। বুঝিয়ে বলবে। টাইম ইজ রানিং-আউট।

যে গাছেদের উরু ও জঘন আছে, তাদের শরীরের গড়ন তো মেয়েদের শরীরেরই মতো। গাছেরা কি সকলেই মেয়ে?

না, তা কেন। অনেক গাছ আছে, তাদর শরীরের গড়ন অমন নয়।

যেমন?

একটা বই-এর কথা পড়েছি, 'দ্যা সিক্রেট লাইফ অফ প্ল্যান্টস'। অসাধারণ বই।

কোথায় পাব?

তা জানি না।

তারপর বললেন ডালপালা সমান্তরালে ছড়ায় কিন্তু নীচের দিকে, অথচ যারা ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যিসীর মতো, যেমন শিমুল বাওবাব, শাল, পপলার, পাইন, স্প্রুস, সিডার। অধিকাংশ কনিফারাস গাছই বোধহয় পুরুষ। শীতে জমে-যাওয়া পুরুষের কাছে মেয়েরা কীসের জন্যে যাবে? তাই বোধহয় শীতের দেশের পুরুষ গাছেরা বরফের গোঁফদাড়ি নিয়ে শীতে ঠকঠক করে কাঁপে।

আমার এই থিয়োরি কাউকে বোলো না কিন্তু। বটানিস্টরা শুনলে ঠাট্টা করবেন আমাকে নিয়ে। ভালোবাসা ছাড়া, আমার আর তো কোনো গুণ নেই। বটানির কিছুই জানি না আমি।

হাসল দ্বিতীয়া গিরিজাপ্রসন্নর কথা শুনে।

গিরিজাপ্রসন্ন দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, ওই যে, চারটে অমলতাস গাছ দেখছ ...

অমলতাস? কী সুন্দর নাম।

হ্যাঁ। সংস্কৃত সাহিত্যে ওই নামেই আছে ওই গাছ। হলুদ হলুদ ফুল ফোটে, মেয়েদের কানের ঝুমকোর মতো। বুঝলে শালি, আমরা ইংরেজিই শিখেছি কিন্তু শিক্ষিত হইনি। তুমি যে কোনও শিক্ষিত মানুষকে একটি গাছ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করো, এটা কী গাছ? উত্তরে কী বলবেন তিনি জান?

কী?

বলবেন, গাছ। কী গাছ আবার কী? গাছ! কী পাখি আবার কী? পাখি।

শহরের মানুষ কী করে চিনবেন?

দ্বিতীয়া বলল।

এটা বাজে কথা। গ্রামের মানুষও অনেকেই চেনেন না, আবার শহরের মানুষের মধ্যে কেউ কেউ চেনেন। আমাদের শিক্ষাটাতে ম্যাট-ফিনিশ লেগেছে। গ্লসি করতে হবে তাকে। দীপ্তিমান করতে হবে শিক্ষাকে।

বলুন, কী বলছিলেন অমলতাসের কথা?

ওইখানে একটা ছাইয়ের গাদা ছিল আগে, জান? ওই যে বস্তিটা দেখছ, বস্তির যত ছাইপাঁশ সব ওখানেই ফেলত এনে ওরা। আমি চারটি অমলতাস এনে লাগালাম। দ্যাখো, পাঁচ বছরে কত বড়ো হয়েছে। ওদের বাড়তে দেখে নিজেরাই জঞ্জাল আর ছাই ফেলা বন্ধ করল। এখন ওই গাছগুলিরই নীচে বস্তির যুবক যুবতিরা একে অন্যকে প্রেম নিবেদন করছে। শিশুরা বিকেলে খেলে। বৃদ্ধরা সন্ধের পরে এসে স্মৃতিমন্থন করে।

বলেই, বললেন, তোমাদের কলকাতার শ্মশানগুলোকে গাছে গাছে সবুজ করে দিতে ইচ্ছে হয় আমার।

গিরিজাপ্রসন্ন যেন ঋগ্‌বেদে বর্ণিত সেই অরণ্যস্তবের মধ্যে সশরীরে প্রবেশ করে গেলেন।

স্তব্ধ হয়ে লক্ষ করল দ্বিতীয়া।

বাড়ি যাবেন না?

চলো। আমি ভাবি, আমার তো মোটে এক ছেলে এক মেয়ে। আমি যেদিন মরব, সেদিন এই চিত্তরঞ্জনের কত গাছই যে কাঁদবে আমার জন্যে। যে হাজার হাজার শিশু-যুবক-বৃদ্ধের মধ্যে গাছেদের জন্যে এই ভালোবাসা, আমাদের পৃথিবীর জন্যে এই দরদ সঞ্চারিত করতে পেরেছি, তারাও কাঁদবে। ভাবতেও যে কী ভালো লাগে শালি, তোমাকে কী বলব।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, এ কিন্তু নার্সিসিজম নয়, এ ভালোবাসা আমাকে নয়, এই এদের সকলকে, যারা এমন মণিহার পরিয়েছে আমায়। এই ভালোবাসাই আমার একমাত্র উত্তরাধিকার। আমার যে সহস্র সহস্র সন্তান। সগররাজা আমি!

এখন চাঁদ উঠেছে বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশে। পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যাতারা জ্বলজ্বল করছে। সমানে মানুষজন নমস্কার করতে করতে, উইশ করতে করতে চলেছেন দু পাশ থেকে, গিরিজাপ্রসন্নকে।

স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসায়।

দ্বিতীয়ার খুবই গর্ব হচ্ছিল ওর একমাত্র জামাইবাবুর পাশে পাশে হাঁটতে।

কত মানুষ কত রকমের উত্তরাধিকার রেখে যান। কিন্তু কী দারুণভাবে বাঁচছেন, বাঁচলেন জামাইবাবু। কী গভীর আত্মতৃপ্তিতে স্বার্থগন্ধহীন আনন্দে। পরের পরের, পরের, তারও পরের প্রজন্মের জন্যে, তাঁর অগণ্য সন্তানদের জন্যে, এই পৃথিবীকে সুন্দর করার জন্যে।

আশ্চর্য!

নবীন মুহুরি

সামনে খেরোর খাতাটা খোলা ছিল। খতিয়ান। জাবদা থেকে পোস্টিং দেখছিলেন নবীন মুহুরি। রেওয়া মিলছে না।

বেলা যায় যায়। পাটগুদামের পাশের প্রেসিং মেশিনে পাটের বেল বাঁধাই হচ্ছিল। তার একটানা শব্দ ভেসে আসছিল। বয়েল গাড়ির ছেড়ে দেওয়া বলদেরা পটপট করে ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছিল। মাঝে মাঝে ওরা জানালার পাশে বসা নবীন মুহুরির দিকে বড়ো বড়ো কান পত-পত করে নেড়ে, চোখ তুলে তাকাচ্ছিল।

গোরুগুলোর চোখের দিকে, কাছ থেকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নবীন মুহুরি হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তাঁর দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী শৈলবালার গোরুর মতো চোখ। গোরুর মতো বড়ো বড়ো বোকা বিষণ্ণ চোখ। গায়েও একটা গোরু-গোরু গন্ধ। শৈলবালার সন্তানাদি নেই। শৈলবালা বন্ধ্যা।

অন্যমনস্কতার মধ্যে নবীন মুহুরি খাতা ছেড়ে উঠলেন, চটিটা পায়ে গলালেন, তারপর নস্যির কৌটোটা হাতে নিয়ে গদিঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটিপ নস্যি, আবেশে নাসারন্ধ্রে ভরতে ভরতে উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকালেন। আকাশ এ সময়ে পরিষ্কারই থাকে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে হিমালয়ের অনেকগুলো চূড়া দেখা যায়।

দূরের অফিস ঘরে নতুন ছোকরা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট মাথা নীচু করে কাজ করছে। কলকাতা থেকে চালান এসেছে হরিপদ দাস। হরিপদ আসা ইস্তক নবীন মুহুরির কদর যেন রাতারাতি কমে গেছে। হঠাৎই যেন নগেন সাহার কাছে এতদিনের মুহুরির সমস্ত দাম ফুরিয়ে গেছে। নগেন সাহা এখন বড়োলোক। নগেন সাহা ভুলে গেছে, যখন সে সাইকেলের পিছনে মেস্তা ও তোষা পাটের নমুনা নিয়ে মহাজনদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াত, সে সব দিনগুলোর কথা। অকৃতজ্ঞ, বেইমান নগেন সা। আজ চল্লিশ বছর

চাকরির পর তাঁর মাইনে হয়েছে একশো সাতানব্বুই টাকা। তাতেই কথা কত। তাতেই কথার তোড়ে বিস্তর বান। "বুড়ো হাবড়ো দিয়ে চলবে না। আমার ফি-মাসে রেওয়া-মিল চাই," ইত্যাদি ইত্যাদি।

কত বাঘা বাঘা মুহুরিকে এই নবীন মুহুরি একময় ঘোল খাইয়েছে। একটিপ নস্যি নাকে গুঁজে কলমটা দোয়াতে একবার চুবিয়ে নিয়ে খাতা খুলে বসেই নবীন মুহুরির মাথায় যাত্রার অর্কেস্ট্রা বেজে উঠেছে। যত কঠিন সমস্যাই হোক না কেন, এক নিমেষে তার সমাধান হয়ে গেছে। তাই আজ এই বুড়ো বয়েসে এই ছোকরার হাতে হেনস্তা আর সহ্য হয় না।

দূর থেকে হরিপদ অ্যাকাউন্ট্যান্টের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নবীন মুহুরির মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। হরিপদর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

হরিপদ ছোকরা ওস্তাদ আছে। গিয়ে পৌঁছতেই সকলের সামনে ঝাঁঝালো গলায় বলল, কী হল? মুহুরি মশাই? এ মাসের ট্রায়াল-ব্যালান্স, মানে আপনাদের রেওয়া, মিলল?

নবীন উত্তরে কিছু না বলে দুর্বোধ্য বোবা চাউনিতে হরিপদর দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, মিলবে, সবই মিলবে। এতদিন, এতবছর এত রেওয়া মিলিয়ে এলাম, আর আজ হঠাৎ না মেলার তো কোনো কারণ দেখছি না। সময় হলেই মিলবে। এখনও সময় হয়নি।

তারপর একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে নবীন বললেন, আচ্ছা দাসবাবু, নাজাই মানে কী বলুন তো?

হরিপদ কলম থামিয়ে চশমাটা খুলে বলল, নাজাই?

আজ্ঞে হ্যাঁ, নাজাই। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে বললেন নবীন মুহুরি।

হরিপদ বলল, আমি বড়ো ফার্মে আর্টিকলড ছিলাম, আপনাদের এই সব বাংলা খাতার টার্মস আমি জানব কোত্থেকে? বাঙালিদের ব্যাবসা তো দু'পয়সার ব্যাবসা।

নবীন একটু হাসলেন। কারবারিদের মধ্যেও অনেকে নড়ে চড়ে বসল। কেউ-বা কানখাড়া করে ওঁদের কথাবার্তা শুনতে লাগল। হরিপদ চুপ করে থাকাতে নবীন মুহুরি বললেন, তাহলে জানেন না বলছেন?

এ আবার জানার কী আছে? আপনি সময় নষ্ট না করে আপনার বাংলা খাতার ট্রায়ালটা মিলিয়ে ফেলুন গিয়ে। সোমবারে ধুবড়ি থেকে অডিটরেরা আসবে।

আচ্ছা। যাই। বলে, নবীন মুহুরি হরিপদর দিকে একটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেসে আবার টায়ার সোলের চটি ফট ফটিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে খোলা জাবদার সামনে বসে পড়লেন।

নিকেলের সরু ফ্রেমের চশমাটা তীক্ষ্ণ নাকের সামনের দিকে অনেকটা নেমে এল। নাকের পাটা দুটো ফুলে উঠল। নবীন মুহুরি দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, শালার চাটার অ্যাকাউন্ট।

ওদিকে নবীন চলে যেতেই, ও ঘরে কারবারিদের মধ্যে ফিশফাশ শুরু হল। কেউ কেউ নীচু গলায় বলল, বাবা, নবীনবাবু কি আজকের মুহুরি? ওর সঙ্গে আজকালকার বাবুরা পারবেন?

হরিপদ, যোগা সাহাকে শুধোল, জানেন নাকি সা মশায়? নাজাই মানে?

নাজাই মানে জানব না কেন? নাজাই মানে অনাদায়ি টাকা। যা আর ফেরত পাওয়া যাবে না। যা খরচার খাতায় লিখে দিতে হয়।

হরিপদ বলল, ও, ব্যাড ডেট?

— তাই হবে। আপনাদের ব্যাড ডেট, আমাদের নাজাই।

হোপলেস। এ জন্যেই বাঙালিদের ব্যাবসা হয় না। কতগুলো অথর্ব পার্ট টাইম মুহুরি রেখেছে বরাবর, যারা নিজেদের হাতের লেখার কায়দা আর এই সব টার্মিনোলজি নিয়ে অ্যাকাউন্টস ব্যাপারটাকে একেবারে পার্সোনাল নলেজের ইডিয়টিক লেভেলে রেখে দিয়েছে এতদিন। নতুন কিছু জানার ইচ্ছা নেই শেখার ইচ্ছা নেই, নতুন কিছু কেউ করতে গেলেই বড়ো বড়ো পা নিয়ে তার পথ জুড়ে কী করে দাঁড়াতে হয় তাই শিখেছে শুধু। সত্যিই হোপলেস এরা।

যোগা সা বলল, তা যাই বলুন, নবীনদা আমাদের মুহুরি ভালো। কত বড়ো বড়ো খতিয়ান আর জাবদা তিনি চোখের নিমেষে যোগ করে দিয়েছেন। কত বড়ো বড়ো গুণন এবং ভাগা। খাতায় হাত ছোঁয়াতেন না, মুখে আওয়াজ করতেন না — চশমার ফাঁক দিয়ে একবার দেখতেন শুধু আর সঙ্গে সঙ্গে যোগফল লিখে ফেলতেন নীচে। তখন কত কাজ ছিল, সব তো একা হাতে সামলেছেন। আমি জানি, নগেন সা-র নতুন খাতায় দশ রিম করে কাগজ লাগত। গঙ্গাধর নদী বেয়ে পাকিস্তান থেকে তখন পাট আসত। তখন কি রবরবা। নতুন খাতায় শালুর মলাট লাগত। "শ্রীশ্রীশ্রী গণেশায় নমঃ" লিখে পয়লা বৈশাখ গদিঘরে নবীন মুহুরি যখন খাতার সামনে জোড়াসনে বসে চশমা-নাকে কলম হাতে হাতখাতা করতেন তখন দেখবার মতো জিনিস ছিল। আপনারা হয়তো অনেক লেখাপড়া করেছেন হরিপদবাবু কিন্তু তা বলে নবীন মুহুরিকে এমন হেলাফেলা করবেন না।

আমাকে বাবু বলবেন না। সাহেব বলবেন।

কেন? আপনার বাবা ফেলু দাস আমাদের হাটে বরাবর কাটা-কাপড় বেচতে আসতেন। তখনও তিনি লোহার কারবারে বড়োলোক হননি তখন তাঁকে তো আমরা বাবুই বলতাম।

তা হোক। আমাকে বাবু বলবেন না। দাস সাহেব বলবেন?

দাস সাহেব আবার কী? তার চেয়ে হরিপদ সাহেব ভালো শোনায়। হরিপদ সাহেব বলব?

বেশ। তাই বলবেন।

গুড়ের হাঁড়িতে পড়া কালো নেংটি ইঁদুরের মতো চেহারা। সোনার ফ্রেমের চশমা-পরা, গোলাপি টেরিলিনের শার্ট গায়ে, পচা গরমেও টাই পরে থাকা হরিপদ দাস একবার হাসল। ওর চোখে মুখে একটা নিষ্ঠুর ভাব ছড়িয়ে গেল। তারপর গলা খাঁকরে নিয়ে বলল, আপনি জানেন না সা মশায়, আপনাদের নবীন মুহুরিদের এখন সাড়ে সাতাশ টাকায় কিনতে পাওয়া যায়। মাত্র সাড়ে সাতাশ টাকা।

যোগেন সা বলল, হরিপদ সাহেব কী যে বলেন, বুঝি না।

বুঝিয়ে দিচ্ছি। বলে, হরিপদ চেয়ার ছেড়ে উঠে তার পাশের আলমারিটা খুলে একটা সবুজ বাক্সর মতো জিনিস বের করল। তারপর বাক্সটা তার টেবিলের উপর রাখল। বলল, বুঝলেন সা মশাই, এটা আজ সকালেই এসেছে। হাতে যোগ করার কোনোই দরকার নেই। এ মেশিন জার্মানিতে তৈরি। বলুন দেখি, মুখে মুখেই বলুন, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার হিসেব : আমি টক্কা-টরে, টরে-টক্কা করে আপনাকে যোগফল বলে দিচ্ছি। এর নাম অ্যাডিং মেশিন। আজকের দিনে সামনে খেরোখাতা খুলে লম্বা লম্বা যোগ করার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই। খালি অ্যাডিং মেশিন কেন? আরও কতরকম মেশিন বেরিয়েছে আজকাল।

যোগেন সা হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল হরিপদর কথা শুনে।

বলল, আপনারা কি নবীনদাকে ছাড়িয়ে দেবেন না কি?

হরিপদ হাসল, বলল, না না, ছাড়িয়ে দেওয়া হবে কেন? এতদিনের লোক ওঁকে রেখে দেওয়া হবে পুরোনো, অব্যবহৃত আসবাবেরই মতো। ওঁরা অ্যান্টিক হয়ে গেছেন। অ্যান্টিক। তবে ওঁকে বলে দেবেন যে আমার সঙ্গে যেন না লাগতে আসেন। আমি জানি আপনার যাওয়া-আসা, মেলামেশা আছে ওঁর সঙ্গে।

॥ ২ ॥

যোগা সা কথাটা জানাতে বিন্দুমাত্র দেরি করেনি নবীন মুহুরিকে।

নবীন মুহুরি কুঁজো হয়ে খাতার সামনে বসেছিলেন। কথাটা শুনে সোজা হয়ে বসলেন।

বললেন, বল কী যোগেন? এই কথা বলেছে, বলেছে আমার চটি ধুতি-চশমা আমার ফতুয়া আমার এত বছরের সমস্ত অভিজ্ঞতার যোগফল সুদ্ধু আমার দাম সাড়ে সাতাশ টাকা? যন্ত্রটা তুমি নিজের চোখে দেখেছ? সত্যিই কি কোটি কোটি টাকার যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সব আজকাল চাবি টিপে হয়ে যাচ্ছে? এও কি সম্ভব?

যোগেন বলল, আপনি আর ও ছোকরার পিছনে ফুট কাটবেন না নবীনদা। যন্ত্রণা আজব বটে — এতটুকু একটা বাক্স— আপনার মতো হাজারটা মাথার অঙ্ক কষে ফেলেছে এক নিমিষে। ওকে সমীহ করবেন একটু। হরিপদ সাহেবকে।

নবীন মুহুরির গলায় হঠাৎ রাগের ভাব এল।

বললেন, কেন? আমার চাকরি খাবে?

না, না চাকরি খাবে না। এত দিনের লোক, সে বলেছে আপনাকে রেখে দেওয়া হবে। ছাড়ানো হবে না। আপনার চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা একটু কম বলবেন। আপনার জন্যে সত্যি আমার ভয় করছে নবীনদা।

নবীন মুহুরি এক দুর্জ্ঞেয় হাসি হাসলেন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে, চাদরটা কাঁধে ফেলে, ছাতাটা হাতে নিয়ে বললেন, চলো, বাড়ির দিকে যাবে তো?

যোগেন সা বলল, না নবীনদা, আমি একটু হাটে যাব। চলুন হাট অবধি একসঙ্গে যাই।

নবীন মুহুরি ছাতাটা বগলে নিয়ে চাদরটা কাঁধে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, চলো।

সন্ধে হতে দেরি নেই। হাট প্রায় ভাঙো-ভাঙো। খড়ের গন্ধ, গোবরের গন্ধ, পাঁঠা-মুরগির গায়ের গন্ধ, বাহেদের ঘামের গন্ধ আর ধুলো আর কড়া দিশি বিড়ির উগ্র গন্ধে হাটের হাওয়া ভারী হয়ে আছে। এখন হাটের গুঞ্জরন প্রায় ক্ষীণ হয়ে এসেছে। পথের পাশে ঘুঘু ডাকছে। বেতবনে বিদায়ি রোদ্দুর তার গায়ে লেগেছে কুঁচফলের মতো। কৃষ্ণচুড়ার নীচে একদল চড়াই ঝাঁপাঝাঁপি করছে। মুখ নীচু করে নবীন মুহুরি হেঁটে চলেছেন একা একা।

সামনের বাঁকটা ঘুরেই পাঠশালাটা চোখে পড়ল নবীনের।

মাটির বারান্দাটা ধসে গেছে। এখন পাঠশালায় কেউ পড়ে না। গঞ্জের ওদিকে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল হয়েছে। মাটির বারান্দায় একটা লাল কুকুর পা দিয়ে মাটি খুঁড়ে একটা গর্ত বানাচ্ছে। রাতে শোবে বলে।

কুকুরটিকে দেখেই নবীনের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। দৌড়ে গিয়ে ছাতার বাঁটের এক-ঘা কষালেন কুকুরটার মাথায়।

কুকুরটা কেঁউ-কেঁউ-কেঁউ-উ উ করে লেজ গুটিয়ে পালাল। নবীন, পাঠশালার বারান্দায় একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন একটু। খুঁটিগুলো নড়বড়ে হয়ে গেছে, উই লেগেছে। জানালাগুলো খোলা, হাঁ-হাঁ করছে। ঘরের মধ্যে টিনের চালের নীচে চামচিকেরা বাসা বেঁধেছে।

নবীন অনেকক্ষণ একা একা পাঠশালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন, নবীন যেন শুনতে পেলেন, পণ্ডিতমশায় নামতা শেখাচ্ছেন এক উনিশ উনিশ, দুই উনিশ আটত্রিশ, তিন উনিশ সাতান্ন, চার উনিশ ছিয়াত্তর — পাঠশালার ঘর যেন গমগম করছে পোড়োদের সম্মিলিত গলায় আওয়াজে।

এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অনেক পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল নবীন মুহুরির। যেদিন যোগ করতে শিখেছিলেন, যেদিন প্রথম ধারাপাত মুখস্থ করেছিলেন, যেদিন পড়েছিলেন শুভংকরের আর্যা — সে সব দিনের কথা। ভাবতে ভাবতে নবীন মুহুরি কেমন আনমনা হয়ে পড়লেন।

হুঁশ হল যখন একটা শেয়াল পাঠশালার পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল নদীর দিকে।

বারান্দা থেকে নেমে আবার বাড়িমুখো হাঁটতে লাগলেন। চতুর্দশীর চাঁদ উঠে গেছে। ঝিঁঝি ডাকছিল পাতায় পাতায়। আমবাগানে জোনাকির ঝাঁক প্রথম জ্যোৎস্নায় জ্বলছে-নিবছে। হাঁটতে হাঁটতে নবীন মুহুরির মনে পড়ল, হরিপদ দাস বলেছে, তাঁকে রেখে দেওয়া হবে। তিনি পুরোনো লোক। পুরোনো লোক। পুরোনো হাতল-ভাঙা চেয়ারের মতো চাবি হারিয়ে-যাওয়া পুরোনো সিন্দুকের মতো — তাঁর সব প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে — তবু তাকে দয়াপরবশে রেখে দেওয়া হবে।

নিজের মনে একবার হাসলেন নবীন।

বাড়ি পৌঁছোতেই শৈলবালা বললেন, শরীর খারাপ?

নবীন বললেন, না।

॥ ৩ ॥

সে রাতে নবীন মুহুরি একেবারেই ঘুমোতে পারলে না। সারা রাত মাথার মধ্যে সেই অদেখা সবুজ মেশিনের টক্কা-টরে টরে-টক্কা শব্দ শুনতে লাগলেন। সেই অদেখা ছোটো সবুজ যন্ত্রটা নবীন মুহুরির সমস্ত জীবনের গর্ব একেবারে ধুলিসাৎ করে দিল।

খাটের উপরে জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছিল। শৈলবালা নবীনের পাশে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। শৈল বন্ধ্যা। তার বুকে চাপা কষ্ট। শৈলর মুখের উপর চাঁদের আলো এসে পড়েছে। বাইরের মাঠে বনতুলসী ঝোপের কাছে রাতচরা পাখিটা চিরিপ চিরিপ চিরিপ করে জ্যোৎস্নায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

শৈলবালার ঘুমন্ত মুখের দিকে কাছ থেকে চাইলেন নবীন মুহুরি। হঠাৎ তাঁর মনে হল, এতদিন যেন তিনি ছোটো-বউয়ের বুকের কষ্টটা কখনও বুঝতে পারেননি, আজ এই নির্জন নিঝুম রাতে ছোটো-বউয়ের কষ্টটা এসে এই প্রথম নবীন মুহুরির বুকে বাসা বাঁধল।

নিজের মধ্যে নিজে নিঃশেষে ফুরিয়ে গেলে কেমন লাগে জানলেন।

নবীন মুহুরি অনেকক্ষণ খাটের উপর জোড়াসনে বসে বাইরের জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে চেয়ে রইলেন। বসে বসে ঝিঁঝিরা যেন পৃথিবীতে এই শেষবারের মতো শুভংকরের আর্যা মুখস্থ বলছে। শেষবারের মতো তাঁকে ছোটোবেলার সব নামতা শোনাচ্ছে।

নবীন মুহুরি খাট থেকে নেমে জানালায় এসে দাঁড়ালেন। এ জানালা থেকে অন্ধকার রাতেও হিমালয়ের বরফ চাপা চুড়োগুলো দেখা যায়। আশ্চর্য। আজ এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে নবীন মুহুরি ভালো করে তাকিয়েও কিছুতেই হিমালয়কে দেখতে পেলেন না।

নবীন ভাবলেন, হিমালয় খুব বুড়ো হয়ে গেছে বলে বোধহয় কোনো হরিপদ দাস তাঁকেও নাজাই খাতে লিখে দিয়েছে।

চরিত-খেকো অ্যান্ড কোম্পানি

টেবলের উপরে কাচের পেপারওয়েটটা শব্দ করে রেখে হীরেন বলল, আর কী হবে। একেই বলে ঘোর কলি!

সোমেশ বলল, যা বলেছিস। ঠাকমা কালই রাতে চণ্ডীমঙ্গল পড়ছিল শুয়ে-শুয়ে। কলিযুগের কী বর্ণনা রে! যেন কলকাতারই বিজ্ঞাপন।

কী রকম? বল না শুনি।

নেপেন শুধোল।

হীরেন সুর করে আবৃত্তি করল :

"মহাঘোর কলিকাল নীচ হব মহীপাল
সর্বভোগ নীচের সাধন
সঙ্গদোষ পাবে দুঃখ লোক ধর্মে পরাঙ্মুখ
কলিযুগে বেদের নিন্দন।
অন্ধ আদি যত জন রাজধর্মে পরায়ণ
সন্তাষ ছাড়িব সর্বজন
কৃতঘ্ন হইবে নর পরপীড়া নিরন্তর
বেদনিন্দা করিবে ব্রাহ্মণ।"

আরও অনেকখানি আছে।

বলেই হীরেন থেমে গেল।

নেপেন বলল, কৃতঘ্ন মানে কী রে?

অকৃতজ্ঞ আর কী। আরও স্ট্রংগার টার্ম।

তাই বল। একেবারে কারেক্ট বর্ণনা। এই সময়ের। এই দেশের। কলকাতার।

গজানন সোন্থালিয়া শেয়ার মার্কেটের খবর পড়ছিল মনোযোগ দিয়ে একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে কান খোঁচাতে খোঁচাতে। কাগজটা নামিয়ে রেখে বলল, সন্ত তুলসীদাসের রামচরিতমানসেও কিছু কলি-বর্ণনা আছে। কী বলব তোমাদের। বর্ণে বর্ণে মিলে যায় আজকের অবস্থার সঙ্গে।

বুঝতেই পারি। নইলে তুমি শালা হয়েছ আমাদের ফিনান্সিয়র। সিনিয়র পার্টনার! পৈতৃক বাড়িতে আপিসটা করেছি, কোনদিন বাড়িটা পর্যন্ত হাতিয়ে নেবে। পুরো কলকাতা শহরটাই তো তুমি আর তোমার ভাই-ভাতিজা মিলে হাতিয়ে নিয়েছ। কলি যে ঘোর, তাতে আর সন্দেহ কী?

সোমেশ বলল।

গজানন কখনও রাগে না। পয়সা রোজগার করতে অনেকেই গুণ লাগে। ওকে যাই বলা হোক যত কিছু কটুকাটব্যই করা হোক, ও শুধু হাসে। আর সেই হাসি দেখে সোমেশের বুক কাঁপে। মিরজাফরের হাসি।

নেপেন বলল, তা চণ্ডীমঙ্গল না কী তা তো শোনা গেল। এবার গজানন তোমার সন্ত তুলসীদাসও শুনি একটু।

বলেই, হীরেনের দিকে ফিরে বলল চণ্ডীমঙ্গল কার লেখা রে? মা চণ্ডীর?

হীরেন দুঃখ মিশ্রিত আক্ষেপের সঙ্গে হেসে ফেলল নেপেনের কথা শুনে।

বলল, যাঃ শালা! ভালো পার্টনারের সঙ্গেই বিজনেস করছি যা হোক। হাঁদা রে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দর লেখা। সে কি আজকের?

চণ্ডীমঙ্গল কে নেদেছে তা জেনে তো পয়সা রোজগার হয় না। তোর জ্ঞান তোর কাছে রাখ।

একটুও লজ্জিত না হয়ে ক্যাঁট ক্যাঁট করে বলল নেপেন।

মন মেজাজ ভালো নেই। দিশি ডিটেকটিভ কোম্পানিকে লাটে তুলে এখন নতুন কী যে ধান্দা করা যায় তাই ঠিক কর। তোদের এই ফালতু কথাবার্তা আর ভালো লাগছে না।

সোমেশ বিরক্তি ও চিন্তার গলায় বলল।

হীরেন বলল, সেই গিলিগান ডিটেকটিভ এজেন্সি যখন ডিজল্‌ভ করা হয়েই গেছে, ডিসিশান নিয়ে ফেলাই হয়েছে; ও নিয়ে আর আলোচনা না করাই ভালো। তা ছাড়া দিনকালও খারাপ। দেখলি তো কোম্পানি চালিয়ে। দুসস। আরে সি. আই. এ., কে. জি. বি. রাও ডাবল-এজেন্ট আর কাউন্টার এস্‌পায়োনেজ-এর জন্যে লাটে উঠতে বসেছে, আর আমাদের এজেন্সি! তা ছাড়া বড়ো বড়ো কোম্পানিদের তো নিজেদেরই ডিপার্টমেন্ট থাকে। তাদের দরকারই বা কী আমাদের হেল্প নেবার?

নেপেন বলল, হ্যাপার কথা না বলাই ভালো। দেখলি না। মিসেস সেন আমাদের লাগাল মিস্টার সেন তার সেক্রেটারির সঙ্গে প্রেম করছে কি না তা দেখার জন্যে আর

মিস্টার সেন অন্য কোম্পানিকে লাগিয়ে দিল আমাদেরই পেছনে। এমনই ব্যাবসা যে, শালা সামনেই এগোব না নিজের পেছন সামলাব তাই ঠিক করতেই লবেজান। যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। আজই ডিসকাশন করে নতুন লাইনের ব্যাপারটা ফয়সালা করে ফেলতে হবে।

সোমেশ বলল গজাননকে; শুভ কাজে নামার আগে তোমার ওই সন্ত তুলসীদাস বাবাজি কলিযুগ সম্বন্ধে কী বলেন তা একটু শুনিয়ে দাও তো দেখি। তা থেকেই নতুন ব্যাবসার কোনো আইডিয়া মাথায় এসে যেতে পারে হয়তো! কে বলতে পারে?

গজানন সোন্তালিয়া দু হাত কপালে ঠেকিয়ে সন্ত তুলসীদাসের উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করল।

নেপেন বলল অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

গজানন শুরু করল :

"মারগ সোই জা কহুঁ জোই ভারা পণ্ডিত স্যেই জো গাল বজারা
মিথ্যারম্ভ দম্ভ রত জোই তা কহুঁ সন্ত কহই সব কোঈ।"

দুস্‌স্‌ শালা। কী ভাষারে এ! এর চেয়ে তো চাইনিজ বোঝা সোজা। মানেটা কী?

মানে হল, যার যা ভালো লাগে তাই তার পথ। মানে বিবেক টিবেক কিছু নেই। কলিকালে তাকেই পণ্ডিত বলবে সকলে, যে অহংকারী। যে মিথ্যাচারী আর ভণ্ড তাকেই সকলে ভালো লোক বলবে। বলবে আহা। অমন লোক হয় না!

বাঃ। ঠিক। বিবেক একট হারামজাদা। সে হারামজাদাকে গলা টিপে না মারতে পারলে আজকাল অর্থ, মান, যশ কিছুই পাবার উপায় নেই।

হক কথা। নইলে কলি কী? আরও শোনাও গজানন।

"সোই সয়ান জো পরধন হারী জো কর দম্ভ সো বড়ো আচারী।
জো কহ ঝুঁঠ মসখরী জানা কলিযুগ সোখ গুনবন্ত বাখানা।"

আরে, মানেটা বলো না পার্টনার। তোমার শ্রাদ্ধর মন্ত্র কে শুনতে চায়?

মানে হল, এই যুগে তাকেই বুদ্ধিমান বলে যে পরের ধন চুরি করে। অর্থাৎ চোরেদেরই বাজার এখন। যে এখন যত বড়ো ভণ্ড সে তত বড়ো নিষ্ঠাবান। যে মিথ্যাবাদী এবং ফিচেল সেই কলিযুগে দারুণ গুণবান বলে পরিচিত। আরও অনেক আছে।

অনেক দরকার নেই। আর একটা শোনাও। জাস্ট একটা।

"জে আপকারী চার, তিহ্ন কর গৌরব মান্য তেই।
মন ক্রম বচন লবার, তেই বকতা কলিকাল মহুঁ।।"

অর্থাৎ যারাই এখন পরের অপকার করে তাদেরই রবরবা, গৌরব। তারাই এখন মান্য-গণ্য কেওকেটা। মনে, কথাতে এবং কাজেও যারা মিথ্যেবাদী তাদেরই কলিযুগে বক্তা বলে মানে সকলে।

নেপেন বলল, আমাদের জন্যে আইডিয়াল কন্ডিশান মাইরি। এই বেলা টু-পাইস কামিয়ে নেওয়ার ধান্দা ঠিক করে ফ্যাল।

তারপর বলল, গজানন ভাই, তোমার ব্রেনের তুলনা নাই। সরষের তেলে শেয়ালকাঁটা থেকে মাখনে কচুবাটা এসব তো তোমারই মাথা থেকে বেরিয়েছিল একদিন।

কেন? চারভাগ তিসির তেলের সঙ্গে একভাগ ইটালিয়ান অলিভ অয়েল মিশিয়ে "হুইলে ডি অলিভ" করে বেচে গঙ্গা চাটুজ্যের ব্যাবসাটা কিনে নিল না? আমাদেরও অবশ্য টু-পাইস হয়েছিল। মিথ্যে বলব না। তবে ব্রেন তো গজাননেরই। তোমার ঝুনঝুনুর ঘিয়ে কী আছে বাওয়া? বুদ্ধি যা বেরোয় এক একখানা!

নেপেন বলল।

এবার একটা বুদ্ধি নিকলাও ইয়ার। এই সামারে ওয়াইফকে নিয়ে আমেরিকা যেতে হবে। বড়ো শালি চিঠি লিখে লিখে লাইফ হেল করে দিল। মাল চাই। কুইক মাল। আজকাল বাগবাজারে একজন লোকও বের করা মুশকিল বোধহয় যে আমেরিকা যায়নি। সবাই এত বড়োলোক হয়ে গেছে যে, বলার নয়। আমারই প্রেস্টিজ পাংচার একেবারে।

গজানন আবার কিছুক্ষণ কান খোঁচাল। বলল, ডিটেকটিভ এজেন্সিটা করার ডিসিশানটা ঠিকই হয়েছিল। তবে লাইনটা বেশি কমপিটিটিভ হয়ে গেছে কিছুদিন হল। তাছাড়া বড়ো গ্রুপ থাকলে তার একটা ইউনিট হিসেবেই ওই ব্যাবসা চালাতে সুবিধা। একমাত্র ব্যাবসা হিসেবে...

একটা কথা। বিজনেস করতে হলে ক্যাপিটাল ইনপুট বেশি। ইন্ড্রাস্ট্রি তো করতে চাই-ই না আমরা। কনসালটেন্সি-মেন্সি করাই আজকাল ভালো। খাটনি নেই, ক্যাপিটাল নেই; ফোকটাই টাকা। রডন স্কোয়ার, সল্টলেক স্টেডিয়ামের কথা সব পড়লি না কাগজে? গভর্নমেন্টের সঙ্গে লাইন করতে পারলেই পটাপট কাজ। তারপর লাগা লুঠ। "কোম্পানিকা মাল দরিয়ামে ডাল।"

আজকাল শুধু মিনিস্টার পাকড়ালেই হবে না। অ্যাডমিনিস্ট্রেশানও হাতে থাকা চাই। জমানা খারাপ।

এবং অপোজিশনও।

একটা ইন্ড্রাস্ট্রির কথা আমার মাথায় এসেছে অনেকদিন হল। এই বাজারেই ভালো চলবে প্রডাক্টটা।

গজানন বলল।

কী?

গোরুর চোনার কনসেনট্রেট। কেমিক্যাল ইন্ড্রাস্ট্রি। বড়ো প্লান্টের দরকার নেই। সিড ক্যাপিটাল যদি পাঁচ লাখ দেখাই তো ব্যাংক আর ফিনান্সিয়াল অর্গানাইজেশানগুলো চারগুণ দেবে। কারখানা বলে একটা বাগান বাড়ি করব ব্যাকওয়ার্ড এরিয়াতে। মাঝে মধ্যে বাইজির গানটান শোনা যাবে। মেশিন তো কিনবই না। পাঁচ হাজার টাকার কম দামি ইউনিট কিনছি এইরকম দেখিয়ে সিধা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে ডেবিট করে দিয়ে পুরো ডিপ্রিসিয়েশান নিয়ে বেরিয়ে যাবে। তার উপরে সেকশান এইটি এইচ এইচ সি-র ডিডাকশান। শালার গভর্নমেন্টের এদিকও মারা হবে। ওদিকও।

সেটা বাড়াবাড়ি হবে না? আজকাল ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট খুব কড়া হয়ে গেছে। শেষে অতি লোভ করতে গিয়ে জেলে না যেতে হয়।

সোমেশ বলল।

কলকাতায় তোমরাই শালা বুদ্ধু রয়ে গেলে। দিল্লি বম্বে ব্যাঙ্গোলোরে যে ফুটুনি দ্যাখো, ইম্পোর্টেড গাড়ির সারি, ফাইভ স্টার হোটেলে মোচ্ছব, তার অনেক পারসেন্টই যে ব্যাংক-মারা টাকাতে আর ভুজংভাজুং-এ তা কি জান?

গজানন বলল।

কথাটা অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছে। প্রডাক্টটা ঠিক কী? প্রডাক্টটার প্রসপেক্ট কী?

হীরেন বলল।

তোমরা কীরকম বাঙালি জানি না। কথায়ই বলে, "এক গামলা দুধে এক ফোঁটা চোনা"। ঝুনঝুনুর লোক কি তোমাদের বাংলাও শেখাবে?

তা তো হল। কিন্তু মানে বুঝলাম না।

এখনকার মানুষের টেনডেনসিই হচ্ছে অন্যের অপকার করা। বিশেষ করে বাঙালিদের। কিছু মনে কোরো না। কারো উপকার করা নয়। সন্ত তুলসীদাস-এর শ্লোক শুনলে না?

হ্যাঁ। কিন্তু এখনও বুঝলাম না। খোলসা করে বলো।

চোনা থেকে, চোনার সমস্ত গুণাগুণ, মানে দোষাদোষ ইনট্যাক্ট রেখে আমরা একটি কালার-লেস অডার-লেস লিকুইড তৈরি করব। ছোটো ছোটো বায়োকেমিক ওষুধের শিশিতে তা ভরে ইয়া-বড়ো প্লাস্টিকের কেসিং করে দাম করব পঞ্চাশ টাকা। কস্ট পড়বে হয়তো পনেরো পয়সা।

তা তো হল। লোকে কিনবে কেন?

অন্যের কর্ম ভণ্ডুল করতে। আবার কেন? মনে করো তোমার জিজার বা সাড়ুভাই-এর খুব তেল বেড়েছে, খুব টাকার গরম হয়েছে, তা তার বাড়ির নেমন্তন্নে গিয়ে ডালে ফেলে দাও এক ফোঁটা। ডাল সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার মুত হয়ে যাবে। রসগোল্লা হচ্ছে কোথাও, গিয়ে ফেলে দাও এক ফোঁটা কড়াইয়ে, কেলোমোল্লা হয়ে যাবে।

কিন্তু এই প্রডাক্টের বিজ্ঞাপনই বা দেবে কী করে গজানন? এ প্রডাক্ট তো অ্যাডভার্টাইজ করতে পারবে না।

গুলি মারো তো! আজকাল যে সব অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি হয়েছে না! সব উইজার্ডস। নর্দমার জল বেচতে বলো তাও বেচে দেবে। এখন বিজনেসের আসলি কথা হচ্ছে প্যাকেজিং আর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। প্রোপাগান্ডা আর মলার্টই সার কথা। মধ্যে যে মালই থাকুক। আরে, আমার বড়ো শালার বড়ো ছেলে ছারপোকা মারার ওষুধ বের করেছে। ছোটো ছোটো হোমিয়োপ্যাথিক ওষুধের পুঁচকে পুঁচকে শিশিতে লাল নীল সবুজ নানা রঙা ওষুধ ভরা থাকে। দাম পাঁচ টাকা। এজেন্সি টিভি-তে যা অ্যাড করল তা কী বলব? সেই পঁচিশ বছরের ছোকরা কোটিপতি হয়ে গেছে ছ'মাসে।

ছারপোকা নিশ্চয়ই মরে তাহলে। নইলে কি আর...

হ্যাঁ। মরে বইকী। গজানন বলল, হেসে। ওষুধের নাম "খটমি।" হিন্দিতে ছারপাকাকে তো "খটমল" বলে। তা থেকেই "খটমি"। ওষুধের গায়ে দারুণ কাগজে ব্যবহারবিধি লেখা থাকে। "সাবধানে ছারপোকা ধরে, সবতনে মুখ হাঁ করিয়ে, এক ফোঁটা গিলিয়ে দেবেন। মৃত্যু অনিবার্য।"

হীরেন হো হো করে হেসে উঠল। গজাননের কথা শুনে। হাসল অন্যরাও।

হাসবার কী আছে? এইটাও তোমাদের বেঙ্গলি পোয়েট সুনির্মল বসুর কোনো গল্প থেকে মারা। এখন তো মারামারিরই দিন! কিন্তু এজেন্সি একটি লাজওয়াব সুন্দর মডেলকে দিয়ে গ্রামের মাটির ঘরের ব্যাকগ্রাউন্ডে দড়ির খাটিয়ার সামনে নাচিয়ে নাচিয়ে গান গাওয়াল। দারুণ সুরে। 'হাই! খটমল! খটমল।

খটমি লেতে আও।
জলদি লেতে আও।
অউর চৌপাইমে ওরওয়াক্ত
বিবিকি গোড় দাবাও।"

আহা! আর কী মিউজিক! মডেলের কী দারুণ লো-কাট ব্লাউজ। একটু একটু দেখা যাচ্ছে। খটমল-এর বাপের সাধ্য কি তারপরও বাঁচে। জাতে পুংলিঙ্গ হলে তো কথাই নেই।

কই, টিভি-তে ওই অ্যাড তো দেখিনি! ন্যাশনাল নেটওয়ার্কে দেখায় বুঝি?

না না। শুনেছি বিহার আর উত্তরপ্রদেশে দেখায়। লোকালি এই "খটমি" নাকি ক্যাপ্টার করে দিয়েছে।

ওই অ্যাড এজেন্সির নাম কী?

নেপেন শুধোল।

"দ্যা ইম্‌পসিবল (প্রা.) লিমিটেড।" এলাহাবাদের সিভিল লাইনস-এ অফিস।

হীরেন ভুরু কুঁচকে ভাবছিল।

বলল, গজানন আজ তুমি তোমার আত্মীয়স্বজনের বিজনেস এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাচিভেমেন্টস নিয়েই অত্যন্ত ওভারহোয়েলমড হয়ে আছ। আমাদের নতুন ভেনচার যে কী হবে সে বিষয়ে একটুও এগোনো যাচ্ছে না।

বলেই, নেপেন আর সোমেশের দিকে চেয়ে বলল তোরাও কিছু সাজেস্ট কর। ব্যাবসাটা তো গজাননের একারই নয়! ওর ওপরেই যদি সব দায়িত্ব চাপিয়ে বসে থাকিস তবে আমরা কী করব? টাকার সিংহভাগ দেবে ও ব্যাংক লোন জোগাড় করবে ও; গভর্নমেন্ট লেভেল-এ সকলকে ম্যানেজ করবেও ও তো আমরা করবটা কী? ঘণ্টা?

সোমেশ রেগে বলল ছাড় তো। যেন এমনি এমনিই করে! ওর তিন নম্বর রোজগারও তেমন কত তুই জানিস?

তিন নম্বর?

গজানন অবাক গলায় প্রতিবাদ করে উঠল।

ইয়েস। তিন নম্বর।

মানে?

দু নম্বরের একটা পার্ট ও মারে না? দু নম্বর মারলে তা কত নম্বর হয়? হয় না তিন নম্বর?

গজানন বলল শাবাশ সোমেশ। এই নইলে বাঙালির ব্রেইন। তা লাইন একটা বাতলাও না নতুন। ব্রেইনের তারিফ করব আরও।

সোমেশ বলল, তোমার ওই গোরুর চোনার কনসেনট্রেট ব্যাপারটা আমাকে অ্যাপিল করছে না। অন্য কিছু বলো।

আমি ভাবছি। তোমরাও ভাবো। তবে আমি তোমাদের সঙ্গে একমত। বিজনেস বা ইন্ডাস্ট্রির চেয়ে কনসালটেন্সি লাইনই ভাবো। আজকাল ওই সবেরই দিন। কম্পিউটার টেকনোলজি, ইনভেস্টমেন্ট এজেন্সি, ল্যান্ড বিল্ডিং-এর কনসালট্যান্সি। ছিমছাম অফিস করব। কুড়ি জনের কম স্টাফ। প্রভিডেন্ট ফান্ড নেই, ই. এস. আই. নেই, ইউনিয়নের ঝুট-ঝামেলা নেই। এয়ারকন্ডিশানড অফিস। স্মার্ট সুন্দরী রিসেপশনিস্ট।

হীরেন বলল, দুস শালা! গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

হঠাৎ নেপেন বলল, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। চলবে?

কী? কনসালটেন্সি?

হ্যাঁ রে।

বল। বল। চুপ করে আছিস কেন?

নেপেন দ্রুত হাতে সিগারেটের প্যাকেট বের করল পকেট থেকে।

ছেড়ে দিয়েছিস বললি না সেদিন।

সত্যিই দিয়েছি। কিন্তু এইরকম এমার্জেন্সি থিংকিং-এর সময়ে। বুঝতেই পারছিস।

বুঝেছি। বল এবার।

নেপেনের সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিয়ে দিল সোমেশ এমনই যত্নে যেন বাপেরই মুখাগ্নি করছে।

নেপেন সিগারেটে একটা মস্ত টান লাগিয়ে বলল আজকের সবচেয়ে বড়ো আধুনিক অস্ত্র কী বল তো শত্রুনিধনের? মানে শত্রুকে শেষ করার বেস্ট উপায় কী?

কী? নিউক্লিয়ার বম্ব?

গজানন বলল।

ইডিয়ট।

সেলফ-লোডিং রাইফেল এস-এল-আর?

হীরেন বলল।

স্টুপিড।

বোমা। লেটার-বম্ব।

যাচ্ছেতাই!

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সিগারেটে আর-এক টান দিয়ে বলল নেপেন।

কী তবে?

ক্যারেকটার-অ্যাসাসিনেশান। চরিত্র-হনন। এই হত্যা এমনই এক জিনিস যে, বুলেট-প্রুফ -জ্যাকেট বা বুলেট-প্রুফ বক্স বা গাড়ি বা কম্যান্ডো কোনো কিছুর সহায্যেই এই মৃত্যুর হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারে না।

সকলেই হো-ও-ও-ও করে চেঁচিয়ে উঠল নেপেনকে কনগ্রাচুলেট করে।

গজানন বলল, এই জন্যেই বলি! আমার দাদামশাই সাঙ্গেনারিয়াজি বারবার বলতেন: ব্যাবসা করবে বাঙালিদের বুদ্ধি নিয়ে। ওরা জিনিয়াস। কম খাঁই কিন্তু বুদ্ধিতে দুসরা নাই।

নেপেন বলল, কথা বোলো না এখন গজানন। আমার কনসেনট্রেশান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তোমরা সকলেই লক্ষ করে থাকবে যে, প্রতি মুহূর্তে আমাদের চারপাশে স্বামী-স্ত্রী, উকিল-জজ, ব্যাবসাদার, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, সম্পাদক-সাংবাদিক-সাহিত্যিক, খেলোয়াড়, ম্যানেজার, ক্যাপটেইন, বোলার, ব্যাটসম্যান, গুরু-শিষ্য, উপাচার্য, অধ্যাপক, মাস্টারমশাই-ছাত্র সমানে একে অন্যের চরিত্র হননের চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই অপচেষ্টা চলেছে একই পেশার লক্ষ লক্ষ মানুষেরও মধ্যে। প্রতিমুহূর্তে।

আর বলতে হবে না তোকে। বুঝেছি আমরা। চতুর্দিকে এভরি মিনিট যে রেটে মানুষের চরিত্রের মৃত্যু ঘটানো হচ্ছে, মানে চরিত্রকে খুন করা হচ্ছে অথবা খুনের চেষ্টা করা হচ্ছে সেই রেটে ভারতবর্ষ বা চায়নার মেয়েরা কনসিভও করছে না। অনেক সময়ে এই হত্যা কী ভাবে করা হবে তা বিরুদ্ধ পক্ষ ঠিক করেই উঠতে পারে না। ইচ্ছে থাকলেও শক্তি থাকে না। স্ট্যাটেজিতে গোলমাল করে। অনেক জায়গায় অত্যন্ত ক্রুড ওয়ে-তে চরিত্রের মৃত্যু ঘটানো হয়, অনেকটা ভারী হাতুড়ি দিয়ে মানুষের শারীরিক মৃত্যু ঘটানোরই মতো। ক্যারেকটার অ্যাসাসিনেশান আজকে একটা আর্টের পর্যায়েই পৌঁছেছে। অন্তত পৌঁছোনো উচিত। এবং এই লাইনে যদি আমরা স্পেশালাইজ করি তো কোনো শালার ব্যাটা শালার সাধ্য নেই যে আমাদের রোখে। আমরাই এই আর্টকে পারফেক্ট করব। পরে, সারা দেশে এবং পৃথিবীতে ব্রাঞ্চ খুলব।

গজানন উত্তেজিত হলেই ক কে খ উচ্চারণ করে চিরদিনই।

ও বলল, কিন্তু খি করে খি হবে? মোডাস অপারেন্ডি ঠিখ খরা ...

নেপেন বলল, আমরা কনট্রাক্ট নেব ক্যারেকটার অ্যাসাসিনেশানের। মিনিমাম রেট পাঁচ হাজার টাকা। তারপর পার্টি বুঝে পাঁচ লাখও নিতে পারি। তুই কিন্তু পলিটিক্যাল লাইনের লোকদের কথা ভুলে যাসনি। ওই এরিয়াতেও আমাদের ব্যাবসার প্রচণ্ড পোটেনশিয়ালিটি আছে। বিশেষ করে ইলেকশানের আগে।

হীরেন বলল।

হ্যাঁ। সেই সব ক্ষেত্রে কিন্তু মিলিয়নে হাঁকব। আমাদের ফিজ। পার্টিদের টাকার অভাব কী?

সোমেশ বলল, ওরে গজা! আমাদের নেপেনের ব্রেইন দেখলি! ও চলেই যাক আগামী সামারে ওর ওয়াইফকে নিয়ে সিস্টার-ইন-ল'র কাছে। আমেরিকাতে। অন দ্যা হাউস। দ্যা কোম্পানি উইল বেয়ার ওল এক্সপেনসেস। ক্লাব-ক্লাসের টিকিট কেটে দেব আমরা তোকে নেপেন।

সকলে সমস্বরে বলল, নিশ্চয়ই। একশোবার।

গজানন বলল, কিন্তু নাম কী হবে কোম্পানির? ক্যারেকটার অ্যাসাসনেশান প্রা. লি.?

যাঃ। লোকে ধরে ফেলবে না। কাজটা তো গোপনীয়। এবং ডেঞ্জারাসও। একটা ডিসক্রিট নাম দিতে হবে।

আমরাও একটা আর্মড-উয়িং রাখব। টাকা রোজগার করতে ভয় পেলে চলে।

একটা দিশি-দিশি গন্ধের নাম দে। ওই নামটা চলবে না। এমন একটা নাম যে, দিশি বিদিশি সকলেই ইনকুইজিটিভ হবে।

তাহলে কী? চরিত্র হনন প্রা. লিমিটেড?

হীরেন বলল।

আজ সকলে সন্ত তুলসীদাসের রামচরিত মানসের শ্লোক বলছিলাম তো, চরিত্রর বদল চরিত দিলে কেমন হয়?

নেপেন আর-একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল, গজানন ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, বাজে সিগারেট খেয়ো না ভাই। আমি ক্লাসিকস আনিয়ে দিচ্ছি। রাম সিং ...

তা আনাও। ততক্ষণে একটা খেয়ে নিই। ভীষণ টেনশানে আছি।

বলেই, নতুন সিগারেট ধরিয়ে একটা কলকে-ফাটানো টান দিয়েই নেপেন বলল পেয়েছি নাম।

কী?

চরিত-খেকো অ্যান্ড কোং। "খেকো" কথাটাতে বেশ ম্যানইটার ম্যানইটার একটা গন্ধও থাকবে। আর ইংরিজিতে সাইনবোর্ড ও লেটার হেড হলে নামটাকে ইনোসেন্টও দেখাবে।

বলেই বলল, লেখ তো সোমেশ। দেখা যাক, লিখিতভাবে কেমন দেখায়?

সোমেশ লিখল, CHARIT-KHEKO AND CO.

হীরেন বলল, বাঃ।

গজানন বলল, ওয়াহ। ওয়াহ। জয়। সন্ত তুলসীদাস জি কি জয়। খি খারবার।

আমাদের সময়ে

পটাদার বড়ো ছেলে বিলুর বউভাতে বহু বহু বছর পরে দেখা হয়ে গেল ঝড়-এর নিভাদির সঙ্গে।

বউ বসেছিল দোতলাতে।

বিয়ের জন্য ভাড়া নেওয়া বাড়িটির সিঁড়ি খুব সরু। আর গরমও ছিল সেদিন প্রচণ্ড। দোতলা থেকে বউ দেখে নামছে যখন ঝড়, তখনই সিঁড়িতে নিভাদির সঙ্গে দেখা।

কী রে! চিনতে পারছিস? ঝড়? ঝড় আর ঝঞ্ঝা কী আনকমন নাম ছিল রে তোদের ভাইবোনের। তাই, তোদের ভোলা যে মুশকিল।

ঝড় প্রথমে চিনতেই পারেনি। প্রায় চল্লিশ বছর পরে দেখা। কিন্তু একমুহূর্ত চেয়ে থাকার পরেই ওর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

ভেবেছিল, যাঁরা ভাবেন যে ঝড় শুধু উড়িয়েই নেয়, তাঁরা সবটুকু জানেন না। ঝড় থিতুও করে। অনেক সময়েই।

মাথার মধ্যে মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এসেছিল চল্লিশ বছর আগেকার আসামের ধুবড়ি শহর, গৌরীপুর, কুমারগঞ্জ, ব্রহ্মপুত্র আর তার শাখনদীদের দু-ধার থেকে কুড়িয়ে আনা সাদাটে নুড়িঢালা কাঁচাপথ। মনে ফিরে এসেছিল শিশিরের গন্ধ। শান্ত, নিস্তরঙ্গ জীবন। ক্লোরোফিল-উজ্জ্বল গাছগাছালি। মন-উদাস করা ডাক ডেকে যাওয়া পাখপাখালি। টি-এইট মডেল-এর কনভার্টিবল হুডখোলা ফোর্ড গাড়িটাড়ি সুদ্ধ ঝড়-এর জীবনে হারিয়ে যাওয়া একটি পুরো অধ্যায়ই যেন নিটোল উঠে এসেছিল নিভাদির গলার স্বরের সঙ্গে। তাঁর হাসির সঙ্গে অশেষ প্রসন্নতায় নিভাদির হাতে বানানো আমপোড়া শরবত-এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি হয়ে দূরের অনেক ভোর আর দুপুর, সন্ধে আর রাত চকিতে ফিরে এসেছিল।

আশ্চর্য! আপনি কিন্তু একটুও বদলাননি নিভাদি।

ঝড় বলল।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন নিভাদি।

ঠিক যেমন করে গৌরীপুরে ওঁদের বাড়ির বারান্দাতে বসে হাসতেন। হাসিটাও অবিকল একইরকম আছে।

ভাবল, ঝড়।

সেই যুগে মেয়েদের অমন অট্টহাস্য করা বারণ ছিল। কিন্তু নিভাদি ছিলেন তৎকালীন মেয়েদের পক্ষে মান্য সমস্ত নিয়মের বিরুদ্ধে এক জাজ্জ্বল্যমান বিদ্রোহ। লম্বাচওড়া, হাসিখুশি, অবিবাহিতা; নিজের যৌবন ও হাসির তোড়ে পারিবারিক, আর্থিক, সামাজিক সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকেই বর্ষার ব্রহ্মপুত্রেরই মতো ভাসিয়ে নেওয়া একজন স্বরাট মহিলা। যাঁর সুন্দর, সপ্রতিভ, স্বাধীন জীবনের কথা জানলে উইমেনস-লিব-এর প্রবল প্রবক্তা আধুনিককালের যে কোনো মহিলাই আজ আশ্চর্য হয়ে যাবেন।

নিভাদি আজও অবিবাহিতা। ষাটোর্ধ্বা কিন্তু বার্ধক্য তো দূরস্থান, প্রৌঢ়ত্বও যেন স্পর্শ করতে পারেনি তাঁকে। এখনও যুবতিই।

হাসতে হাসতেই বললেন নিভাদি, বল রে ঝড়! ঝঞ্ঝা কেমন আছে রে?

নেই। চলে গেছে কবেই! পঁচিশ বছর বয়সেই।

ঝড় বলল।

কী হয়েছিল?

কিছুই হয়নি। কলকাতার পথে বাসে চাপা পড়ে গেছে।

বিয়ে হয়েছিল?

না।

বাঁচোয়া।

সত্যি! তোদের কলকাতার বাসগুলো প্রত্যেকটাই খুনি। আর পুলিশেরা ... অথচ ... খবর কাগজের ভাষায় যাকে বলে "আত্মবিস্মৃত", তোরা হলি তাই।

সে কথা সত্যি। কিন্তু আপনি আমাকে চিনলেন কী করে নিভাদি? কত বছর, কী কত যুগ পরেতে দেখলেন। আমি তো বুড়োই হয়ে গেছি। খোলসটাতেই অবশ্য। গোরুর গাড়ির মধ্যে জেট-এঞ্জিন বসালে যেমন অবস্থা হয়, আমার অবস্থা তেমনই। মনটা সেই পঁচিশ বছরেরই আছে। আর শরীরটা ...।

ভারী কষ্ট হয় এই বৈপরীত্যে। জানেন!

মুখে একটু জরদা ফেলে নিভাদি বললেন, আর বলিস না। আমারও তো সেই অবস্থাই। কী কষ্ট! কী কষ্ট! তুই-ই বুঝলি শুধু। অন্যে বোঝে না একেবারেই।

ঝড় হাসল। ভালো লাগল নিভাদি আজও তেমনই রসিক আছেন যে, তা লক্ষ করে!

তারপর জিজ্ঞেস করল, বিভাদি কোথায় আছে এখন?

বিভা?

হাসতে হাসতেই বললেন নিভাদি, পানের ঢোঁক গিলে মুখ দিয়ে ভুরভুর করে জরদার গন্ধ বেরোচ্ছিল।

বললেন, সে তো পটল তুলেছে সেই কবেই।

কে যেন পাশ থেকে বলল, এত জরদা খেয়ো না নিভাদি। ক্যানসার হবে। এনি ফর্ম অফ টোব্যাকো ইজ ব্যাড।

ছাড় তো।

নিভাদি বললেন, ঢোঁক গিলে।

তারপর বললেন, তোরাই বাঁচ অমন পুতুপুতু করে। আমরা এমনি করেই বেঁচেছি, এমনি করেই বাঁচব। এবং খবরদারির মধ্যে বেঁচে থাকা মরারও অধম।

সে কী? বিভাদি! ঝড় বলল।

হ্যাঁ। তা তোর এত অবাক হওয়ারই বা কী আছে? পটলের খেতেই তো আমাদের বাস। কে কবে পটল তুলবে তার অপেক্ষাতেই তো দিন গোনা অনুক্ষণ।

ইসস।

তবুও বিভাদির শোকে বিহ্বল হয়ে ঝড় বলল।

তার সহোদরা ঝঞ্ঝারও মৃত্যু হয়েছে আরও অল্পবয়সে। কিন্তু বিভাদিও যে কোনোদিন চলে যেতে পারে, বিশ্বাসই হয় না। কালো, ছিপছিপে, চশমা পরা ফাস্ট-ইয়ারে পড়া, দু-বিনুনি করা বিভাদির মিষ্টি বুদ্ধিমাখা মুখটা, চল্লিশ বছর আগে দেখা মুখটা ঝড়ের মনের ফ্রেমে এমনইভাবে বাঁধানো রয়ে গেছে যে, সেই ছবিতে একটুও ধুলো ময়লা, এমনকি চুল পরিমাণ আঁচড়ও পড়েনি। বড়ো উজ্জ্বল হয়ে আছে বিভাদির সেই ছবিটি। বরবাধা ফরেস্ট রেঞ্জ-এর বন-বাংলোর কাঠের বারান্দার কাঠর রেলিং ধরে শ্রাবণের এক মেঘলা দুপুরে আজও যেন দাঁড়িয়ে আছে বিভাদি। চিরটাকাল অমনি করেই থাকবে।

উদাস হয়ে গেল ঝড়।

নিভাদি বললেন, পান তো নিলি। জরদা খাবি না?

নাঃ। জরদা খাই না।

দাঁত সব ঠিক আছে তোর?

সব ঠিক নেই। একে একে নোটিশ দিচ্ছে।

তবে খাবি না কেন? জরদা না খেলে পান খেয়ে কী লাভ? ঘাস খেলেই হয়।

নাঃ, থাক। মাথা ঘুরবে।

আরে না, নে, একটু। তোদের কলকাতার এই আওয়াজে আর ধুলো-ধোঁয়োতেই যদি মাথা না ঘোরে তবে একটু জরদা খেলেও ঘুরবে না। সত্যি! তোরা থাকিস কী করে যে এখানে? এই নরকে?

নিরুপায়েই। আর কী করে! অন্য উপায় থাকলে কী আর থাকতাম।

তোদের সেই কালীঘাটের বাড়িটা আছে তো, ঝড়?

বলেই বললেন, আয়, আয়। এখানে একটু বসি। সিঁড়ির নীচে। পাখার হাওয়াও খাব। আয় একটু সুখদুঃখের কথা বলি। পুরোনো দিনের কথা। আমাদের সময়ের কথা। কী যে ভালো লাগছে তোর সঙ্গে দেখা হয়ে কী বলব!

নিভাদির পাশে হলুদ-রঙা কাঠের চেয়ারে বসে ঝড় বলল, নাঃ, কালীঘাটের সেই বাড়িটা আর নেই। এজমালি সম্পত্তি ছিল তো! এক পয়সাওলা গুজরাটি কিনে নিয়েছে। কলকাতাতে বাঙালিদের বাড়ি এখন আর খুব বেশি নেই নিভাদি। ভবিষ্যতে আরও কমে যাবে।

তো এখন বাঙালিরা থাকেটা কোথায়?

সব দূরে দূরে। 'ডেইলি-পাষণ্ড' হয়ে বেঁচে আছে তারা। সব বেচারামবাবু। মারোয়াড়ি-গুজরাটি-পঞ্জাবির চাকর।

সত্যি!

নিভাদি বললেন।

সত্যি।

এমন সময়ে লোডশেডিং হয়ে গেল হঠাৎ।

সামান্যক্ষণ অন্ধকার। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎই নিস্তব্ধতাও নেমে এল। বরবাধার জঙ্গলের বর্ষা রাতের গন্ধ ও শব্দ যেন উড়ে এল বহু মাইল দূর থেকে।

তারপরেই জেনারেটর চালু হল। মাথার মধ্যের সব শান্তি ছিঁড়েখুঁড়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে।

আপনারা এখনও গৌরীপুরেই থাকেন? নিভাদি?

না। না। সেখানে কেউই নেই। আর সেই গৌরীপুর কী আর আছে?

মাটিয়াবাগ প্যালেস?

আছে, কিন্তু সেই জৌলুস নেই। ঘিঞ্জি হয়ে গেছে সুন্দর শহরটা। মানুষ। মানুষ। বড়ো বেশি মানুষ। শুয়োরের মতো, ইঁদুরের মতো। গাছ কমে গেছে, ছায়া কমে গেছে, শান্তি নেই কোথাও। মানুষই মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। পুরো পৃথিবীটাই ছারখার করে দিল মানুষে। মানুষ থিকথিক করে চারদিকে কিন্তু মানুষের মতো মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। সেই পৃথিবীটাই তো হারিয়ে গেছে। দুঃখ করে কী লাভ?

মনে মনে বলল, ঝড়।

তারপর বলল, আপনি গৌরীপুরেই থাকেন তো?

গৌরীপুরে নয় রে, এখন আমি কোচবিহারে থাকি। রিটয়ার করেছি তো বহুদিন। ওখানেই থাকি। পটার এক মেয়ে থাকে আমার সঙ্গে, কিন্তু ওঁদের পরিবারে থাকি না। মেয়েটাকে নিয়ে একাই থাকি। সারাজীবন ওই চ্যাঁ-ভ্যাঁ অ্যাভয়েড করার জন্য নিজে বিয়েই করলাম না, আর শেষ জীবনে অন্যের ঝামেলাতে জড়াব অমন বোকা আমি নই। পটার মেয়ে খুকুকেও সেই কথা বলে দিয়েছি পরিষ্কার করে। যেদিন বিয়ে করবে, সেদিনই

গেটআউট। তবে, মেয়েটা ভালো। পড়াশোনায়, গানবাজনায়। সবচেয়ে বড়ো কথা, গভীরতা আছে, আমাদের যেমন ছিল। বই পড়ে। টি. ভি.-র পোকা নয়; আজকালকার অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের মতো অগভীর নয়, ছ্যাবলা নয়।

ননী এসে বলল, কী পিসি? তুমি যে এখানে মৌরসিপাট্টা গেড়ে বসলে। বাড়ি যেতে হবে না?

আরে, ঝড়ের সঙ্গে দেখা হল কত যুগ পরে। একটু কথা বলি। কতই না পুরোনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছে কী বলব!

কিন্তু এখন না উঠলে হবে না। বিরাটি স্পেশ্যাল ছাড়বে এখুনি।

সেটা কী বস্তু?

ঝড় শুধোল। ননীর দিকে চেয়ে।

রন্টু একটা ট্রাক্স গাড়ি কিনেছে। ডিজেল। গাড়িকে গাড়ি, বাস-কে বাস। মার্সিডিজ-এর এঞ্জিন। একেবারে স্মুথ। মাখনের মতো। চমৎকার বডিও বানিয়ে নিয়েছে। বারোজন লোক আরামে বসা যায়। এখনই ছাড়বে সে গাড়ি। এই গাড়িতে না গেলে আমদের দুর্ভোগ হবে।

রন্টু এখন বিরাটিতে থাকে নাকি? কী করে?

ঝড় শুধোল।

বাঃ! ও তো বিরাট ব্যাবসাদার। মস্ত কারখানা আছে।

তাই? ঝড় বলল।

তারপর বলল, বাঃ। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। রন্টু বড়ো ভালো ছেলে চিরদিনই। হাসিখুশি। সরল কিন্তু বুদ্ধিমান।

নিভাদি উঠে পড়লেন। ঝড় মুগ্ধচোখে চেয়ে রইল। এখনও সোজা হয়ে দাঁড়ালে কচি শিমুলের মতো দেখায় নিভাদিকে। ঋজু, তরুণ, শ্যামলী। বয়সের দাগ পড়েনি একটুও।

তারপর ঝড়ের পিঠে একটা ছোট্ট আদরের চড় মেরে বললেন, চলি রে ঝড়। খুব ভালো লাগল তোর সঙ্গে এতদিন পরে দেখা হয়ে... আমাদের সময়ের ....

ননী বলল, তুমি আবার দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? ও পিসি। ওরা সবাই যে বসে আছে গাড়িতে। গরমে ঘেমে নেয়ে গেল।

যাই রে, যাই। চলি রে ঝড়। ভালো থাকিস। তোর ছেলেমেয়ে কী? বউ-এর নাম কী?

গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে জিজ্ঞেস করলেন নিভাদি।

নেই।

একজনও না?

মানে একাধিক ছেলেমেয়ের কথা বলছ? না বউ-এর?

কী ইয়ার্কি করছিস! সত্যি করে বল।

সত্যিই নেই।

সে কীরে!

আমি বিয়েই করিনি।

সত্যি?

বলেই, খুব লম্বা নিভাদি সামনে একটু ঝুঁকে হাতটা হাসিমুখে বাড়িয়ে দিলেন ঝড়ের দিকে।

বললেন, কনগ্র্যাচুলেশনস। পৃথিবীতে এখনও কিছু বুদ্ধিমান মানুষ আছে। অন্যরকম। ভেবেই ভালো লাগে।

ঝড় বলল, অন্যরকম আর কী। মানুষ তো মাত্র দুরকম। জীবিত আর বিবাহিত।

হাঃ হাঃ হাঃ করে হাসতে হাসতে জরদার গন্ধ ছড়িয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন নিভাদি।

॥ ২ ॥

খাওয়াদাওয়ার পরে একা একা গাড়ি চালিয়ে ফিরে আসছিল ঝড়, ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস দিয়ে।

নিভাদির কথাটা কানে লেগেছিল ঝড়-এর। "আমাদের সময়ে ..."

বাক্যটা আর শেষ করার সময় হল না ওঁর।

এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল একটু আগেই। ঠান্ডা হাওয়া বইছে এখন।

বিভাদির কথা মনে পড়ল ঝড়-এর। নামেই দিদি! ঝড়ের চেয়ে হয়তো বড়োজোর এক বছরের বড়ো ছিল। ঝড় স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়ে গেছিল গৌরীপুরে। আর বিভাদি তখন ধুবড়ির কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। গরমের ছুটিতে সেও গৌরীপুরে এসেছিল। একদিন বরবাধার জঙ্গলে গেছিল ওরা সকলে মিলে, গৌরীপুর থেকে, পিকনিক করতে। মুনসের মিয়াঁর বেডফোর্ড ট্রাকে চড়ে, ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে।

ওরা তখন সবে যৌবনে পা দিয়েছে। সেইসব দিনে একটু ছোঁয়া, আচম্বিতে হাতের সঙ্গে হাত লেগে যাওয়া, তাই ছিল আকাশকুসুম ভাবনার পক্ষে যথেষ্ট। তাই ছিল ভালোলাগার পরাকাষ্ঠা। শরীর, মনের কোনো কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে হত না তখন। বন্যপ্রাণীর মতো শরীর এবং মনের সব ক্ষতেরই স্বাভাবিক নিরাময়ের এক অদৃশ্য ক্ষমতা ছিল। যে কোনো কথাতেই হাসির বান বয়ে যেত।

গুমা রেঞ্জ-এর 'বরবাধা' বন-বাংলো। ব্লকের নাম মনে নেই এতদিন পরে আজ। সম্ভবত, বরবাধাই। কেয়াবন। কনকচাঁপার গাছ। আঃ। গন্ধটা যেন নাকে এখনও মাঝে মাঝেই পায় ঝড়। কনকচাঁপা আর কেয়া-বনের গন্ধ, সদ্য বৃষ্টি শেষের সেই বর্ষার দুপুরে; এবং বিভাদিরও।

একদিন আলোকঝারিতেও গেছিল। কুমারগঞ্জের কাছে। রাজমাটি আলোকঝারি পর্বতজুয়ার, পাহাড়ে পাহাড়ে। গোরুর গাড়ি করে। চার পাঁচটা গোরুর গাড়িতে। বোশেখ মাসে। সাতবোশেখির মেলা দেখতে। পাহাড়ের উপরে মেচ সরদারের বাড়িতে থেমেছিল। মেচরা বোড়ো-রাভাদের মতোই এক উপজাতি। কাঁঠাল গাছের পাতা ঝরছিল; হলুদ, খয়েরি, লাল, পাটকিলে, কালো, খয়েরি। মেচ-সরদারের যুবতি মেয়ে তাঁতে দোহর বুনছে বাড়িতে, রাঙানো বহুবর্ণ সুতো, জড়িয়ে, গোবর-লেপা ঝকঝকে উঠোনে বসে, কাঁঠাল গাছতলায় ঢল নামা বাদামি চুল মেলে, চুলে কাঁঠাল কাঠের হলুদ কাঁকই গুঁজে। তার কালো কুকুরটি তার পাশে বসে আছে। ঘুঘু ডাকছে বাঁশবনে। প্রজাপতি আর কাঁচপোকা উড়ছে। রুখু পাহাড়তলির বুকে এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া শুকনো বৈশাখী ঘুমন্ত নদীর বুকে একা জেগে থাকা, শুকনো কালো গাছের ডালে, ঝুলের মতো লাল হলুদ রঙা মোরগা-মুরগি ফুটে আছে।

সেই বৈশাখেই ঝরনাতলির স্নিগ্ধ নির্জনে ল্যানটানার তিক্তকটু গন্ধ-ভরা অসভ্য অবকাশে বিভা, বিভাদি ঝড়কে একটা চকিত কিন্তু তীব্র কামগন্ধী চুমু খেয়েই অস্ফুটে বলেছিল ঝড়! তুই আমার জীবনে আসবি? ঝড় হয়ে?

ঝড়ের মনে হয়েছিল, হঠাৎই খুব জ্বর এসেছে বিভাদির।

তখন বোঝেনি, আজ এতদিন পরে পিছন ফিরে বোঝে; সে জ্বর, কামজ্বর।

বলেই, বিভা পরক্ষণে বলেছিল, ধ্যুত! তুই বড়ো শান্তশিষ্ট, লেজবিশিষ্ট। আমি কোনো সত্যি ঝড়ের সঙ্গে ঘর করব। তার হাত ধরে এমনি কোনো বৈশাখী দিনে উড়ে যাব দুধারে শুকনো পাতার ঝরনা বইয়ে দিয়ে, এই লাল-হলুদ-পাটকিলে খয়েরি-কালো বনে। তুই একটা ক্যালকেশিয়ান। পুতুপুতু। ভিতু-ভিতু।

বিদ্যুৎ চমকাল একবার কালো চওড়া পিচ-ঢালা ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস-এর উপরে। আবার হাওয়া উঠল। জোরে।

ঝড় আসছে আবার। পথটা ভেজা। খুব জোরে গাড়ি চালাতে পারছে না ঝড়। কখনোই চালায় না। 'ঝড়' নামটা ওকে একেবারেই মানায় না। বরং ঝঞ্ঝা নামটা মানাত ঝঞ্ঝাকে।

ঝড় এখনও 'পুতুপুতু-ভিতু-ভিতু'-ই রয়ে গেছে। ক্যালকেশিয়ান।

কোথায় গেল বিভাদি কে জানে! ঝঞ্ঝারই মতো। মানুষ মরে কোথায় যায়? কোন ঝড়ের সঙ্গে মিতালি করল বিভা?

জীবনে সেই প্রথম চুমু ; চকিত হলেও। তার আগে মায়ের চুমু অবশ্যই ঝড় অনেকেই খেয়েছিল। মায়ের চুমু ছাড়া, ওর জীবনে সেই প্রথম অন্য কোনো মেয়ের চুমু।

রন্টুর গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে নিভাদি যেন কী বলতে গিয়ে বাধা পেয়েছিলেন ... আরও বলতে যাচ্ছিলেন, "আমাদের সময়ে ..."

ঝড় ভাবছিল, নিভাদির বাক্যটা শেষ না হলেও ঝড় জানে, বুঝেছে যে, তাদের সময়টা

এতদিনের ব্যবধানেও, আশ্চর্য! একটুও ময়লা-কুচলা হয়নি। একেবারে হুবহু সেরকমই রয়ে গেছে। ফ্রেমে বাঁধানো ল্যামিনেট করা ছবিরই মতো। ক্লিষ্ট সময়ের কোনো কীট, অবিশ্বাস, অস্থিরতার, অকৃতজ্ঞতার কোনো ধুলোর আঁচড়ই সেই ছবিটিকে নষ্ট করতে পারবে না।

আসামের গোয়ালপাড়া জেলার সেইসব শান্ত, স্নিগ্ধ, অকলুষিত, সাদাসিধে, বক্রতাহীন, উজ্জ্বল গ্রীষ্ম-বর্ষার দিনগুলির ছবি — মধ্যবিত্ত মানুষের সুস্থ, সুন্দর, লোভহীন সাধারণ জীবনের উষ্ণতার 'ওম'-এ এখনও বুক ভরে আছে ঝড়-এর। চোখ ভরে আছে সেই দিনের অকলুষিত নিসর্গে। ওদের সময়ের সেইসব শব্দ, গন্ধ, দৃশ্য ও উষ্ণতাতে।

চল্লিশটি বছর পরে চমকে জেগে উঠে হঠাৎই অবিষ্কার করল ঝড়, সে রয়ে গেছে উষ্ণতাতে প্রাত্যহিকতার মালিন্য থেকে কী দারুণ এক দৈবীকৃপায় বেঁচে গিয়ে রয়ে গেছে, নিভাদির ভাষায় বলা; 'আজও রয়ে গেছে; আমাদের সময়'।

ওদের সময়।

কী আশ্চর্য!

তা

প্রথম দিন অফিস থেকে ফিরে প্রমীলাকে দেখেই চমকে উঠেছিলাম।

চমকে উঠেছিলাম, কারণ ওরকম কুৎসিত দর্শন মহিলা আমি এর আগে দেখিনি। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে, কুচকুচে কালো রং, উঁচু কপাল, ট্যারা চোখ — এবং অত্যন্ত লম্বা। সব মিলিয়ে প্রথম দেখাটা মনে রাখার মতো।

টাই খুলতে খুলতে রিনিকে বললাম, এ কে?

রিনি গলা নামিয়ে বলল, মুন্নির নতুন আয়া।

বললাম, কোথা থেকে জোটালে? অন্ধকারে দেখলে মুন্নি তো দূরের কথা মুন্নির বাবাও কেঁদে উঠবে।

রিনি হাসল, বলল, তুমি ভীষণ অসভ্য। কারও চেহারা নিয়ে ওরকম করে বলতে হয়?

আমি বললাম, সকলেই অপর্ণা সেনের মতো মিষ্টি দেখতে হয় না, তা বলে এতখানি খারাপ হওয়াটাও বাড়াবাড়ি।

রিনি বলল, বাড়ির বাবুদের ছুকছুকে বাতিক থাকলে দেখে দেখে এরকম আয়াই রাখা উচিত।

আমি কপট রাগের সুরে বললাম, অ্যাই! কী হচ্ছে!

রিনি তারপর সিরিয়াসলি বলল, অনেক কষ্ট করে জোগাড় করতে হয়েছে ওকে। চেহারা খারাপ হলে কী হবে, এফিশিয়েন্ট। বেচারার কোনো ছেলেপুলে নেই, তার উপর বালবিধবা।

আমি বললাম, আহা!

॥ ২ ॥

সেটা প্রথম দিনের কথা।

তারপর দেখতে দেখতে অনেক দিন কেটে গেছে, অনেক মাসও। প্রমীলার চেহারাটা আমার চোখে সয়ে গেছে দেখতে দেখতে। চেহারা ছাপিয়ে যা চোখে পড়ছে তা ওর দরদ। মনে হয়েছে মুন্নি যেন রিনির মেয়ে নয়, প্রমীলার নিজেরই মেয়ে।

রিনিকে ওর অফিসের কাজে প্রায়ই বাইরে বাইরে যেতে হয়। আজ দিল্লি, কাল বোম্বে, আমাকেও তাই। সে কারণে একজন ভালো আরো অন্যদের বিলাসিতা ছিল না : ছিল নিতান্তই প্রয়োজন।

মনে আছে, একবার রিনি দিল্লি ছিল বেশ কয়েকদিনের জন্য। আমি কলকাতাতেই ছিলাম। সেই কদিন আমার চোখের সামনে প্রমীলা যে ভাবে মুন্নিকে বুকে করে রইল তা বলার নয়।

মুন্নিটা যত বড়ো হচ্ছে, ততই দুষ্টু হচ্ছে। আধো-আধো কথা বলতে শিখেছে। সবসময় দুটি ফেস-টাওয়েল মুখের কাছে ধরে রাখা চাই, আর তা দিয়ে অনবরত নাক ঘষা চাই। টেডি-বিয়ার, জাপানি পুতুল ফ্লুরির চকোলেট, কিছু দিয়েই তাকে রাখা যায় না, যদি না 'তা' তার সঙ্গে থাকে।

প্রমীলার নতুন নামকরণ হয়েছে আমাদের বাড়িতে। নামকরণ করেছে মুন্নিই। প্রমীলার সেই নতুন নাম — তা।

প্রমীলাকে খেতে পর্যন্ত দিত না মুন্নি। দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর যখনই মুন্নি একটু চোখ বুঁজত তখন ও বেচারি কোনো রকমে চান সেরে, বেডরুমের মেঝেতে বসেই কোনোরকমে খেয়ে নিত। আমি অন্য ঘরেই থাকতাম, তাই প্রাইভেসির বিঘ্ন হত না।

যেখানেই যাক, যাইই করুক, তার সঙ্গ ছাড়া মুন্নির একমুহূর্ত চলত না। মাঝে মাঝে রাতে ঘুমের মধ্যে মুন্নি কেঁদে উঠত। আমি আমার ঘর থেকে দৌড়ে আসতাম। বেডরুমের মধ্যে খাটের পাশে টেবল-ল্যাম্পটা। দেখতাম মশারির মধ্যে মুন্নিকে বুকে করে প্রমীলা বসে থাকত। আর ওর কান্না থামাবার চেষ্টা করত। মুন্নিকে বুকে করে ওর বসে থাকার ভঙ্গির মধ্যে এমন একটা মা-সুলভ মমতা থাকত যে মাঝে মাঝে আমার মনে সন্দেহ জাগত; মুন্নি সম্বন্ধে মমতা কার বেশি? রিনির না প্রমীলার? এই সন্তানহীনা মহিলার মুখে চোখে টেবল লাইটের আলোয় যে ভাব দেখতে পেতাম তা রিনির মুখেও কোনোদিন দেখিনি।

আজকালকার মডার্ন মায়েরা নির্দয় হওয়াটাকেই আধুনিকতার লক্ষণ বলে মনে করেন। ভাবাবেগ, সে প্রেমিক বা স্বামীর সম্পর্কেই হোক কী সন্তানের সম্পর্কেই হোক, প্রকাশ করার মধ্যে যে ইনটেলেকচুয়ালিজম্ নেই তা এঁদের মতো আর কেউ এমন জানেননি।

আমি জানি না কেন, ইদানীং রিনি প্রায়ই বলত, প্রমীলা বড়ো আদর দিচ্ছে মুন্নিকে। মেয়েটাকে স্পয়েল করে ফেলল। মেয়েটাকে সামলাতে পারে ও ভালো কিন্তু— শুধু ভালোবাসলেই তো হয় না, তাহলে তো সকলেই আয়া হতে পারত ভালো।

আমি পুরুষ মানুষের স্থূল বুদ্ধিতে বুঝতে পারতাম না, ভালোবাসার চেয়েও বড়ো কোয়ালিফিকেশন আয়ার মধ্যে আর কী থাকতে পারে? যাই হোক, আমার বুদ্ধি স্থূলই হোক কী সূক্ষ্মই হোক বাড়ির মধ্যে, বাড়ির ব্যাপারে আমার বুদ্ধি ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। সেখানে আমি নিতান্তই নন-এন্‌টিটি। তাই বাদানুবাদের মধ্যে না গিয়ে আমি অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতাম। কিন্তু আমার মন কেবলই বলত, এই সন্তানহীনা মহিলার প্রতি রিনি ভালো ব্যবহার করছে না। কারণ, কেন জানিনা, আমার মনে হত প্রমীলাকে আর যে গঞ্জনাই দেওয়া হোক সে তা সইতে পারে, মুন্নির অযত্ন হল, মুন্নিকে ঠিকমতো দেখাশোনা হচ্ছে না; এ অপবাদ তার পক্ষে অসহ্য ছিল।

কিছুদিন বাদে রিনি কয়েকদিনের জন্যে জামদেশপুরে গেল। জামদেশপুর যাওয়ার আগেই মুন্নির জ্বর এসেছিল। জ্বর প্রায় তিন পর্যন্ত উঠেছিল কিন্তু ওষুধ পড়াতে জ্বর আবার কমে যায়। ডাক্তারের অভয়বাণী পেয়ে মুন্নিকে রেখেই রিনি জামদেশপুরে চলে গেল। ওর নাকি না গেলেই নয়।

আমার মন ভালো লাগছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল, কিছু একটা গোলমাল হবে।

রিনি যেদিন বিকেলের ট্রেনে গেল সেদিনই রাতে মেয়ের ধুম জ্বর এল। মুখ চোখের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি ডাক্তারবাবুকে খবর দিলাম, তিনি এসে ওষুধপত্র দিয়ে গেলেন। কিন্তু সারা রাত মুন্নি যন্ত্রণায় চিৎকার করল। সে রাতে আমার ঘর থেকে কম করে পাঁচবার আমি উঠে এলাম। কিন্তু আমার মতো অপদার্থ বাবারা শুধু টাকা রোজগার করতে জানে, ছেলেমেয়েদের, বুকের সব ভালোবাসা উজাড় করে ভালোবাসতে জানে, কিন্তু তাদের শারীরিক কষ্ট লাঘব করার কোনো উপায়ই জানে না তারা।

মুন্নির বয়স এখন দু'বছরও হয়নি। আধো আধো কথা বলে, কিন্তু কোথায় ব্যথা, কীসের কষ্ট তা বুঝিয়ে বলতে পারে না। যন্ত্রণায় চোখ দিয়ে জল পড়ে, কিন্তু জানাতে পারে না, কী করলে সে কষ্টের উপশম হয়। বাবা হওয়ার আনন্দ অনেক কিন্তু অবলা শিশু সন্তানের যন্ত্রণা চোখের সামনে নিরুপায় দাঁড়িয়ে দেখাটা বড়োই কষ্টের।

যতবারই আমি দৌড়ে ও ঘরে গেছি ততবারই দেখেছি যে, প্রমীলা মুন্নিকে বুকে করে ওর কষ্ট উপশমের জন্যে নানারকম প্রক্রিয়া করছে। আমি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই মুন্নির কান্না বা গোঙানি থেমে গেছে। আরামে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে মুন্নি তার কোলে।

ও থামতেই প্রমীলা বলেছে, দাদাবাবু আপনি গিয়ে ঘুমোন, আমি তো আছি। আপনি কেন কষ্ট করছেন?

পাশের ঘরে আমি শুতে যেতে যেতে ভেবেছি, আমি তো ওর বাবা। ওর জন্য কিছু

কষ্ট তো আমার করা উচিতই কিন্তু তুমি তো পঞ্চাশ টাকার আয়া — তুমি কী জন্যে ওকে বুকে নিয়ে এত কষ্ট করছ? কেবলি ভেবেছি, আর মনে হয়েছে, প্রমীলা যা করে, যা করেছে এতদিন, তা শুধু ওর কর্তব্য নয়, শুধু টাকার বিনিময়ে করা নয়। ভগবান কখনও ওর কোলে যা দেননি, তা ওর নিজের না হলেও, ক্ষণেকের জন্য, কিছুদিনের জন্যে ওর কোলে পেয়ে ও যেন ধন্য হয়ে গেছে। আমার মনে হয়েছে এই সন্তানহীনা রমণীর কোল থেকে সাক্ষাৎ যমদূত এলেও আমার মুন্নিকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। সত্যি কথা বলতে কি, এ কথা ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি ঘুমোতে গেছি।

পরদিন ভোরেই মুন্নির সমস্ত শরীর ভরে হাম দেখা গেল। মেয়ে একেবারে বেহুঁশ হয়ে রইল। চোখ-মুখ লাল। চোখের পাতা, মুখের ভিতরে হাম একেবারে ছেয়ে ফেলেছে। সকালে মুন্নির মুখের দিকে চেয়ে আমি খুব ভয় পেলাম। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন ভয়ের কিছু নেই। হাম বেরোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তবুও ভয় পেলাম।

তারপর প্রমীলার মুখের দিকে চাইতেই দেখি আমার মেয়ের ক্লিষ্ট মুখের ছায়া তার মুখে। প্রমীলা মুন্নির চেয়ে বেশি বই কম কষ্ট পাচ্ছে না।

ডাক্তার আবার এলেন। হাম ভালো করে উঠে যাবার ওষুধ দিয়ে গেলেন।

মন খারাপ করে আমি অফিস গেলাম। অফিস থেকে বার তিনেক ফোন করে খবর নিলাম। শুনলাম, হাম উঠেছে। প্রমীলাই ফোন ধরল, কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, মুন্নি বড়ো কষ্ট পাচ্ছে দাদাবাবু।

অফিস থেকে ফিরে আমি মুন্নির অবস্থা দেখে ওর কাছে আর দাঁড়াতে পারলাম না। পাশের ঘরে এসে ডাক্তারবাবুকে ফোন করলাম। তিনি বললেন, কোনো চিন্তা করবেন না,যেমন যেমন বলেছি, ওষুধ খাইয়ে যান। এরকম হয়। অসুখ মানেই তো সুখের অভাব।

আমি একটা গল্পের বই নিয়ে তাতে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগলাম।

সে রাতেও সারারাত প্রমীলা ঘুমোল না। সারারাত প্রায় ঠায় বসে কাটাল। পরদিন ও পরের রাতেও ওরকম করেই কাটল।

তার পরদিন ভোরবেলা বহুদিন পরে মুন্নির কথা শুনলাম। মুন্নি তার মা-র নাম ধরে ডাকল না, তার বাবার নাম ধরে ডাকল না। ঘোরের পর জ্ঞান এলে, মুন্নি প্রথম কথা বলল তা।

তারপর বারবার ডাকল তা, তা, তা, তা।

আমি দৌড় বেডরুমে গেলাম।

প্রমীলা মাথার দিকে জানালার পর্দা সরিয়ে দিয়েছিল। কাচের শার্সি বন্ধ ছিল, কারণ, ঠান্ডা লাগানো বারণ। সেই ভোরের আলোয় দেখলাম প্রমীলা মুন্নিকে বুকে নিয়ে বসে আছে, আর তার দু' চোখ বেয়ে জলের ধারা বইছে আনন্দের। আর মুন্নি তার ছোটো ছোটো হাত দুটিতে প্রমীলার কুশ্রী মুখটি ধরে সমানে ডেকে চলেছে, তা তা, তা।

এই দৃশ্য দেখে আমার বুকের মধ্যে কোথায় না জানি কী হয়ে গেল। কোন তারের সঙ্গে কোন অদৃশ্য তারের যোগাযোগ ঘটে গেল। প্রমীলার কাছে নিজেকে বড়ো ছোটো লাগল। মনে হল, কই? মুন্নির ডাকে আমার চোখে তো এমন করে জল এল না? না কি আমি পুরুষ মানুষ বলে? না কি আমি দু পাতা ইংরিজি পড়েছি বলে?

সেদিন সকালের পরই দেখতে দেখতে মুন্নি ভালো হয়ে উঠতে লাগল।

আমি অফিসে গিয়েই কাজে বেরিয়েছিলাম সেদিন। ফিরে জানলাম যে, রিনি কলকাতা ফিরে ফোন করেছিল আমায়। অফিসে ফিরতে ফিরতেই বেলা হয়েছিল বলে এবং তাড়াতাড়িই ফিরব বলে আমি আর রিং-ব্যাক করলাম না।

অফিস থেকে ফেরার পথে গাড়িটা ট্রাফিক লাইটে দাঁড়িয়েছিল। আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলাম। মনটা খুব খুশি ছিল আমার। মুন্নিটা ভালো হয়ে উঠেছে, রিনি ফিরে এসেছে। এ কথা ভেবেও ভালো লাগছিল যে প্রমীলা আজ তিন রাত পরে ঘুমোতে পারবে। বেচারি গত তিনদিন দিনরাত একটুও ঘুমোয়নি। অন্য প্রাণীও কেউ ছিল না যে, ওকে একটু রিলিভ করে।

বেল টিপতে ঠাকুর দরজা খুলল। বসবার ঘরে ঢুকতেই মুন্নির গলা শুনতে পেলাম বেডরুম থেকে। মুন্নি ডাকছে তা তা, ও তা। আধো-আধো গলায় করুণ স্বরে ডাকছে মুন্নি। তা, তা, তা।

এমন সময় রিনির গলা শুনলাম, রাগ-রাগ গলা। রিনি বলল, খুব বকব। চুপ করো, চুপ করো বলছি। তা তা করবে না, খুব বকব।

দেখলাম ঠাকুরের মুখটা ফ্যাকাশে।

ওকে শুধালাম, কী হয়েছে রে?

ঠাকুর বলল, প্রমীলাকে বউদি তাড়িয়ে দিয়েছে।

সে কী! অবাক হয়ে বললাম আমি।

তাড়াতাড়ি বেডরুমে ঢুকলাম আমি।

রিনি খাটে বসেছিল, মুন্নিকে পাশে শুইয়ে।

আমাকে ঢুকতে দেখেই বলল, তোমার পেয়ারের আয়াকে একটু আগে তাড়ালাম।

আমার খুব রাগ হয়ে গেল। বললাম, কারণটা কী?

রিনি বলল, কারণ নিশ্চয়ই একটা ছিল। এটা আমার ব্যাপার। ঘর গেরস্থালির ব্যাপার। সব তাতে তোমাকে কৈফিয়ত দিতে পারব না।

তারপর একটু পরে নিজেই বলল, আমার মুখে মুখে কথা বলেছিল, অনেকদিন থেকেই বলেছি, তার উপর মুন্নিটার স্বভাব একেবারে নষ্ট করতে বসেছিল।

আমি বললাম, প্রমীলা তিন রাত তিন দিন এক ফোঁটা বিশ্রাম পায়নি, ঘুমোয়নি একটুও। কাজটা কি তুমি ভালো করলে? ওকে কি ফিরিয়ে আনা যায় না?

রিনি চড়া গলায় বলল, ওকে ফিরিয়ে আনলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

আমি কোনো কথা বললাম না। নিজের ঘরে চলে গেলাম।

সে রাতে আমি খাইনি। রিনির সঙ্গে তিন দিন কথা বলিনি, কিন্তু তাতে কারও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি।

॥ ৩ ॥

প্রমীলার জায়গায় নতুন আয়া এসেছে নেপালি। তার নাম কাঞ্চি। বয়সে প্রমীলার চেয়ে ছোটো— দেখতেও প্রমীলার চেয়ে ভালো।

মুন্নির সব কাজ এখন সেই করে। সকাল বিকেল বেড়াতে নিয়ে যায়। 'নিনি-বাবা-নিনি, মাখন-রোটি-চিনি' বলে মুন্নিকে ঘুমও পাড়ায়। মুন্নি প্রথম কদিন মাঝে মাঝে তা, তা, করে ডেকে উঠত। ইদানীং একবারও ডাকে না।

মাঝে মাঝে ভাবি মেয়েটাও কি তার মায়ের মতোই অকৃতজ্ঞ?

কাজকর্মের অবকাশে মাঝে মাঝেই প্রমীলার কথা মনে পড়ে। খুব ইচ্ছা করে, যদি পথে-ঘাটে কোথাও দেখা হয়ে যায় ওর সঙ্গে তা হলে ওর হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে নেব, ওর জন্যে যদি কিছু করতে পারি তা করব। প্রমীলা কোথায় গেছে তা আমি জানি না। কেউই জানে না। তার পুরো ঠিকানাও আমাদের কাছে নেই।

জানি না, রিনি হয়তো তার মেয়ের ভালোর জন্যেই প্রমীলাকে তাড়িয়েছিল। হয়তো তার হিসাবই ঠিক।

কিন্তু এও জানি না, জগতে এবং জীবনে যা কিছু ঘটে সবকিছুই হিসেবের ভিতরে পড়ে কি না। প্রমীলার মমতা, প্রমীলার চোখের জলও তো হিসেবের বাইরেই ছিল।

আমার ভারী ভয় করে। প্রমীলার চোখের জলে মুন্নির কোনো অভিশাপ লাগবে না তো। পরক্ষণেই মনে হয় মুন্নির 'তা' কি কখনও তার মুন্নির কোনো ক্ষতি করতে পারে?

অনেকদিন হয়ে গেছে প্রমীলাকে তাড়ানোর দিন থেকে কিন্তু আজও তার কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়নি। সে সুযোগ আসেনি আমার।

প্রমীলা কি কলকাতাতেই আছে? নাকি চলে গেছে ডায়মন্ডহারবার লাইনে তার গরিব ভাইয়ের আশ্রয়ে?

নাকি আবার ভুল করে কোনো নতুন মুন্নিকে বুকে করে তার বুকের উত্তাপে তার "তা", কি "থা", কি "দাদ" হয়েছে সে?

মা তো সে কখনোই হতে পারবে না।

জানি না কিছুই। শুধু এটুকুই জানি যে, এই মুহূর্তে এই নির্দয় হৃদয়হীন শহরের অনেক ঘরেই আমার মুন্নির মতো মুন্নিদের বুকে আঁকড়ে অনেক প্রমীলারা বসে আছে। তিরিশ, চল্লিশ কী পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে হিসাব বহির্ভূত যা কিছু তারা দিয়েছে প্রতিমুহূর্তেই দিচ্ছে; তারা তা কখনও ফেরত পাবে না মুন্নিদের অকৃতজ্ঞ মা-বাবাদের কাছ থেকে।

বাড়িওয়ালা

খোকন দুম করে দরজাটা বন্ধ করে খেলতে চলে গেল।

সারা বাড়িটা কেঁপে উঠল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দোতলার বারান্দা থেকে সতীশবাবু খ্যাঁক খ্যাঁক করে স্বগতোক্তি করলেন।

প্রথম প্রথম রিনা ও আমার অসহ্য লাগত। কখনও কখনও এ নিয়ে দু চারবার প্রচণ্ড মনোমালিন্যও হয়েছে। কিন্তু সতীশবাবু বদলাননি।

আমাদের বাড়িওলা সতীশবাবু। পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ছিলেন। রিটায়ার করেছেন তাও বছর দশেক হল। তাঁর বাড়ির পুরো একতলা নিয়ে থাকি আমরা। গত এক যুগ ধরেই আছি। ভাড়া তখন অত্যন্ত কমই ছিল। যদিও টাকার দাম ছিল বেশি। কিন্তু তবুও উনি অনেকবার বলা সত্ত্বেও আমরা ভাড়া এক পয়সাও বাড়াইনি। কোন ভাড়াটে বাড়ায়? একবার ঢুকে পড়তে পারলে ভাড়া বাড়ানোর কথা এবং বাড়ি ছাড়ার কথা মনে আনতেও ইচ্ছে করে না। ভাড়াটেদের স্বর্গরাজ্য কলকাতা।

আসলে অন্যদের কথা জানি না। আমার রোজগার যে একবছরে বাড়েনি তা নয়, কিন্তু যে হারে বেড়েছে সেই অনুপাতে প্রয়োজনও বেড়ে গেছে। টাকার দামও পড়ে গেছে হু-হু করে। খোকনও বড়ো হয়েছে, কুসমিও এসেছে ইতিমধ্যে। ওদের লেখাপড়ার খরচ, বড়ো করে তোলার খরচ, সঞ্চয় না করলে একান্তই নয়, এসব সত্ত্বেও ভাড়া বাড়ানোর কথা ভাবিনি যে, তা নয়। ওঁরই বা কী করে চলবে? প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দিয়ে বাড়ি করেছিলেন। সে টাকাটা থাকলে, ব্যাংকে সুদ পেতেন। তাঁর এক ছেলে এক মেয়ে। মেয়ে বড়ো। বিয়ে দিয়েছেন ভালো একটি ছেলের সঙ্গে। জামাই মেয়ে থাকে বম্বেতে। কখনও কখনও আসে। তাদের অবস্থা ভালো হলেও, সতীশবাবু ও গিরিজা মাসিমাকে দেখে মনে হয় না, মেয়ে জামাই ওঁদের জন্যে খুব একটা ভাবে বা করে বলে। আর ওদের ছেলে তো থেকেও নেই। বড়ো বড়ো চুল রেখে ঘুরে বেড়ায়, লিটল-

ম্যাগাজিন বের করে, সাংগুভ্যালির চায়ের দোকান কী কফিহাউসে আড্ডা মারে, বড়ো কবির চামচেগিরি করে, রাজা-উজির বধ করে।

ছাত্র সাধারণ ছিল। কোনোক্রমে বি. এ-টা পাশ করেছিল। টাই পরে, হাতে ব্রিফকেস নিয়ে ফেরিওয়ালার চাকরি করাই তার জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। হয়নি বলে, সাহিত্যের কল্যাণে লেগেছে। সে মা-বাবাকে সাহায্য করা দূরের কথা, উলটে সতীশবাবু আর গিরিজা মাসিমাকেই তার সিগারেট, সিনেমা ও সাহিত্যানুরাগের খরচ জোগাতে হয়।

আমি একদিন বলেছিলাম ওকে যে, নীচে গ্যারাজটা খালি পড়ে আছে, ওখানে একটা স্টেশনারি দোকান দাও না। কী, যে কোনো দোকান?

তাতে ও ভীষণ রেগে গেছিল। বাঙালি আত্মাভিমানে খুব লেগেছিল ওর। যে অভিমানে এই জাত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দিনে দিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

অথচ ওরই এক বন্ধু ওই গ্যারাজ ভাড়া নিয়ে ডিম, আলু, পেঁয়াজের দোকান করল। তারপর ব্যাংক থেকে ধার নিয়ে ডিপ ফ্রিজ কিনে তাতে মুরগি, হ্যাম, বেকন রাখতে লাগল। এখন কিছু না কিছু মাসে দু হাজার টাকা রোজগার করে ছেলেটা।

যাকগে, কী কথায় কী কথা এসে গেল! হচ্ছিল বাড়িভাড়া বাড়ানোর কথা। আগে আমরা ভাড়া বাড়ানোর কথা বহুবার ভেবেছি কিন্তু গত বারো বছরে যে ভাবে খরচের বহর বেড়েছে এবং টাকার দাম কমেছে তাতে এখন একেবারেই হিমসিম খাচ্ছি। আমি জানি যে বৃদ্ধ রিটায়ার্ড সতীশবাবুর অবস্থাও আমারই মতো। কিন্তু ওঁর প্রতি নীরব সহানুভূতি জানানো ছাড়া আমার আর কিছুই করণীয় নেই।

মনে পড়ে, প্রথম প্রথম সম্পর্কটা কত ভালো ছিল। রিনা মাংস রান্না করে পাঠাত ওঁদের। গিরিজা মাসিমা খোকার জন্মদিনে পায়েস রেঁধে পাঠাতেন। কুসমি হবে, মানে রিণা কনসিভ করেছে এ খবরটা পাওয়া মাত্র গিরিজা মাসিমা আচার করে এটা-ওটা রেঁধে রিনাকে পাঠাতেন। সেই সময়ের সচ্ছল, সুন্দরী গিরিজা মাসিমার মুখটা মনে পড়ে।

জানি না, তখন হয়তো আমার মুখটাও সুন্দর ছিল, এত রুক্ষ হয়ে ওঠেনি নিজের অজানিতেই।

ছেলে মেয়ে যদি ভালো না হয়, যদি বাবা-মাকে না দেখে, তা হলে আমাদের এ জন্মের মা-বাবাদের ষড়ো কষ্ট। ভবিষ্যতে হয়তো বাবা-মায়েরাও আলগা হয়ে যাবে প্রথম থেকে, তারাও তাদের ছেলে-মেয়েরা ছাড়াও যে ভবিষ্যৎ বলে পৃথক কিছু তাঁদের থাকার কথা, সে কথা তাঁরা প্রত্যেকে ভাববেন যৌবনেই। তখন আর এত দুঃখ হবে না, এত কষ্ট পাবেন না বৃদ্ধ মা-বাবারা, ছেলে মেয়েরা না দেখলে তাদের তারা যোগ্য না হলে।

কিন্তু রিনা তাই বলে।

বলে আমরা পারলাম না। ওদের বড়ো করে তোলার পর নিজেদের ভবিষ্যত বলে আলাদা কিছু আর আমাদের থাকবে না; রইল না। ওরা ফেলে দিলে দাঁড়াবার জায়গা হবে না কোথাও।

সতীশবাবু চ্যাঁচামেচি করতেন, দরজা-জানলা দুমদাম করে বন্ধ করা নিয়ে। আমাদের

বাড়িওয়ালা ভাড়াটের সম্পর্কর মাধুর্যর সুগারকোটিংটা উঠে যেতেই নানারকম বিপত্তি দেখা দিতে লাগল। দরজা জানালা জোরে বন্ধ করলেই অথবা ঝড়ে বা জোর বাতাসে দমাদ্দম করে আছড়ে পড়লেই পূর্ববঙ্গের মানুষ সতীশবাবু বলতেন, "বুঝবা, বুঝবা; নিজেরা যদি কখনও বাড়ি বানাও ত বুঝবা। বুকে কেমন লাগে তহন।"

আমরা বাড়ি বানাইওনি, বানাবার সম্ভাবনাও নেই, অতএব আমাদের পক্ষে সতীশবাবুর এই উক্তির সত্যাসত্য যাচাই করা সম্ভব হল না এ জীবনে। উনিও যে আর একজন খিটখিটে বদমেজাজি, অসহযোগী, অসহিষ্ণু রিটায়ার্ড ভদ্রলোক এ কথাই আমরা মেনে নিয়েছিলাম।

রিনা চান সেরে, কাপড়চোপড় পরে বসবার ঘরে এল। আমাকে তাড়া দিয়ে বলল, কী করছ তুমি? তাড়াতাড়ি করো। গগনদাদাদের বাড়িতে যাবে না? আমার দাদা বাড়ি করেছে, তাই বুঝি গা নেই।

আমি বললাম, যাব, যাব।

কখন যাবে? সল্ট লেক কি কাছে না কি? যেতেই তো কতক্ষণ লেগে যাবে। তারপর কাল কুসমির অঙ্কের টেস্ট। আজ তো হবে না, কাল সেই ভোরে উঠে ওকে পড়াতে বসতে হবে। তাছাড়া একটু আগে গেলে বাড়িটা ফাঁকায় ফাঁকায় ঘুরে দেখতে পারব। নিজের বাড়ি তো এ জন্মে হবে না।

একটু চুপ করে থেকে রিনা বলল, যদি হত তাহলে একটা দারুণ বাথরুম আর একটা রানাঘর বানাতাম, জান।

আমি রিনার চোখের দিকে তাকালাম।

কেন জানি না, যা কখনও হবে না; পারব না বলে নিশ্চিত জানি; সেই একটি ছোট্ট বাড়ির, "নিজের বাড়ির" কথা ভেবে এবং রিনার মিষ্টি, লক্ষ্মী, হাসিভরা মুখের দিকে চেয়ে, আমার বুকের মধ্যেটা যেন কেমন করে উঠল।

হঠাৎ আমার মনে হল, স্বামীরা কত অসহায়, এবং আমি কত অসহায়। স্ত্রীকে, ছেলেমেয়েকে যা কিছুই আমরা দিতে পারি না তার সবকিছুর কষ্ট যে কী গভীর ভাবে আমাদের বুকে বাজে, তা যাদের তা না দিতে পারার কারণে কষ্ট, তারা নিজেরা কি কখনও বোঝে? নাকি, শুধু অনুযোগ আর অভিযোগই করে যায় সারাজীবন?

কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। খোকা যাবে না। কোনো কথাই শুনবে না আমাদের। এখনও ষোলো হয়নি। ওর এখন সময় নেই, সময় নষ্ট করবার।

কুসমিকে যথাসাধ্য সাজিয়েছে রিনা। আমার পাঁচ বছরের মেয়েকে আমি বড়ো সুন্দর দেখি। ওকে যখন বলি যে, পৃথিবীতে এমন সুন্দর মুখ আর দেখলাম না একটাও। তখন ও খুব খুশি হয়, হাসে।

বলে, বাবা, আবার বলো। কথাটা আবার বলো।

মোড় থেকে একটা মিনিবাস পেয়ে গেলাম।

রিনা কুসমিকে নিয়ে বসল। আমিও একটু সময় দাঁড়াবার পরই, পেয়ে গেলাম জায়গা।

গড়িয়াহাটের মোড়ে খুবই ভিড়। নববর্ষের হাওয়া লেগেছে তার আর বেশি দিন বাকি নেই। গাড়ির সারি, হাজার হাজার লোক পথে। এই তো কেনার সময়; দেওয়ার সময় মানুষকে। পাওয়ার সময় আসে, থাকে; দেওয়ার সময়ই বড়ো তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। কাউকে উৎসবের দিনে কিছু দিতে যে কী আনন্দ! আমার সামর্থ্য যে বড়ো কম। যদি তেমন সামর্থ্য থাকত তবে সেই আনন্দ পুরোপুরি পেতে পারতাম হয়তো। অথবা, কী জানি, সামর্থ্য থাকলে তখন হয়তো কাউকে আর কিছুই দিতে চাইত না মন। মনে হত সবই একা খাই, একা পরি; একা একা ভোগ করি।

গগনদাদা ডিরেকশান ভালোই দিয়েছিলেন। গড়িয়াহাটে একবার বাস পালটে সল্টলেকে যখন পৌঁছোলাম তখন আকাশ মেঘে কালো হয়ে এসেছে।

নাম্বার দেখে বাড়ি চিনতেও অসুবিধে হল না। বাড়ির সামনে তখনই চার পাঁচটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। চমৎকার বাড়ি। ছোটো, ছিমছাম ও সুরুচিসম্পন্ন।

রিনা নিশ্চয়ই স্বপ্নে ঠিক এ রকমই একটা বাড়ি দেখে, মাঝে মাঝেই। আমার বউ, রিনা।

ভাবতেই মনটা বড়ো খারাপ হয়ে গেল।

হঠাৎই প্রচণ্ড ঝড় উঠল। আমরা কুসমির হাত ধরে রিনার মামাতো দাদা গগন সেনের বাড়ির দিকে দৌড়োতে লাগলাম। যখন বাড়ির মধ্যে ঢুকছি, ঠিক তখনই হুড়ুম-দাড়ুম করে হাওয়ায় দরজা জানালাগুলো পড়ছিল। একসঙ্গে সব জানালা দরজা বন্ধ তো করা যায় না। অনেক মানুষের দরকার।

আমরা বসবার ঘরে গিয়ে বসেছি এমন সময় গগনদাদা হাঁপাতে হাঁপাতে দোতলা থেকে দৌড়ে নামলেন। দেখলাম, তার কাছার একটা দিক খুলে গেছে। নিজে হাতেই জানালার দরজার পাল্লা বন্ধ করতে করতে রুক্ষস্বরে বললেন, এই রিনা। ওই দিকের জানালাগুলো বন্ধ কর না। রিয়াল সি পি টিকের দরজা জানালা। এরা ধাঁই ধাঁই করে পড়লে মনে হয়, বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পড়ছে। এই বাড়ি বানাতে ফতুর হয়ে গেছি রে। বাড়িটার জানালা দরজাগুলোই আমার হাত-পা। বুকের পাঁজর।

রিনা জানালা বন্ধ করতে করতে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

আমি ওর দিকে তাকিয়েই মুখ নামিয়ে নিলাম।

আমাদের বাড়িওয়ালা বৃদ্ধ, অবসরপ্রাপ্ত, ভাড়ার টাকায় সংসার-চালানো সতীশবাবুর ক্লান্ত, চিন্তিত মুখটা মনে পড়ল আমার।

গগনদার বাড়ি থেকে গৃহ প্রবেশের খাওয়া দাওয়া সেরে ফেরবার সময়ে মিনিবাসের জানালার পাশে বসে রিনা বলল, বাড়িভাড়াটা কিন্তু আমাদের বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। যতখানি সম্ভব।

হুঁ।

আমি বললাম।

আত্মজা

আজ শনিবার। অফিস ছুটি।

লিখছিলাম।

এমন সময়ে ফোনটা বাজল।

তোমার ফোন, সনু।

সনু যথারীতি তার দিদির ঘরে ঘুটুর ঘুটুর করছিল। বি. এ. পরীক্ষা হয়ে গেছে অনেকদিন। এখন ফলের জন্যে শবরীর তপস্যার মতো তপস্যা করা ছাড়া অন্য কাজ কিছু নেই।

আমি আমার দুই মেয়ের, বা সাধারণভাবে বলতে গেলে, সংসারের জন্যে কিছুমাত্রই করি না বা করিনি কোনোদিনই। আমার মেয়েরা দুজনেই ন্যাশনাল স্কলার। সবদিক দিয়েই ভালো। এবং তাদের ভালো হওয়ার পেছনে সব কৃতিত্বই তাদের মায়েরই একার।

দোষের মধ্যে সনুটা বাংলা পড়ে না। বড়োই দুঃখ হয়, যখনই এ কথা মনে হয়।

আমার মেয়েরা আমার কাছ থেকে পাওয়ার মধ্যে শুধু একটি বদ-অভ্যাস পেয়েছে। সেটি এই যে, তারাও শিশুকাল থেকেই বইয়ের মধ্যেই বাস করতে ভালোবাসে।

অন্তর্মুখীনতা আজকাল আর কোনো শখ নয়। এটি একটি দুর্মূল্য বিলাস এবং অতি স্বপ্ন মানুষেরই মনের জোর বা জেদ আছে এই বিলাসে বিলাসী হওয়ার। আমার মেয়েরা যে অন্তর্মুখী হয়েছে তা দেখে বড়োই আহ্লাদিত হই। আজ রাতেই যদি ঘুমের মধ্যে মরে যাই তবুও একটুও দুঃখ থাকবে না আমার।

কী হল! সনু! তোমার ফোন।

আবার বললাম।

এই দুবার ওকে ডাকার মধ্যেই এত কথা মাথার মধ্যে দাপাদাপি করে গেল।

হুঁ। কে?

অনুরাধা।

কোন অনুরাধা?

অরিজিনাল। বোস। পন্ডিতিয়ার। কল্লোলদার মেয়ে।

আসছি।

ধরো অনুরাধা। আসছে সনু। তোমার বাবা কেমন আছেন?

ভালো।

মা?

ভালো।

আমাকে কবে ইলিশমাছের মাথা দিয়ে কচুর শাক আর ভাপা ইলিশ আর ইলিশমাছের টক খাওয়াবেন, জিজ্ঞেস কোরো তো মাকে?

সনু আসতে আসতে বলল, বিরক্ত গলাতে; আবার আরম্ভ করলে!

তারপর ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে কর্ডলেসটা তুলে নিয়ে ঘরে চলে গেল।

ঘরটা যদিও ওর একার নয়।

আমি এমনই তালেবর বাবা ওদের যে, দুই অধ্যয়নশীল মেয়েকে দুটি আলাদা ঘর পর্যন্ত দিতে পারিনি জীবনের শেষে পৌঁছেও। হায়! তাতেও কত মানুষই না আমাদের "সাফল্যে" (?) কাতর।

মৌ আর সনু ওই একটি ছোট্ট ঘরেই গুঁতোগুতি করে পড়াশুনোর পাট প্রায় চুকিয়ে ফেলল।

আমার একটি আলাদা ঘর লাগেই। সে ঘরের আলমারিতে বই, টেবিলে বই, বিছানাতে বই, বাথরুমে বই। বইয়ের সঙ্গেই শুয়ে থাকি আমি। সে জন্যে আমার স্ত্রী মিতুর অভিযোগও কম নেই। তবে আজকাল আর কেউই কিছু বলে না আমাকে। পুরোনো আসবাবেরই মতো আমিও এই ফ্ল্যাটের একটি ফিক্সচার হয়ে গেছি। যেতে আসতে চোখে যে পড়ি না তা নয়, কিন্তু আমার আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। তা ছাড়া, সকলেই জেনে গেছে যে, বলে কী লাভ? পাথরের গায়ে কলমের আঁচড় তো পড়ে না।

ও ঘর থেকে হিহি-হাহা শোনা গেল। ফোনে কত যে বলার কথা থাকে ওদের!

মিতু এখন বাড়িতে নেই। রেডিয়োর রেকর্ডিং-এ গেছে। মৌ অফিসে। তার কোনো শনি-রবি নেই। উইকডেজ এ সকালে নটাতে বেরিয়ে দশটা এগারোটাতে ফেরে একগাদা বইপত্র-ফাইল ইত্যাদি নিয়ে। তারপরও যতবার আমি রাতে বাথরুমে যাই, দেখি প্রায় সারারাতই ঘরের আলো জ্বলে। ও আবার চলে যায় অফিসে সকাল নটাতে। মোমবাতির দু দিকেই আগুন দিয়েছে। ওরও অবস্থা আমারই মতো হবে।

ওর মায়েরই সঙ্গে মিতুর ঘরে শোয় রাতে সনু। কোনো কোনো দিন রাতে খেতে বসে, বেয়ারা পঞ্চাননকে শুধেই মৌ এখনও আসেনি?

উনি তো আজ বিকেলে দিল্লি চলে গেছেন। অফিস থেকেই। হঠাৎ কাজ পড়ে গেছে।

ও! কবে আসবেন?

দিদির অফিসের ড্রাইভারই জানে। তাকেই বলে গেছেন। বলল, কিছুই ঠিক নেই। ফেরার আগের দিন ফোন করবেন বলেছেন। তখনই জানা যাবে।

বউদি কোথায় রে পঞ্চানন?

মেহেন্দি হাসানের গান শুনতে গেছেন জয়ন্ত চ্যাটার্জির বাড়িতে "সানি টাওয়ার্স"এ। বলে গেছেন, ফিরতে ফিরতে একটা হবে। খেয়ে আসবেন। চাবিও নিয়ে গেছেন। আপনাকেও তো যেতে বলেছিলেন।

হ্যাঁ। কিন্তু কাজ আছে আমার। আজই একটি লেখা শেষ করতে হবে। আর গাইয়ের নামটি মেহেন্দি হাসান নয়, মেহেদি হাসান।

লজ্জা পেল পঞ্চানন।

আর সনু?

দুপুরে বন্ধুদের সঙ্গে ছোটোদিদি বটানিকস-এ গেছিলেন। ভীষণ ঘুম পেয়ে গেছে। তাই খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ওঃ।

আমি বলি।

ফাঁকা টেবলে বসে খেতে ভালো লাগে না। কিন্তু এ নিয়ে আমার কোনো অনুযোগ নেই। হয়তো ওদেরও, আমার বিরুদ্ধে নেই। কারণ, আমরা প্রত্যেকেই জানি যে, আমাদের পরিবার অন্য দশটি পরিবারের মতো নয়। ভালোমন্দর কথা নয়, আমরা শুধু অন্যরকম। আমরা, আমরাই। সেকথাটা জেনে এই একাকিত্ব, অসুবিধা, এই সবকিছুর জন্যই এক ধরনের গর্বও বোধ করি। আশ্চর্য। এই গর্বটাও আবার অনেকের চোখে স্পর্ধা হয়ে প্রতিভাত হয়।

কেউ না থাকলে বা আগে পরে কোনোদিন কেউ খেলে, ঘরেই নিয়ে আসতে বলি আমার খাবার ট্রলি করে। খাওয়াটাও যদি মনপসন্দ না হয়, তবে সেটা নিতান্তই শুষ্ক কর্তব্য হয়ে ওঠে আমার কাছে। ইনকনসিডারেট, বিবেকরহিত ও মনস্তত্ত্বজ্ঞানহীন অধুনা ডাক্তারদের অজ্ঞতায় prescribe করা অখাদ্য, নাড়াচাড়া করে ফিরিয়ে দিই।

সনু বলল, বাই-ই।

বলে, ফোনটি রাখতে এল আমার ঘরে।

ফোনটা থাকে বসার ঘরেই। অনেকগুলো ফোন করতে হবে জরুরি তাই এ ঘরে কর্ডলেসটি নিয়ে এসেছি।

কথা হল?

হ্যাঁ।

কী কথা বললে?

বাবা! সত্যি তুমি না! বন্ধুরা কত কথা বলে। তুমি যখন বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে ছিলে তখন দাদু কি জিজ্ঞেস করতেন তোমাকে বন্ধুর সঙ্গে কী কথা বললে?

বয়ফ্রেন্ডসদের কথা বলছিলেন বুঝি?

আমি শুধোলাম সনুকে?

হাঃ। তা হলে তো হতই!

তোর দাদু তো আমাকে বি. কম. পরীক্ষার অনেক আগে থেকেই জোয়ালে জুতে দিয়ে নিজের বেগুন খেতে বেগুন চাষ করাচ্ছিলেন। তোর মতো অত কথা বলার সুযোগ কি আমার ছিল? সকালে ঘুম থেকে যেতাম। উনিভার্সিটি ল কলেজে। সেখানে ক্যানটিন-এ ভরপেট খেয়ে অফিস টাইমের ট্রামে-বাসে উঠতে পারতম না বলে কলেজ স্ট্রিট থেকে হেঁটে হেঁটে অফিসে আসতাম।

হ্যাঁ। সনু বলল। আর তার পরেরটাও বলো। সেটা বলছ না কেন? বিকেলে টেনিস খেলতে যেতে দেশপ্রিয় পার্কে। 'দক্ষিণী'তে গান শিখতে, নাটক করতে।

তারপরই বলল, তোমার না বাবা, সবটাতেই একটা দুঃখ-দুঃখ ভাব। কেন বলো তো? মাকে দ্যাখো না? সবসময় আনন্দে ঝলমল করছে। যেন আনন্দময়ী মা! এই জন্যেই তো মা বলে, ঠিকই বলে যে, তোর বাবা জানেই না কী করে সুখী হতে হয়। এতেও যদি তুমি সুখী না হও তবে কে তোমাকে সুখী করতে পারে বল? তোমার মতো কজন সাকসেসফুল?

"সাকসেস" কথাটার মানে এক-একজনের কাছে এক-একরকম। সেইটাই হচ্ছে মুশকিল! তা ছাড়া, তোর মায়ের চৈত্র মাসে জন্ম তো। তোর দাদুরই মতো। ওঁরা ভীষণই অনটিমিস্ট, এনার্জেটিক। কুলি-খাটানো, কাজের লোক-খাটানো, কারখানা চালানো, এসব কাজ ওঁরা খুবই ভালো পারেন। আর্মিতে জয়েন করলে ওঁরাই জেনারেল হন।

তুমি শুধুই মায়ের নিন্দা কর। মা কিন্তু কখনও তোমার নিন্দা করে না।

এটা কি নিন্দের কথা হল যা বললাম? তা ছাড়া আমার সম্বন্ধে নিন্দা করার কিছু থাকলে তবেই তিনি নিন্দা করবেন?

হ্যাঁ। তা কি আর নেই!

আমি চললাম।

যাবে? কোথায়? তোমাকে তো দেখতেই পাই না। বোসো না একটু। ছুটির দিন। বাবাকে একটু কম্পানি দাও। কী করবে কি, গিয়ে?

বাবাঃ! কত্ত কাজ।

কী কাজ? করছিলে কী?

একটা বই পড়ছিলাম। দিদি বম্বে থেকে কিনে এনেছে গত সপ্তাহে।

কী বই?

"V" When Feeling Bad Is Good".

কার লেখা?

Ellen Mograth.

কীসের বই?

মেয়েদের পড়ার বই। লানডান এর সাইকিয়াট্রিস্ট লেনার্ড ক্রিস্টাল লিখেছেন "A truly remarkable book ... An absolute must for women the worlds over who will take heart form its profound message."

প্রকাশক কে?

Bantam

তুমি তো আর ডিপ্রেশান ফিল করছ না?

মাঝে মাঝে করি বাবা।

কেন? এখনই কি? এত অল্প বয়সে!

অল্পবয়স যে চিরটাকাল অল্পবয়স থাকে না বাবা। তুমি মনে করে দ্যাখো, এই তো সেদিনও তুমি অল্পবয়সি ছিলে। ছিলে না? ক্যালকাটা র‍্যাকেট ক্লাবে স্কোয়াশ খেলতে যেতে। আমাকে অরেঞ্জ স্কোয়াশের গ্লাস হাতে ধরিয়ে দিয়ে তুমি খেলতে। আমি তখন এক হাতে গ্লাস ধরতেই পারতম না। দু হাতে করেই ধরতাম। আমি একটা হালকা লেমন ইয়ালো রিবন মাথায় বেঁধে যেতাম। মনে আছে। মাসি যেন কোথা থেকে এনে দিয়েছিল। বেঞ্চ-এ উঠতে পারতম না। এতই ছোটো ছিলাম। তোমাদের র‍্যাকেট ক্লাবের আবদুল বেয়ারা আমাকে তুলে ধরে বসিয়ে দিত। বাবা। বাবা। বলে আদর করে কথা বলত।

তারপর বলল, কেমন আছে এখন আবদুলদাদা?

আবদুল মারা গেছে।

দেখলে তো!

আবদুলদাদা তখন প্রৌঢ় ছিল। এই সেদিনও। দ্যাখো, মরে গেল এরই মধ্যে।

আমি তোমার খেলা দেখতাম। বাবাঃ কী ফাস্ট খেলা স্কোয়াশ। মার্কার জেভিয়ার এর সঙ্গে খেলতে তুমি। তাই না? মনে হয়, এই তো সেদিন। আর আজ? আজ বাদে কাল আমি এম. এ. ক্লাসে ভরতি হব। তুমিও অফিস ছেড়ে দেবে শিগগির। কী যেন বল না তুমি! এবারে নিজের "নিজস্ব" কাজ করবে। এতদিন কি তা হলে পরস্ব কাজ করলে?

আমি হাসলাম।

বললাম, তাই-ই। তা এখন কটা বাজে বল তো সনু?

সাড়ে বারো।

সাড়ে বারো? বলিস কী? ইটস টাইম ট্যু হ্যাভ আ ড্রিংক নাউ।

তোমাকে না শম্ভুকাকা দুপুর বেলা এসব আজেবাজে জিনিস খেতে মানা করেছেন?

রাখ তো তোর শম্ভুকাকার কথা। সে কি আমার মতো ভোর চারটেতে উঠে লেখার

কাজ করে ছুটির দিনে? আর সে তো লেখে প্রেসক্রিপশান। ক্রিয়েটিভ লেখালেখির যে কী স্ট্রেইন তা তারা কি জানে! দুটো জিন খাব, তারপর গিয়ে ভাত খাব তোমার সঙ্গে আজ ইলিশমাছ দিয়ে, তারপর কিছুক্ষণ ঘুমোব, আঃ কী সুন্দর মেঘলা দিন! তারপর আবার লিখব রাত আটটা অবধি। আমার তো ছুটির দিনেও ষোলো ঘণ্টা কাজ।

তুমি খেয়ো। আমি ইলিশমাছ খাব না, তুমি তো জানো। বোঁটকা গন্ধ। খেলে ওডিকলোন লাগাতে হবে হাতে।

সনু বলল।

তারপরে বলল, সোম থেকে শুক্র, আমি আর মা যখন Star T.V.-র Bold and the Beautiful সিরিয়াল দেখি, রাত আটটা থেকে পৃথিবীর আর কোনো কিছু সম্বন্ধেই যখন আমাদের আর কোনো হুঁশ থাকে না; তখন Santa Barbara শেষ না হওয়া অবধি তুমি পঞ্চাননদাদাকে দিয়ে বরফ, গ্লাস আর হুইস্কির বটলটা আনিয়ে নিয়ে ঘর অন্ধকার করে পটাপট ...

তোর তো সাংঘাতিক বুদ্ধি! থুড়ি, দুর্বুদ্ধি।

হবেই তো। আমি তো তোমারই মেয়ে!

আরে বোকা! তখন তো আমার সংগীত সাধনার সময়। ওয়াকম্যানটা কানে লাগিয়ে রাজ্যের গান শুনি। কখনও কখনও সঙ্গে সঙ্গে গাইও। আর একটু হুইস্কি খাই। খুব অন্যায় করি কি?

আমি কি বলেছি অন্যায় কর। ন্যায় অন্যায় রিলেটিভ ব্যাপার। তবে, মাঝে মাঝে যা চ্যাঁচামেচি কর, তখন আই রিয়্যালি হেইট উ্য।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, আমি জানি যে, ইউ অল হেট মি। এ কথা ঠিক যে, মাঝে মাঝে অমন রেগে যাই। রাগাটা কিন্তু ড্রিংক করার জন্যে নয়। রাগটা থাকেই ভিতরে, সবসময়েই গুমরে মরে। কখনও কখনও অনেক বছর ঘুমিয়ে থাকা আগ্নেয়গিরির মতো অগ্ন্যুৎপাত করে।

তারপরে বললাম, আমি নিজেও নিজেকে ঘেন্না করি। কেন যে কী করি, যদি বুঝতিস সনু। কত বড়ো একটা জাহাজ আমাকে চালাতে হয়। সারেং আমি। যতই মাসের এক তারিখটা এগিয়ে আসতে থাকে, ততই ... মাথাটা ... অথচ আমি মানুষটা এসবের কোনো কিছুই ...তোরা ঠিক বুঝবি না। কেউই বোঝে না আমাকে। সংসারে আমাকে মানায় না।

চললাম আমি। আবার আরম্ভ করলে।

না মা! যাস না। আর একটু বোস ...

পঞ্চাননদাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, নইলে অধীরদাকে।

নারে সনু। তোর হাতে এক গ্লাস জল খেতেও যে কী মিষ্টি লাগে!

সত্যি। তুমি এত জ্বালাও না। ভালো লাগে না। এখন আমাকেই দিতে হবে তোমার ওই সব? যত্ত বাজে সব।

বলেই, গজরাতে গজরাতে সনু চলে গেল।

তারপর ফ্রিজের দরজা খুলে ডাইনিং-কাম-সিটিং রুমে দাঁড়িয়েই বলল, বিটারস দেব না লেবু? বল।

আজ লেবু।

গন্ধরাজ, না কাগজি, না পাতি?

গন্ধরাজ।

বরফ?

হ্যাঁ।

জিন তো? না ভডকা? কোথায় আছে সেইসব ছাইপাঁশ।

সেলারেই আছে রে মা!

একটু পরেই সবকিছুই ট্রেতে করে সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়ে এল সনু।

মায়ের শিক্ষাতে দুই মেয়েই বড়ো গুছিয়ে কাজ করতে শিখেছে। করে না কিছুই। কিন্তু যদি করবে বলে মতি হয়, তবে একশোতে একশো নম্বর দিতে হয় তাদের। মৌ তাও একটু আমার মতো, কাগজপত্রর ব্যাপারে, বইটই এর ব্যাপারে একটু অগোছালো, সেটা আমারই মতো সময়াভাবেই হয়; বুঝি। কিন্তু সনু একেবারে তার মা বসানো। মেজাজেও। মাঝে মাঝে বড়োই বকাঝকা করে আমাকে। কী করব! বাড়িতে যে আমি মাইনরিটি। এই পরিবার ম্যাট্রিয়ার্কাল ফ্যামিলি। মাঝে মাঝে মনে হয়, একটা ছেলে থাকলে হয়তো আমার দিকটা বুঝত, বাবাকে তার চোখ দিয়ে অ্যাপ্রিশিয়েট করত।

তুমি-না আমাকে "বার গার্ল" বানিয়ে দিলে। এসব কাজ কি কোনো বাবা মেয়েকে দিয়ে করায়? ছিঃ।

আমি যে তোর যে "কোনো বাবা" নই রে মা! প্রথমত, আমি তোর একমাত্র বাবা। দ্বিতীয়ত, আমি যে আমিই! জাস্ট "কোনো" বা "এলেবেলে" বা "যে কোনো" বাবা নই! তাছাড়া, একটা কথা ভাব। আমার জামাই তো বলবেই তোকে, আহা! তোমার মা কী চমৎকার শিক্ষা দিয়েছেন তোমাকে। এটা তো নতুন কোনো কথা নয়। সব মায়েরাই মেয়েদের ভালো ট্রেনিংই দেন তাঁর তাঁর মতো। কিন্তু ক'জন বাবা ক'জন মেয়েকে তুই যে ট্রেনিংটা পেলি, তা দেয় বল?

সনু হাসল।

বলল, বলেছ ভালোই। ট্রেনিংই বটে!

আমি বললাম, জামাই বলবে, আহা! শ্বশুরমশাই তোমাকে ট্রেনিংটা দিয়েছিলেন বটে।

সনু হাসল। বলল ভাবছ তাই! জামাইফামাই হবে না কোনোদিনও তোমার। সব বোকা বোকা vague ছেলে। পছন্দ হয় না একটাকেও। আর যদি হয়ও কখনও কাউকেও পছন্দ; আমার প্রথম condition-ই হবে যে ড্রিঙ্ক করতে পারবে না। করলে মাথাতে বোতল ভাঙব।

সে তো বিয়ের সময়ে সব ছেলেই প্রতিজ্ঞা করবে রে। ছেলেদের তো চিনিস না! আমিও কি তোর মাকে কথা দিইনি? তা ছাড়া আমিও তো বলেছিলাম। সিনসিয়রলি বলেছিলাম। বিশ্বাস কর! এসব তো এই বুড়ো বয়সেই ...

তবে? কথা দিয়েও। ছিঃ বাবা!

ও তুই বুঝবি না। জীবনে কোনো প্রতিজ্ঞাই, কোনো কথাই static নয়রে। বড়ো দুঃখময় হলেও এর চেয়ে বড়ো সত্যি আর নেই। সময়ের সঙ্গে কথা সরে যায়; নড়ে যায় এই পৃথিবীতে, সুন্দরতম গাছের পাতাও ঝরে যায়। ফুলও। আমরা নিরুপায়। কে বলতে পারে! হয়ত বুঝবিওবা, এই স্ট্রেইন, এই ঘোরাঘুরি, এই আনসার্টেনটি, এই নোংরামি, চক্রান্ত, বিদ্বেষ, এই এত এবং এতরকমের অকৃতজ্ঞতা, অপমান, লেখার চিন্তা, মক্কেলের চিন্তা, এত সবের বোঝা যে এই ঘাড়ে চাপবে সে কথাও তো জানা ছিল না আগে, বল? সব মিলেমিশে এই ক্লান্ত বিরক্ত মাথাটা একটু উদ্দীপ্ত হতে চায়। ড্রিংক করাতে, মাথার কাজ যাদের, তাদের দোষ নেই, বাড়াবাড়িটাই দোষের। ক্রিকেটার ফুটবলাদের বিয়ার আর উকিল, ব্যারিস্টার, অ্যাকাউন্ট্যান্টদের হুইস্কি। ওষুধই বলতে পারিস। আমাদের প্রফেসর নারিয়েলভালা সাহেব বলতেন, উ্য মাস্ট ওয়ার্ক হার্ড টু আর্ন ইয়োর স্কচ। ড্রিংকট্রিংক পরিশ্রমী মানুষদেরই জন্যে। হয়তো ক্রিয়েটিভ মানুষদের জন্যেও। উ্য মাস্ট ডিসার্ভ ইন; আর্ন ইট।

ছাই ওষুধ। চললাম আমি।

সনু বলল।

বলেই, দুদ্দাড় করে ও ঘরে চলে গেল।

দু মিনিট পরেই আবার বোতাম টিপলাম রিমোট কনট্রোল বেল-এর।

সনু দরজাতে দাঁড়িয়ে বলল, ওরা কেউ নেই।

কেউই নেই? কোথায় গেল?

পঞ্চাননদা চুল কাটতে গেছে আর অধীরদা গেছে চান করতে।

আমি যেদিন বাড়িতে থাকব সেদিনই কি ওদের বিউটিফিকেশান-এর দিন!

মহিম কোথায়! বাবুর্চি সাহেব?

সে ওষুধ কিনতে গেছে।

কী ওষুধ? নির্জৌবষধি? আমারই মতো?

জানি না। বলো কী চাই?

কী আর চাইব বল? কার কাছেই বা চাইব? এ বাড়িতে প্রত্যেকেই মালিক। শুধু আমি সকলের তাঁবেদার। আমিই একমাত্র কাজের লোক। না, কী যেন বলে আজকাল "গৃহকর্মী"।

কী চাও বলো না বাবা?

আমার স্টেপলারটা। কোথায় যে গেল!

হাতের কাছেই তো থাকার কথা। নিয়ে নাও না।

কই? পাচ্ছি না রে! কোথায় হাতের কাছে?

উঃ। তুমি যা জ্বালাও না। সে জন্যেই তো বাড়ি থাকতে ইচ্ছে করে না তুমি বাড়ি থাকলে।

একটু আহত হয়েই আমি বললাম, তোদের এতই জ্বালাই।

আমিও আহত হই কখনও কখনও। লজ্জাহীনেরও লজ্জা থাকে।

তারপর বললাম, লক্ষ্মী সোনা, একটু দেখে দিয়ে যাও।

ঘরে ঢুকেই বলল, এই তো। এটা কী?

কোথায়?

তোমার পেছনে।

পেছনে যে ভগবান চোখ দেননি রে মা! যদিও দেওয়াটা, তোদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, তাঁর 'হাইলি' উচিত ছিল।

বিছানাটাকে যা করেছ না! মা দেখতে পেলে! মা আসার শব্দ পলেই দরজা লক করে দেবে ভিতর থেকে বুঝেছ। যদি কুরুক্ষেত্র এড়াতে চাও ...

স্বল্পক্ষণ পরেই আবার আমি ডেকে উঠলাম, সনু-উ-উ সনুউউ —

কী হল আবার?

একটু এসো।

না। আসব না। বলো না।

একটা বই খুঁজে পাচ্ছি না। কালকেই রিভিউটা জমা দিতে হবে।

কী বই? রিভ্যু ফিভ্যু করার দরকার কী? তুমি তো আবার মন রেখে কথা বলতে পার না। আর কত বাড়াবে শত্রু?

বাড়ুক বাড়ুক। অগণ্য শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বেঁচে থাকার মধ্যে যে কী আনন্দ তাও আমি তোদের শিখিয়ে দিয়ে যাব। মাই লিগ্যাসি। তোরা যদি সততার দিকে থাকিস, ন্যায়ের দিকে থাকিস, তবে অসত্য, ভণ্ড, খল অন্যায়কারীরা চিরদিনই তোর সঙ্গে শত্রুতা করবে। যার শত্রু নেই, সেই মানুষকে এড়িয়ে চলবি। তারা মানুষ হিসেবে খুবই গোলমেলে। শত্রুতা, এই ক্লীবের দেশে, তোদের ক্ষমতাকে ক্ষুরধার করুক, ওই আশীর্বাদ করি।

বইটা পড়ইনি আর রিভিউ করবে কী করে!

কে বলেছে পড়িনি, পড়েছি রে পড়েছি। পড়েছি অনেকবারই কিন্তু সমালোচনা করার সময়ে বইটা তো হাতের কাছে দরকার।

কোন কাগজে করবে? রিভিউ?

"আজকাল" থেকে বলেছে।

কেমন দেখতে? বইটার কভার?

মিয়াঁ তানসেন অথবা অন্য কেউ বসে ফতেপুর সিক্রিতে হাত ছুঁড়ে গান গাইছেন। দারুণ কভার এঁকেছেন বিমলদা।

বিমলদা কে?

বিমল দাস।

মিঞা তানসেন হাত ছুঁড়লে দোষ নেই। আর পপ মিউজিকে যখন হাত-পা ছোঁড়ে তখনই দোষ হয়ে যায়।

আরে সেই হাত-পা ছোঁড়া আর এতে অনেকেই তফাত আছে।

কী বিষয়ের বই!

ইন্ডিয়ান ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক অ্যান্ড মিউজিশিয়ানস। বইটা একবার পড়লে পারতিস। অনবদ্য ভাষা। চমৎকার বই। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে রে! কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

হতে পারেন। কিন্তু আমার কাছে অ্যাজ ফরেন অ্যাজ এম্পেরর হাইলে সেলাসি। বাবা। ইচ্ছে থাকলেও পড়া যাবে না।

তারপরে বলল, আমরা বড়োই আনফরচুনেট বাবা। আমাদের কেরিয়ারই ফার্স্ট প্রায়রিটি। একচুল বাড়তি সময় যে নেই! আর কেরিয়ারের দিকে না দেখলে যে তোমার ঘাড়ে বসেই সারা জীবন খেতে হবে।

তা খাবি না হয়। আমার ঘাড় তো তেমন অমজবুত নয়।

না বাবা। ঠাট্টা নয়।

নইলে, কোনো অশিক্ষিত বড়োলোক, নয়তো অত্যাচারী স্বামীর পয়সাতে খেতে হবে। আজকের মেয়েদের কাছে স্বাবলম্বনই হচ্ছে প্রথম প্রায়রিটি। আমরা নিরুপায় বাবা। তাছাড়াও সত্যি কথা বলতে কী, ইন্টারেস্টও পাই না। ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে পড়ার যেমন গুণ আছে অনেক, অনেক দোষও আছে। আমাদের জীবনের পাতাগুলোকে সব মার্কার দিয়ে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইটস আ ম্যাটার অফ প্রায়রিটিজ। প্রায়রিটি আফটার প্রায়রিটি। আসলে জীবন তো বড়ো ছোটো না!

গম্ভীর হয়ে গেলাম।

আমি বললাম, তা ঠিক। তুই কুড়ি বছরেই একথা যে বুঝেছিস এটাই তোর কৃতিত্ব। আমি যে এখনও সে কথা পুরোপুরি বুঝেই উঠতে পারলাম না। আজও ভাবি যে, জীবন বুঝি অনন্ত। এখনও অনেক কিছুই করার সময় আছে। আসলে বোঝা উচিত যে, নেই।

সনু বলল, অবশ্য দীর্ঘ জীবনটা ইমমেটেরিয়াল। গ্রিক হিরো অ্যাকিলিস বলেছিলেন না? জীবনের দৈর্ঘ্য দিয়ে জীবনের মাপ হয় না কখনওই। জীবনে কে কী করল, সেটুকু দিয়েই জীবন মাপা হয়।

তারপরেই বলল, আমি চললাম। একটু গান শুনব ওয়াকম্যানে। বড়ো টেনশানে আছি। বুঝেছ বাবা! কখন খাবে? মায়ের তো আজ আসার ঠিক নেই। তুমি দেরি করলে আমি কিন্তু খেয়ে নেব।

তোর আবার কীসের টেনশান?

জে, এন, উ্য-তে ভরতি হবার পরীক্ষা দিয়েছিলাম তো। রেজাল্ট বেরোবে দু একদিনের মধ্যেই।

জে. এন. উ্য মনে?

দিল্লির জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি?

সে কী! কবে দিলি আবার পরীক্ষা?

ওই তো। দিয়ে দিয়েছি। পরীক্ষা সব জায়গারই দিয়ে রেখেছি। তবে জে. এন. উ তে হবে না। সারা দেশের ছেলে মেয়েরাই দিয়েছে তো। তার মধ্যে আমার কোনো চান্সই নেই।

আর যদি পেয়ে যাস? কী হবে?

আতঙ্কিত গলাতে আমি বললাম।

কী আবার হবে। চলে যাব।

কোথায়?

দিল্লিতে! রাজধানী।

সে কী রে!

আমি সোজা হয়ে বসে, উৎকণ্ঠিত গলাতে বললাম।

তারপর বললাম, আমি তোকে যেতে দেব্বই না। তুইই আমার একমাত্র সঙ্গী, বন্ধু; ফিলসফার। ফাই-ফরমাশ খাটার মানুষ, হাতের নড়ি; অন্ধের যষ্টি। তোর মা আর দিদির কি সময় আছে আমার দিকে দেখার? তোকে কিন্তু আমি যেতে দেব না। আগেই বলে রাখছি। দুটি কান খুলে শুনে রাখ।

সনু হাসল। শব্দ না করে।

বললাম, হাসছিস যে বড়ো।

ও বলল, কী যে বল। তুমি সেনাইল হয়ে যাচ্ছ বাবা। আমাকে যদি বিয়ে দিয়ে দিতে? তখন যেতে না দিয়ে পারতে?

অকাট্য যুক্তিতে আটকে গিয়ে তুতলে বললাম, বিয়ে? বিয়ে দিলেও খুঁজে পেতে ঘরজামাই আনতাম। আমার সনুকে আমি ছাড়তে পারব না। ছেড়ে, বাঁচতেই পারব না একদিনের জন্যেও।

সনু চুপ করে থাকল একটুক্ষণ।

বলল, সকলকেই সকলে ছাড়ে বাবা। ছাড়তে হয়ই। আজ আর কাল। তা ছাড়া, ছাড়ার কত্ত রকম হয়। এই যে আমাদের বন্ধু রিঝির ছাড়তে কি হল না? আমরা তো কতজনাই ছিলাম। আটকাতে কি পেরেছিলাম। রিঝি জড়িয়ে ধরে রাখতে চাইল, তার বাবাকে, শ্মশানযাত্রীরা এসে বললেন, আর দেরি করা ঠিক হবে না হে, এবার ওঠাও। জ্যান্ত জ্বলজ্বলে রিঝির বাবা থেকে, হঠাৎই তিনি একটা "ডেডবডি" হয়ে গেলেন। একটা ফোটো। ফোটোমাত্র। জীবন এরকমই...

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমার মেয়ের কথা শুনে। সে বি.এ পরীক্ষা দিতে পারে। কিন্তু আমার চোখে সে যে আমার সেই ছোট্ট সনুই। এই তো সেদিন জন্মাল সনু। মিতুর সেকেন্ড সিজারিয়ান বেবি। সেদিন!

অনুরাধাও যাবে নাকি? দিল্লি?

আমি শুধোলাম।

অনুরাধা খুব আদরের মেয়ে। ওকে বাড়ি থেকে ছাড়বেই না। ছোটো মেয়ে। তাছাড়া ও এ কারণে পরীক্ষাই দেয়নি জে এন উ্যর।

তুমিও তো আমার ছোট্ট মেয়ে। তুমি কি অনাদরের?

আমাকে তুমি বলো না, দূর হয়ে যা। রেগে গেলে?

বলিরে বলি। সে তো মুখেরই কথা। তুই চলে গেলে, আমিও থাকব না কলকাতাতে। চলে যাব কোথাও। বলে দিচ্ছি। দেখিস!

যাবে কোথায়?

যেদিকে দুচোখ যায়।

হ্যাঁ। তুমি দেখি শরৎবাবুর শ্রীকান্তর মতো ডায়লগ দিচ্ছ।

তুই পড়েছিস নাকি শরৎবাবুর শ্রীকান্ত।

না। আমি পড়িনি। দিদির সব পড়া। দারুণ তাড়াতাড়ি পড়তে পারে দিদি। বড়ো ব্যারিস্টারের মতো। অনুরাধা চক্রবর্তী পড়েছে আমাদের ক্লাসের। এই বলত, প্রেসিডেন্সির ছেলেদের, ওই, শ্রীকান্তর ডায়ালগ ঝাড়িস না তো!

কবে জানতে পারবে রেজাল্ট? তোমার জে এন উ্যর?

এনি মোমেন্ট।

ঠিক সেই সময়েই ফোনটা বাজল।

আমিই তুললাম। গলাটা খুবই চেনা লাগল। সনুর কোনো অবাঙালি বন্ধু।

ইয়েস। প্লিজ স্পিক হিয়ার।

আমি বললাম।

হো-য়া-ট! আই ডোন্ট বিলিভ ইট। হি-ই-ই-ই।

বলেই, লাফাতে লাফাতে ডান হাতে রিসিভার ধরে, বাঁ হাত ওপরে তুলে, যেমন করে ম্যাচ জিতে স্টেফি গ্রাফ হাত তোলে, বলল; পেয়ে গেছি! পেয়ে গেছি! পেয়ে গেছি। বা-ব্বা-বা-আ। আই কান্ট বিলিভ ইট।

আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পরে বলল, থ্যাংকস আ মিলিয়ান গীতাঞ্জলি। বাই।

কোন গীতাঞ্জলি?

আমি চোরের মতো বললাম।

হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে বইমেলাতে দেখা হয়েছিল না? সেই।

তারপরেই আমার মনে পড়ল গীতাঞ্জলিকে। গীতাঞ্জলি চতুর্বেদী। ওর বাবা

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের সেক্রেটারি। ওর বাবার এক বন্ধু দিল্লিতে ফল জেনে ওকে তক্ষুনি ফোন করে খবর দিয়েছেন। গীতাঞ্জলিও যাচ্ছে দিল্লিতে।

সনু বলল, মা যে কী রেকর্ডিং করছে এতক্ষণ আকাশবাণীতে! ও, না। রেকর্ডিং করে তো নু-মার্কেট হয়ে আসবে বাজারটাজার করে। মা শুনলেই খুব লাফাবে।

হ্যাঁ। আমি বললাম।

বলেই, একটা বড়ো জিন ঢাললাম।

বললাম, সনু, তুই কি সত্যিই যাবি নাকি?

বাবা। উ্য রিয়্যালি আর আ...। যাব না?

আমি চুপ করে গেলাম। বুকের মধ্যেটা ফাঁকা হয়ে গেল।

ও বলল, ভালো কথা। তুমি ভারতী রায়কে চেন?

কে ভারতী রায়?

ক্যালকাটা উ্যনিভার্সিটির প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার।

চিনি মানে, দুবার দুজায়গাতে দেখা হয়েছিল। অত্যন্ত সুন্দরী মহিলা। অত্যন্তই খোলামেলা, সপ্রতিভ। এবং বিন্দুমাত্র এয়ার নেই। কথাও বলেন চমৎকার। আ গ্রেট লেডি! কিন্তু কেন!

এখন নিয়ম করেছে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, শুনেছি, উনি আসার পরই যে, রেজাল্ট যবেই বেরোক, যে সব ছেলেমেয়ে বাইরের কোনো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছে তাদের রেজাল্ট পাবলিকলি বেরোবার আগেই কনফিডেনশিয়ালি পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যাতে রেজাল্টের জন্য তাদের ভরতি হওয়া আটকে না থাকে। শুনেছি বাবা। তুমি প্লিজ একটু ফোন করো না। গীতাঞ্জলি ফোন নাম্বার দিয়েছে ওঁর।

তুই ডায়াল কর।

বলেই, জিনটা এক গাল্পএ গিলে ফেললাম।

সনুকে বললাম, সনু আমি আজকে দশতলা থেকে নীচে ঝাঁপ দেব।

কেন?

আমার সনু আরও উন্নতি করবে বলে তার একটা মাত্র বাবাকে একা ফেলে দিল্লি চলে যাবে। আর বেঁচে থেকে আমি কী করব! উন্নতি করার কি অন্য কোনো উপায় ছিল না!

সত্যি। তুমি না। দাঁড়াও। ডায়াল করি। ডায়াল করে, ভারতী রায়কে চেয়েই বলল, নাও। নাও। শিগগির নাও। কথা বলো। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলার বলে কথা। আমার ভয় করছে।

আমি বুদ্ধদেব গুহ বলছি। নমস্কার। চিনতে পারছেন?

বাবাঃ। বুদ্ধদেব গুহকে না চিনলে চলবে?

ওঁকে সমস্যার কথাটা বলতেই উনি বললেন, নো প্রবলেম। দুশো টাকা জমা দিয়ে অ্যাপ্লিকেশান করে দিতে বলুন। কনফিডেনশিয়ালি রেজাল্ট আগেই পাঠিয়ে দেব। আমি

আসার পর থেকে, অন্য জায়গাতে সুযোগ পেয়েও ফল দেরিতে বেরোবে বলে, ছেলেমেয়েরা ভরতি হতে পারবে না এমনটি আর হতে দিচ্ছি না।

বললাম, আপনি শুধু সুন্দরীই নন। সুদক্ষ সহ-উপচার্যও বটে। অশেষ ধন্যবাদ।

সৌন্দর্য এবং দক্ষতার সহাবস্থান কি দোষের?

হেসে বললেন উনি।

আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ।

বলেই, রিসিভারটা নামিয়ে রেখে বললাম, সনু। যাঃ। তোর কাজ হয়ে গেল। চমৎকার মহিলা। কোনো ফর্ম আছে কি না খোঁজ নিয়ে সেই ফর্মে টাকা জমা দিয়ে দে। কিন্তু...। কিন্তু কী করে থাকবি একা একা? মা-বাবা কাকা-কাকিমারা মামা-মামিমারা, মাসি, দিদি সকলকে ছেড়ে...

ফ্ল্যাটে আসার পরে তো অনেক বছর একা থাকা অভ্যেসই হয়ে গেছে বাবা। আর অন্যরা কেই-বা কতটুকু খবর রাখে আমরা বেঁচে আছি কী মরে গেছি। তুমিই বা কতক্ষণ বাড়ি থাক? বা কলকাতাতেই? দিদি ও মাও তো তাইই! সবই অভ্যেস হয়ে যাবে বাবা। কিছু ভেবো না। বিদেশে যাচ্ছে কত ছেলে মেয়ে। তাদের বাবারা কি কাঁদতে বসছে পা ছড়িয়ে? তুমি ভীষণই ব্যাক-ডেটেড বাবা।

ভাবছিলাম আমি। বিদেশে যে কেন যায় ছেলেমেয়েরা! সকলেই কি খুব কিছু একটা হয়ে ফেরে? অনেকে তো ফেরেই না। বিদেশে গেলেই কি লেজ গজায়? গজার ছেলে ধ্বজাকে বি.এ পড়তে পাঠিয়েছিল গজা ইংল্যান্ডে। মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে। দুনম্বরি বড়োলোক। টাকার অভাব কি? ট্যাক্স দিতে হয় না। ইন্ডিয়াতে নাকি বি.এ-টাও ভালোভাবে পড়া যায় না! কী পড়ে এসেছে জানি না। তবে ফিরে এসেছে ধ্বজা। একটা ট্রাউজার পরে এসেছে। তার একটা পা নীল আর অন্যটা লাল। পেছনেও হয়তো অন্য রং ছিল, লক্ষ করিনি সেদিন। পরে একদিন লক্ষ করে দেখতে হবে।

গজা বলল, দ্যাখ দ্যাখ, আমার বিলেত-ফেরত ছেলেকে দ্যাখ।

গজাদের মাছের ভেড়ি আছে। টাকার অভাব নেই। এখন একটু "কালচার"-এর দরকার। "জাতে ওঠার" জন্যে।

॥ ২ ॥

সনু কালই সকালে চলে যাবে। দিল্লিতে।

তার মা, তার দিদি এবং সে, গত তিন সপ্তাহ ধরে বিয়ের তত্ত্ব সাজানোর মতোই তত্ত্ব সাজিয়েছে। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই; চান নেই। মাথার চুল সব খাড়া। জামাকাপড়, বইপত্র, কাগজ-খাতা, কলম-কালি, এখানের সকলের ঠিকানা, দিল্লির সকলের ঠিকানা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনদের। ফোন-নম্বরের লিস্ট।

গত প্রায় সাতদিন রাতে সনু বাড়িতে খায়নি। স্কুলের বন্ধু এবং কলেজের বন্ধুরা বাড়িতে নেমন্তন্ন করে আলাদা আলাদা করে ওকে খাইয়েছে। বন্ধুরা তো বটেই, বন্ধুর মায়েরাও খুবই ভালোবাসেন ওকে।

বন্ধুদের সকলকেও ও একদিন খাইয়ে দিয়েছে।

পরশু ডেকে বলেছিলাম, মায়ের মনটা খারাপ, আর তুমি রোজই বাইরে খাচ্ছ? বাড়িতে একটু থাকলে কী হয়?

আজকালকার ছেলেমেয়েরা সকলেই বাইরে বড়োই রুক্ষ-স্বভাবের। ক্যাটক্যাট করে কথা বলে। পৃথিবী বদলে গেছে, তাই তাদের আবরণকেও পুরু করতে হয়েছে বোধহয়। আন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো ওদের গতি। বাইরে থেকে ওদের হৃদয়ের নম্রতা বোঝা যায় না। অনেকখানি খোঁড়াখুঁড়ি করতে হয়।

সনু বলল, তা কী করব! বন্ধুরা আমাকে যদি নেমন্তন্ন করে, তো কি 'না' বলব! আমার কাছেও তো আসতে পার একটু।

কী হবে এসে। তুমি তো সবসময়েই কাজ কর। তোমাকে ডিসটার্ব করি না। আমারও এখন এত কাজ। সংসার উঠিয়ে নিয়ে হস্টেলে থাকব তো। বোঝো না কেন বাবা।

পাকা গিন্নির মতো বলল সনু।

বুঝিরে! বুঝি বলেই তো...

॥ ৩ ॥

বালিগঞ্জ পার্ক-এর চক্রবর্তীদের বাড়িতে কার যেন বিয়ে। লীলাদিদের (মজুমদার) বাড়ির কাছেই। অথবা বউভাত। অথবা বিয়ের পঁচিশ কী পঞ্চাশ বছর হবে।

আমার মনটা ভারী খারাপ। অফিস যাইনি আজ। বৃষ্টি হচ্ছে সকাল থেকেই ফিশফিশ করে। আমি ওঁদের চিনি না। ওঁরাও আমাকে চেনেন না। কিন্তু ওঁদের বাড়ির দুগ্‌গোপুজো বা বিয়ে সবই আমাদের বহুতল বস্তি থেকে চোখে পড়ে। না চিনেই বলতে পারি ওঁরা কলকাতার বাঙালি পরিবারদের মধ্যে 'Last of the Mohicans'! গর্বিত হই।

চক্রবর্তীদের বাড়িতে সানাই বাজছে। এতদূর থেকে বৃষ্টি ফিশফিশানির মধ্যে রাগটা যে কী তা বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত বিভাস। যোগিয়াও হতে পারে। তখন সকালের সানাই বাজছিল।

দেখতে দেখতে সন্ধে নেমে এল। বৃষ্টি থেমে গেছে। সানাই-এর শব্দ জোর হয়েছে।

সনু চিংড়িমাছ খেতে খুব ভালোবাসে। গড়িয়াহাটে গৌর সাহার দোকান থেকে আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসব বলেছিলাম, মাছ। কিন্তু মিতু বলল, যাওয়ার আগের দিন যদি পেট আপসেট করে? মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাক।

এ বাড়িতে আমার কোনো মতই খাটে না। অতএব।...

আমি এখন আমার লেখার টেবলের সামনে বসে আছি বাইরে চেয়ে। ঘর অন্ধকার

করে। দিনের বেলাতে যে বড়ো কদমগাছ আর জোড়া অমলতাস দুটি চোখে পড়ে বালিগঞ্জ পার্ক-এর পথের মোড়ে, তাদের দেখা যাচ্ছে কিন্তু অন্ধকারে তাদের রূপ বোঝা যাচ্ছে না। অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারতর দেখাচ্ছে তাদের। ঝুপড়ি-ঝুপড়ি। আজ রাতের আমার সব ভাবনারই মতো।

রাতের সানাইয়ের রাগের চেহারাটা স্পষ্ট হয়েছে এখন—হংসধ্বনি। হংসধ্বনি বাজছে।

প্রায় বছর পঁয়ত্রিশ আগে রবিশংকরের একটি ডিস্কে ওই হংসধ্বনি প্রথম শুনি। গানবাজনার কতটুকুই বা বুঝি!

ভালোবাসি, এইটুকুই!

সানাইয়ের সুরে শিশুকাল থেকে শুধু আনন্দই পেয়ে এসেছি। সানাইয়ের সুর যে এত ব্যথাবাহীও তা আগে কখনোই হৃদয়ঙ্গম করিনি। কতশত বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে সানাইওয়ালার সামনেই বসে থেকেছি। খাদ্যর চেয়েও গানবাজনা আমার কাছে চিরদিনই বেশি প্রিয়। নির্গুণ হলেও মুগ্ধ হয়ে বাজনা শুনেছি। কিন্তু সেই সুর, বিদায়ী কন্যার হাস্যমুখী বাবা-মায়ের হৃদয়ের গভীরে যে কত অন্যরকম ক্ষতের ব্যথাবাহী বিধুর ভাবের উদ্রেক করে, তার বিন্দুমাত্র খোঁজও রাখিনি এত বছর।

সন্ধের সময়ে সনুর একমাত্র মাসি এল। অনেক খাবারদাবার নিয়ে। হজমি, দইবড়া, আচার, চুরমুর, বিস্কিটের প্যাকেট, জীবনে প্রথমবার বাইরে পড়তে যাওয়া এবং প্রবাসী হয়ে-যাওয়া বোনঝির জন্যে সব গুছিয়ে নিয়ে। আরও অনেকে এলেন। অনেকে ফোনও করলেন।

রাত দশটা বাজতে চলল। আমি বললাম, এবারে শুয়ে পড়ো সনু। ভোর সাতটাতে ফ্লাইট। পাঁচটাতে বেরোতে হবে।

তারপর বললাম, আমার কাছে একটু শোবে না আজ?

সনু বলল, বাবা! কত্ত কাজ যে এখনও বাকি তোমাকে কী বলব।

আমি কিছুই আর বললাম না। অধিকার বলে তো কিছুমাত্রই নেই আমার মেয়ের উপরে। মেয়েকে চোখের দেখা দেখতে পাওয়াও অনেকখানি আমার কাছে। বাবার তেমন কোনো ভূমিকাও নেই আমার মেয়েদের জীবনে। এবং এই সংসারেও।

মৌ, সনুর দিদি সঙ্গে যাবে। ন বছরের বড়ো দিদি, প্রায় গার্জেনেরই মতো। একজন মক্কেলকে বলে দিয়েছিলাম, দিল্লি এয়ারপোর্টেই একটি গাড়ি পাঠাবেন। ওরা যতদিন থাকবে, গাড়িটা থাকবে ওদের সঙ্গে। দিল্লিতে এখন ভারী পচা গরম। তাই এ.সি গাড়িই পাঠাতে বলেছি।

আমি বললাম, এয়ারপোর্টে কি আমি যাব?

সনু বলল, একদম না! তুমি তো গিয়েই দশজনের সামনে যাত্রা করবে। জান বাবা, শো অফ এমোশানস কিন্তু শিক্ষার লক্ষণ নয়। আনন্দেও কাঁদতে নেই; শোকেও নয়।

আমি বললাম, কারেক্ট। তোরা আমার মৃত্যুতেও কাঁদিস না।

সত্যিই। কান্নাকাটি, চোখের জল, এসব অশিক্ষারই লক্ষণ। কোনোই সন্দেহ নেই। এসব গ্রাম্যতাও। এ কথা আমিও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি যে এখনও গ্রাম্যই রয়ে গেছি রে মা। গ্রামের ছেলে তো একপুরুষে শহুরে হতে পারে না।

॥ ৪ ॥

আমার ঘুম আসছিল না। রাত আড়াইটা অবধি লিখলাম। পুজোর লেখার সময় এখন। যদিও খুবই কম লিখি, তবুও চাপ পড়েই। তারপরেও যখন ঘুম এল না তখন একটা অ্যালজোলাম খেলাম।

হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল। আচমকা, দরজা খুলে ঘরের মধ্যে দুড়দাড় করে ঢুকে সনু বলল, শোনো, বাবা। আমরা এবারে যাব। তুমি কি চা খাবে?

আরে! আমাকে আগে কেউ উঠিয়ে দেয়নি কেন? বাড়িসুদ্ধ মানুষে উঠে তৈরি হয়ে যেতে পারল আর... পঞ্চানন! তোরা ভেবেছিস কী? পাঁচটা হয়ে গেছে। এখন তৈরি হব কী করে? সাতটাতে যে প্লেন ছেড়ে যাবে!

তুমি থাকো বাবা, মৌ বলল। তোমার শরীর ভালো নেই। চোখে হেমারেজ হয়েছে। তাই নিয়ে কাজ করছ! তাড়াহুড়ো করতে হবে না। চা খাও। এসো, বাইরে এসে বোসো।

মিতুর ঘরে ওরা ফাইনাল টাচ দিচ্ছিল। ড্রাইভার রাতে সার্ভেন্টস কোয়ার্টার্সেই ছিল। সে গাড়ি বের করেছে। সনুর বড়ো ট্রাংকও তাতে উঠে গেছে। এখন ওভার-নাইটার দুটি নিয়ে দুই বোনে নামবে। মিতুও তৈরি হয়ে গেছে।

সনু তৈরি হয়েই ঘর থেকে বাইরে এল। আমি বসবার ঘরের সোফাতে বসে চা খাচ্ছিলাম। আমার মন ভারী খারাপ। সনুকে দেখে, আমি সোফা ছেড়ে চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে, দাঁড়িয়ে পড়লাম।

ডাকলাম, সনু!

আমি ডাকলাম না। বুকের মধ্যে থেকে অন্য কেউ যেন আর্তনাদ করে উঠল।

আমার আধুনিক, কঠিন হৃদয়ের ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট সনু হঠাৎই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে দৌড়ে আমার বুকে এসে আছড়ে পড়ল। আমিও অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষের মতো কেঁদে উঠলাম।

পরমুহূর্তেই ওকে আদর করে বললাম, কাঁদে না। কাঁদে না মা! জীবনে বড়ো হতে যাচ্ছ, মানুষ হতে যাচ্ছ; কাঁদে না সোনা।

তারপরই লিফট-এ করে সকলে নেমে নীচে এলাম।

গাড়িতে সনু, তার মা আর তার দিদির মধ্যিখানে বসেছিল।

গাড়ি ছেড়ে দেবার আগে, গাড়ির জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আমি আবার ডাকলাম, সনু!

সনু হাতটা বাড়িয়ে দিল। ওর পুরো হাতের পাতায় নয়, ওর চারটি আঙুলের সঙ্গে আমার আঙুলের একবার ছোঁয়া লাগল।

কী যেন বলতে গেলাম আমি। বলতে পারলাম না। আমার আত্মজার পরশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কান্নাতে এই গ্রাম্য, অশিক্ষিত মানুষটার গলা বুজে এল।

মিতু বলল, এবারে যেতে হবে।

গাড়িটা ছেড়ে দিল।

যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণ হাত নাড়লাম সনুকে। দশতলাতে উঠতে উঠতে লিফটম্যান রতনকে বললাম, ছোটো দিদি চলে গেলরে রতন। দিল্লিতে। বড়ো হবে বলে।

কবে আসবেন আবার?

সেই ডিসেম্বরে।

ডিসেম্বর তো অনেকই দেরি।

আমি মাথা নাড়লাম।

আমার চোখে জল দেখে লিফটম্যান রতন নিজেই অস্বস্তি বোধ করে, চোখ নামিয়ে নিল।

আমি ভাবছিলাম, মানুষ হয়তো একদিন চাঁদেই বাস করবে। সুপার-কম্পিউটার নির্ধারণ করবে আমাদের নিত্যকার জীবনযাত্রা। কিন্তু পিতা-পুত্রীর সম্পর্কের ওপরে কোনও যন্ত্র, কোনও দেবতা, কোনও দাবি কখনও প্রভাব ফেলতে পারবে না। আমার এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কোটি কোটি বাবার আদরের সনুরা, তাঁদের সনুই থাকবে। বড়ো আদরের ধন; কুসুমরতন!

বৃষ্টি পড়ছিল বাইরে। গাড়ির চাকা-চারটেতে হাওয়া বেশি নিয়েছিল নিরঞ্জন গতকাল। এয়ারপোর্টের রাস্তাতে গাড়ি স্কিড না করে। আমার চিন্তা হচ্ছিল।

ফ্ল্যাটে ঢুকে আমি আমার ঘরে গিয়ে শুলাম।

সেই সকালে চক্রবর্তীদের বাড়িতে সানাই থেমে গেছে। একটু পরেই ম্যারাপ খোলা শুরু হবে। নগ্ন বাঁশগুলো, কোনোরকম সিমেট্রিহীন বাঁশগুলো; দিগ্‌বিদিকে দাঁত উচিয়ে জেগে থাকবে। শয়ে-শয়ে বাঁশ।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বা ঘোরে ছিলাম। কর্ডলেস ফোনটা হাতের কাছেই ছিল। হঠাৎ বাজতেই উঠিয়ে নিলাম।

মৌ। কী রে? মৌ।

বাবা, চিন্তা কোরো না। চেক-ইন করে নিয়েছি। সনুর সঙ্গে কথা বলো।

সনু স্বাভাবিক, সপ্রতিভ গলাতে বললও, শোনো, বাবা। চেক-ইন করে নিয়েছি। ভালো থাকবে। ওই সব খারাপ জিনিসটিনিস কম খাবে।

বললাম, প্রতি সপ্তাহে ফোন কোরো আমাকে। রিলিজিয়াসলি। বুঝেছ। মাকেও চিঠি লিখবে। ফোন করা ছাড়াও।

ও বলল, হুঁ।

তারপর বলল, তোমার পাঠক-পাঠিকাদেরই মতো আমাকেও চিঠি লিখো। লিখবে তো? যদিও আমি তোমার কোনও বইই পড়িনি। এমনকি যে-বই তুমি আমাকে উৎসর্গ করেছ, সেই বইও।

বাক্যটি শেষ করেই সনু স্তব্ধ হয়ে গেল।

আমি কল্পনা করে খুব আনন্দ পেলাম যে, সেই "পাপের প্রায়শ্চিত্ত" করতে সনু তার অপদার্থ বাবার জন্যে হয়তো এক ফোঁটা চোখের জল ফেলছে। নীরবে। হয়তো!

বলতে গেলাম হ্যাঁ। কিন্তু হয়ে গেল ভ্যাঁ।

ছাড়ছি বাবা।

বুদ্ধিমতী সনু বলল, তাড়াতাড়ি, আমার স্বরের বৈকল্য বুঝেই।

আমি রেসপনসিবল বাবা হয়ে গিয়ে, বললাম, লুক আফটার ইয়োরসেল্ফ। বি সাকসেসফুল ইন লাইফ সনু। বি ব্রেভ।

বলেই, সুইচ-অফফ্ করে দিলাম কর্ডলেসটার।

ভাবছিলাম, আমরা যখন সনুদের বয়সি ছিলাম তখন আমরা কথাটাকে জানতাম "Battle of Life" বলেই। কিন্তু আজকে ওদের জীবন তো শুধু একটিমাত্র Battle-এর নয়। অগণ্য "Battle"-এর সমষ্টি। অনেকেই লড়াই ওদের লড়তে হবে। আজীবন। "War of Life" -এ জয়ী হতে হবে।

আমাদের মতো অশিক্ষিত, এমোশানাল; গ্রাম্য মানুষদের দিন শেষ হয়ে গেছে।

বড়ো কষ্টের হবে ওদের বেঁচে থাকাটা, বড়োই সংগ্রামের।

বেচারি সনু।

আমার সনু।

আমাদের প্রজন্মের বাবা-মায়েদের লক্ষ লক্ষ সনু।

জগন্নাথ

পুলিনবাবু নস্যির ডিবেটা বের করে এক টিপ নস্যি নিলেন।

নীলরঙা ফুল হাতা শার্টের কোলের কাছে পড়ল কিছুটা। ঘাড় নীচু করে দেখলেন একবার উদ্দেশ্যহীন চোখে, বাইফোকাল চশমার ফাঁক দিয়ে। বাঁ পকেট থেকে ছেঁড়া ন্যাকড়া বের করে ঝাড়লেন জায়গাটা।

তারপরই, সামনে খুলে-রাখা পার্সোনাল লেজারটাতে চোখ দুটি নিবদ্ধ করলেন।

উলটোদিকের টেবিল থেকে তাঁর অল্পবয়সি সহকর্মী হেমেন বলল, কী সিনেমা দেখলেন দাদা? দেখলেন কিছু? দাদা?

শুনতে পেলেন না পুলিনবাবু।

যখন যে কাজটা করেন তাতে এমনই ডুবে যান উনি, যে, তখন পৃথিবীর অন্য কিছু সম্বন্ধেই হুঁশ থাকে না।

হেমেন আবার বলল, এই যে পুলিনদা। কোনো সিনেমাই দেখলেন না এবারে কলকাতায় এসে? গৌতম ঘোষ-এর 'পার'-ও না?

মুখ তুললেন উনি।

হেমেনের দিকে একবার তাকিয়েই, মুখ নামিয়ে বললেন, 'পার' অনেক দূরে এখনও। তেষট্টি হাজার দুশো পঁয়ষট্টি টাকার ডিফারেন্স ছিল ট্রায়াল ব্যালান্স-এ। মোটে হাজার পাঁচেক টাকা খুঁজে পেলাম। কিন্তু সাড়ে ছ'হাজার আবার বেড়ে গেল। ক্রেডিটে বেশি ছিল।

ঘরের সকলেই প্রায় হেসে উঠল একসঙ্গে। পুলিনবাবুর কথা শুনে।

তাদের সম্মিলিত হাসির শব্দে মুখ তুলে চাইলেন পুলিনবাবু। হাসির কারণটা ঠিক বুঝতে পারলেন না।

হেমেন বললল, আপনাকে নিয়ে চলে না দাদা! ট্রায়াল ব্যালান্স-এর পার তো চিরদিনই দূরে থাকে। 'পার' ছবিটাও দেখলেন না। কলকাতায় এলেন আপনি। গৌতম ঘোষের ছবি। একটা বড়ো কিছু মিস করলেন জীবনে।

ছবি?

পুলিনবাবু স্বগতোক্তি করলেন। স্বপ্নোত্থিতের মতো।

হ্যাঁ হ্যাঁ ছবি! ফিলিম।

উনি কোনো উত্তর দিলেন না। চোখ নামিয়ে নিজের কাজ করতে লাগলেন।

বেশিদিন খাতা লিখলে মানুষ সত্যিই আপনার মতো মাছিমারা-কেরানিই হয়ে যায়। হেমেন বলল।

হেমেনের টেবিলেই বসে জিশু। জিশু বলল, শুয়োর পার করাবার সিনটা দারুণ, না রে?

জবাব নেই।

সমরেশ মজুমদারের লেখা, না?

সমরেশ মজুমদার নয় রে। গুরু সমরেশ বসুর। গল্পের নাম ছিল 'পাড়ি'।

গৌতম ঘোষের সঙ্গে আলাপ থাকলে বলতাম, এবার আমাদের দুঃখদুর্দশার কাহিনি নিয়ে একটা ছবি তুলতে। এই ধরো আমাদের পুলিনদা। এঁকে নিয়ে যদি কোনো লেখক একটি গল্প লিখত তবে কী করুণ হত বল তো? শুয়োরগুলো তাও পেরিয়ে গেল নদী। কত মানুষ আছে আমাদেরই মধ্যে, যারা চেষ্টা করল, নাকানিচোবানি খেল; কিন্তু নদী আর পেরুনো হল না তাদের।

গোপেন হেসে উঠল হেমেনের কথায়।

কিন্তু হাসাবার জন্যে বলেনি হেমেন কথাটা। অন্যরা স্তব্ধ হয়ে পুলিনদার দিকে চেয়ে রইল।

স্টিল-ফ্রেমের চশমাটা সরু নাকের ডগায় নেমে এসেছিল।

পুলিনদা চোখ দুটি লেজার থেকে তুলে ওদের দিকে তাকালেন। বললেন, ঠিকই বলেছ হেমেন। বায়োস্কোপের হিরো-হওয়া-শুয়োরের চেয়েও নিকৃষ্ট অনেক মানুষই থাকে। সত্যিই থাকে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, যেমন আমি।

এমন সময় রন্টু, হেমেনের সিগারেট আর পুলিনবাবুর পান, স্যুয়িংডোর খুলে ঢুকল।

ঢুকেই বলল, আবার এয়েচে।

কে?

পানটা নিতে নিতে পুলিবাবু শুধোলেন।

সেই! কম্পু কোম্পানির লোক।

হেমেন, গোপেন এবং অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের সকলেই কাজ ছেড়ে এই নতুন আলোচনায় মেতে উঠল।

রন্টু, চায়ের জলটা চাপিয়ে দিয়ে বলল, ইনি অন্য কোম্পানির লোক। সেদিন এসেছিল এইচ. এম. টি থেকে।

ছোটোসায়েব তো নেবেনই বলেছেন।

সবাই শালা রাজীব গান্ধি হয়ে গেল মাইরি! কম্পিউটার না বসালে আর এফিশিয়েন্সি বাড়ছে না! সকলেই মডার্ন। ছোটোবাবুর বাবা খোদ মালিক যে এতদিন হাফহাতা ফতুয়া গায়ে আর ভুঁড়ির নীচে ধুতি পরে এই বিজনেস এত বড়ো করে গেল সেই আসল মালিকই এখন ফোতো। কম্পিউটার না বসালে নাকি এফিশিয়েন্সি বাড়ানো যাচ্ছে না। প্রাগমাটিজম আনতে হবে। আমরা সকলেই ওয়ার্থলেস। শালা আমাদের সুদ্ধু নাজাই খাতে লিখে দিলে র‍্যা!

ঠিক সেই সময়েই ছোটোবাবু দরজা খুলে ঢুকলেন। চোখে ফোটোসান লেন্সের চশমা। আলো বাড়াকমার সঙ্গে রং পালটে যায়। ছোটোবাবুর মুখের খচরামির রঙেরই মতো। জিন্স-এর ওপরে ঘি-রঙা একটা টি-সার্ট। সিল্কের।

ওকে দেখেই সকলে চুপ করে গিয়েই দাঁড়িয়ে উঠলেন।

শুধুমাত্র পুলিনবাবু ছাড়া। টেবিলের নীচে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া একপাটি চটি খোঁজার জন্যে এদিকে-ওদিকে পা চালাচ্ছিলেন উনি তখন আপ্রাণ চেষ্টায়। বাঁ পায়ের চটিটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এই রন্টু ছোকরা যতবারই ওঁর টেবিলের কাছে আসে, ততবারই লাথি দিয়ে ওর চটিগুলো এদিক-ওদিকে ছিটকে দেয়। ইচ্ছে করে যে করে, তা নয়। ছোঁড়ার পায়ে খুর লাগানো আছে।

পুলিনবাবু।

ছোটোবাবু ডাকলেন।

স্যার।

বলেই, একপায়ে চটি গলিয়ে উঠে দাঁড়ালেন উনি।

কতদূর হল, আপনার? বাগান থেকে ফোন এসেছিল। তাড়াতাড়ি দরকার আপনাকে সেখানে। এবারে আবার ট্যাক্স-অডিটের ঝামেলা আছে। অডিটরের ছেলেরা আপনার জন্যে বসে আছে। মিলিয়ে দিয়েই ফিরে যান।

ছোটোবাবু প্রায় বাঙালিদের মতোই বাংলা বলেন। অথচ বাঙালি ওঁরা মোটেই নন। বাঙালিরা এই কোম্পানিতে কেরানিই। যত বড়ো বড়ো পোস্ট সবই তাঁর নিজের রাজ্যের লোক।

পুলিনবাবু বললেন, আজ্ঞে। কিন্তু ডিফারেন্স যে বেড়ে গেল এদিকে, স্যার।

তা আমি জানি না। মিলিয়ে দিয়েই চলে যান। বুঝেছেন?

শেষ শব্দটাকে অসহিষ্ণুতার ছোঁয়া লাগানো।

ছোটোবাবু চলে গেলেন তাঁর নিজের চেম্বারে।

বাবাই বলল, কম্পিউটার। কম্পিউটারের কথা আর বলিস না। তার খেল দেখলি সেদিন?

কোনদিন?

সকলেই জিজ্ঞেস করল সমস্বরে। পুলিনবাবু ছাড়া।

আরে! ওই তো শনিবার না রবিবার রাতে। মিস ইউনিভার্স-এর সিলেকশন দেখায় না টি-ভিতে? স্টেটস-এর মায়ামি থেকে? স্যাটালাইটে? একটা কাপড় কোম্পানির স্পনসরড প্রোগ্রাম ছিল।

আমরা তো দেখিনি!

আমি গেসলুম মামাবাড়িতে। রাত প্রায় পৌনে এগারোটায় ছিল। কালার টিভিতে দেখলুম। সুন্দরী মেয়ে ছিল দুটিই। আর সবই দাঁত বের-করা। কী করতে যে গেছে। একজন মিস আয়ারল্যান্ড। আর অন্যজন মিস স্পেইন। কম্পিউটারে সব জাজদের দেওয়া ডাটা ফিড করে তার উত্তর আবার সেখানকার মস্ত এক অ্যাকাউন্টেন্সি ফার্ম-এর পার্টনার নিজে নিয়ে এলেন।

কে হল মিস ইউনিভার্স?

ঝুল। পুরো ব্যাপারটাই ঝুল। ওদের দুজনের কেউই হল না। হল বোধ হয় মিস পুয়েরটোরিকো। সোনাগাছির মাসির মতো চেহারা মাইরি। দাঁতের পাটির মধ্যে আবার কী একটা মিসিং। এবং মিশি অ্যাডেড। কোনো মানে হয়!

হেমেন বলল, কথাই তো আছে! কম্পিউটারে যদি গার্বেজ ফিড কর, তো গার্বেজই বেরুবে। মানুষের মাথার কোনোই দাম নেই। সবই নাকি কম্পিউটারে করে দেবে? আমরা কি বসে বসে...

বাবাই বলল, আরে! তোরাও যেমন! আজকাল আবার ছোটোবাবুর মতো সাহেব ব্যাবসাদাররা কী করছে জানিস না? খাতায় যত তিন-নম্বরি হিসেব সব কম্পিউটারের ভেতর পুরে দিচ্ছে। ধরো শালা! রেইড করে কী ধরবে? ইনকাম-ট্যাক্স ডিপার্টের লোক এসে আঙুল চুষবে বসে বসে। নো খাতাপত্তর, নো হিসেব! লুকিয়ে থাকবে জ্বলজ্বলে নানা রঙা ডিজিটালস-এ...

এবার যতীন বলল, তিন-নম্বরিটা আবার কী মাল মাইরি? আমাদের দু-নম্বর অবধিই তো জানা ছিল। তুইও দেখছি কম্পিউটারের মতোই অ্যাডভান্সড হয়ে যাচ্ছিস। আমাদের মোটা বুদ্ধির বাইরে।

সে কী রে! অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে কাজ করিস আর তিন-নম্বর কাকে বলে তাই-ই জানিস না?

না তো?

সকলেই বলল সমস্বরে।

একমাত্র পুলিনবাবু ছাড়া।

এখানে উনিই একমাত্র মানুষ, যিনি এক নম্বর ছাড়া কিছুই জানেন না। একনম্বরি মানুষ তিনি, যে যুগের মানুষ, সে যুগে কম্পিউটারও ছিল না, দু-নম্বর এ সবও ছিল না।

সকলে আবার বলল, বলো বাবাই! বুঝিয়ে বলো।

বাবাই জিশুকে বলল, আগে সিগারেট ছাড়ো তো গুরু!

সিগারেটটা লম্বা একটা টান মেরে বলল, মনে করো আমাদের পাঁচজনের একটা পার্টনারশিপ ফার্ম আছে। আমরা প্রফিট করলাম, ধরো, পাঁচ লাখ। তার মধ্যে আড়াই লাখ এক-নম্বরে দেখলাম আর আড়াই লাখ দু-নম্বর করে দিলাম। মনে করো আমার হাতেই অ্যাকাউন্টস। এই ব্যাপারটা শুধু আমিই জানি। আমি অন্য পার্টনারদের বললাম, আসলে প্রফিট হয়েছিল সাড়ে চার লাখ। মানে আড়াই নয়, শুধু দু লাখই দু-নম্বর করা হয়েছে। ওই দু লাখ পাঁচজনে চল্লিশ হাজার টাকা করে ভাগ করে নিলাম। বাকি পঞ্চাশ আমি একা মেরে দিলাম। ওই পঞ্চাশ হাজার টাকাটা আমার তিন নম্বর হল।

সকলেই হো হো করে হেসে উঠল।

যতীন টেবিল বাজাল উত্তেজনায়।

শুধু পুলিনবাবুই হাসলেন না।

আরও এক টিপ নস্যি নিয়ে ট্রায়াল ব্যালান্স-এর ডিফারেন্স খুঁজতে লাগলেন। মনে মনে বললেন, এই ছোকরাগুলো পোস্টিং কাস্টিং কিছুই ঠিক করে করবে না, তা ডিফারেন্সের কী দোষ। ডিফারেন্স তো হবেই। একদল দায়িত্বজ্ঞানহীন ছোকরার দল।

হেমেন বলল, তুই এই তিন-নম্বর শিখলি কার কাছ থেকে?

কেন? আমাদের যে ফার্ম চায়ের বাক্স সাপ্লাই করে, সেই আগরওয়ালার কাছে। তাদের অ্যাকাউন্ট্যান্ট ভারী কম্পিটেন্ট।

পুলিনবাবু একবার তাকালেন আড়চোখে।

কিন্তু কিছু বললেন না।

মনে মনে বললেন, কম্পিটেন্ট! চোর হলেই আজকাল কম্পিটেন্ট!

পুলিনবাবু বাগানের অ্যাকাউন্ট্যান্ট। উত্তরবঙ্গ ডুয়ার্সে এখন বাঙালিদের বাগান আর নেই বললেই চলে। সাহেবদের বাগানগুলোও সব কিনে নিয়েছে বড়োলোক মাড়োয়ারিরা।

ছোটো বাগানগুলোও সব কিনে নিয়েছে মাঝারি মাড়োয়ারিরা। তারাই এখন সাহেব।

একটা দুটো বাগান অন্যরাও কিনেছে। যেমন কলকাতার কেনিলওয়ার্থ হোটেলের সিদ্ধি মালিক ভারত সাহেব। পরে অবশ্য বাগান ছেড়ে দিয়েছেন উনি।

যারাই তাদের অন্ন দিয়েছে, তাদের চাকরি খাবার ক্ষমতা যাদেরই হাতে যখনই ছিল, যারাই লাথি মারার ক্ষমতা রেখেছে তাদের; বাঙালিদের কাছে তারাই সাহেব। মালিক চিরদিনই।

সাহেবরা এই দেশ শোষণ করতে এসেছিল বটে তবুও তাদের রাখঢাক, আদবকায়দা ছিল। এখানকার বিভিন্ন দেশীয় এক-পুরুষের বড়োলোক সাহেবদের সেসব কিছুই নেই। চায়ের গাছের ডাল ভেঙে পাতার সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে। যা খুশি করছে। চক্ষুলজ্জা ব্যাপারটা জলাঞ্জলি না দিলে বোধ হয় পয়সা করা যায় না। পয়সার জন্যে মানুষ এমন হামলে পড়েছে যে, যা-কিছুই ভালো তার সব কিছুকেই ফেলে দিচ্ছে সকলে। যার টাকা আছে সেইই সব। আর কোনো কিছুরই দরকার নেই "সাহেব" হতে। আগে দরকার হত।

যে মানুষই গাড়ি চড়তেন তাঁরই শুধুমাত্র টাকা ছাড়া অন্য ব্যাপার ছিলই। বিদ্যা, মেধা, সততা, আভিজাত্য ইত্যাদি ইত্যাদি।

পঁয়ষট্টি বছরের পুলিনবাবুর পক্ষে এই নতুন পরিবেশ খাপ-খাওয়াতে প্রতিমুহূর্ত বড়োই অসুবিধে হয়। উনি এই কম্পিউটারের যুগের মানুষ তো নন! সাহেবি আমলের ডানকান ব্রাদার্স-এর একটি বাগানের অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছিলেন তিনি। সেই চাকরি ছেড়ে এসে এই চাকরিতে ঢুকেছেন। তাও বছর দশেক হয়ে গেল।

ওঁর মনে পড়ে গেল যে, যেদিন প্রথম একটি অ্যাডিং-মেশিন আসে তাঁদের বাগানে তার পরদিনই নবীন মুহুরি আত্মহত্যা করেছিল শিমুল গাছের ডাল থেকে গলায় দড়ি বেঁধে। নবীনের সবচেয়ে বড়ো গর্ব ছিল যে, চোখের নিমেষে সে ট্রায়াল ব্যালান্স, ব্যালান্সশিট, ডেটরস-ক্রেডিটরস-এর লিস্টের নীচে ডান হাতের তর্জনী দ্রুতগতিতে বুলিয়েই যোগফল বসিয়ে দিতে পারত। নবীনের কোনো যোগে কেউই কখনও ভুল ধরতে পারেনি। সাহেব কোম্পানির অডিটররা এসে ধন্য ধন্য করতেন সবাই নবীনকে। জীবনের পঞ্চাশ বছর ধরে সে যা গড়ে তুলেছিল; খ্যাতি, গর্ব, তার পারদর্শিতা, সবই এক নিমেষে একটি সাড়ে সাতশো টাকা দামের সবুজ-রঙা ছোট্ট জার্মান মেশিন গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিল। এই অপমান, অসহায়তা; ভবিষ্যতের অনিশ্চিতি কিছুতেই সহ্য করতে পারেনি নবীন।

নিজেকে মেরেই নিজেকে বাঁচিয়েছিল সেদিন। কিছু মানুষ ওইরকমই হয়। জীবনের চেয়েও মানকে বেশি ভালোবাসে তারা। পুলিনাবাবু নবীনের মতো হতে পারেননি।

বৈশাখের সকালে শিমুলের ডাল থেকে ঝুলতে-থাকা সাদা ধুতি-জড়ানো অর্ধ-উলঙ্গ দুলতে-থাকা মৃতদেহটা এখনও দুঃস্বপ্নে দেখেন পুলিনবাবু।

মাঝে মাঝে ভাবেন, মরে গিয়ে বেঁচে গেছে নবীনটা!

এতদিন পরে, এই কম্পিউটার বুঝি তাঁরও মৃত্যুর কারণ হয়ে এল!

অথচ তিনি যে নিজেকে মেরে নিজেকে বাঁচাবেন তার উপায় নেই কোনো। দুটি মেয়ে এখনও বিয়ের বাকি। ছোটো ছেলেটা অমানুষই হয়ে গেল। লেখাপড়া তো করলই না। এক পার্টির অ্যাকশন-স্কোয়াডে আছে সে।

শিলিগুড়িতে গিয়ে মাস্তানি করছিল এতদিন। এখন নাকি নেপালের ধুলাবাড়ি থেকে যেসব জিনিস চোরাচালান হয়ে শিলিগুড়িতে আসে রাতারাতি, সেইসব নিয়ে আসে। তাদেরই জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, যাঁদের মুখ চেনেন না, নাম জানেন না পুলিনবাবু অথচ যাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে এ নীরব অসহায়তার অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে তিনি আজও বাঁধা আছেন; তাঁদেরই মেয়ে বউরাই নাকি রাতের অন্ধকারে জঙ্গলে জঙ্গলে মাথায় করে, আঁচলে বেঁধে, সীমান্তের নদী বেরিয়ে টেপ-রেকর্ডার, মদ, ক্যালকুলেটার, ভি.সি.আর এবং আরও কত সব চকচকে জিনিস, যা নইলে আজকের আধুনিক মানুষদের "বেঁচে থাকার" কোনো মানেই হয় না, সেইসব বয়ে নিয়ে আসে।

সেই মেয়ে-বউয়েরা শুধু গতরে পরিশ্রম যে করে তাই-ই নয়। তাদের নিজেদের

অনেক সময়েই মানুষখেকো হিংস্র হায়নাদের হাতেও তুলে দিতে হয়। বিনিময়ে, মোটা ভাত-কাপড়ও জোটে না তাদের। আর মুনাফা লোটে ধুলাবাড়ির আর শিলিগুড়ির অবাঙালি ব্যাবসাদারেরা।

পুলিনবাবুর ছোটো ছেলে এখন এইসব চোরাচালানের কোনও একটি দলের গুন্ডা হিসেবে ভিড়ে গেছে। তৈরি হয়েই আছেন পুলিনবাবু। যে কোনওদিন শিলিগুড়ি থেকে তার মৃত্যু সংবাদ পাবেন।

বড়োটা মানুষ হয়েছিল। কিন্তু মানুষ হবার পরই অমানুষ হয়ে গেছে। মানুষ-অমানুষ অনেক রকমেরই হয়।

তিন হাজারি চাকরি করে এখন সে কলকাতায়। কিন্তু শ্যামবাজারের একটি মেয়েকে বিয়ে করে সে কুঁদঘাটে নিজের বাড়ি করে ক্যালকেশিয়ান হয়ে গেছে। স্কুটার কিনেছে। বাবা-মা-ভাই-বোন সকলকেই ভুলে গেছে। তার শাশুড়ি আর শালিই তার সব এখন।

পুলিনবাবুর মনে হয়, এও এক ধরনের মৃত্যু। নবীন মুহুরি, শিমুল গাছ থেকে ঝুলে পড়েছিল। নিজেকে মেরেছিল; নিজেকে বাঁচাবার জন্যে। তাঁর বড়োছেলেও নিজেকে মারল। অন্য মৃত্যু। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে। মৃত্যুরই মতো, সে বাঁচাটাও অন্য এক ধরনের বাঁচা জীবন এবং মৃত্যুরও অনেকই রকম হয়।

॥ ২ ॥

বাগানে ফিরে এসেছেন পুলিনবাবু। এক্ষুনি ফিরলেন। বড়োই ক্লান্ত।

যেদিন ফেরার কথা ছিল, তার দু-দিন আগেই। কলকাতায় যেতে হয়েছিল, কারণ কলকাতার ট্রায়াল ব্যালান্স ওরা কেউই মিলোতে পারেনি বলেই। আজকালকার ছোকরারা নিজের নিজের কাজ ছাড়া সব বিষয়েই পণ্ডিত! লজ্জা করে ওদের দেখে।

মিলিয়ে দিয়ে ফিরে গেছেন উনি। ডান পকেটের নস্যিমাখা লাল রুমালটারই মতো নিজের আত্মশ্লাঘার বুক ভরে। জীবনে তিনি একে একে হারিয়েছেন অনেক কিছুই। স্ত্রী মনোরমাকে। বড়োকে, ছোটোকে। নিজের বুকের মধ্যের ওই জিনিসটিও হারিয়ে গেলে বেঁচে থাকার মতো আর কোনও অবলম্বনই যে থাকবে না তাঁর।

সকাল থেকেই খুবই বৃষ্টি হয়েছে। উত্তর বাংলার বৃষ্টি! আগস্টের মাঝামাঝি। বিকেলের দিকে আকাশ পরিষ্কার হয়ে তিস্তা আর হিমালয় চমৎকার দেখাচ্ছিল। নদ এবারেও তাণ্ডব করবে মনে হচ্ছে। কাল বাগানের অফিসে শুনেছিলেন যে, কাঠামবাড়ির বাংলো নাকি আবার ভাসাবার উপক্রম করেছে হারামজাদা। চ্যাংরামারির চরের অবস্থাও তথৈবচ।

বিনু বলল, খাইয়া লও বাবা। দুগা খাইয়া লইয়্যা ছুটি কইর‍্যা দ্যাও আমারে। তিনুটার জ্বর তিনদিন থিক্যা। আমারও শরীলডা ভালো ঠ্যাকতাছে না।

রাঁধছস কী?

কী আর। পোলাউ মাংস তো আর রান্ধি নাই। হেই বর্ষায় তরিতরকারিরও আকাল পড়ছে। পাওন যায় না কিছু। ধোঁকার ডালনা আর রুটি রাঁইধা থুইছি। দিম্যু কি না, কও?

চাঁদটা উঠেছিল বিশ্ব-চরাচর উদ্ভাসিত করে। কোয়ার্টার্সের বারান্দায় বসে বৃষ্টি-ভেজা প্রকৃতি, চায়ের বাগান, কুলি লাইনের টিনের ছাদ, ম্যানেজারের বাংলো এসব দেখতে দেখতে অনেকই পুরোনো দিনে চলে গিয়েছিলেন পুলিনবাবু।

বিনুর কথায় বললেন, দিয়া দে তবে। তরে ছুটি কইর‍্যাই দি।

অভিমানের সুর লেগেছিল গলায়।

তিনি নিজে যে কবে ছুটি পাবেন চিরদিনের মতো? কিন্তু ছেলেমেয়েরা কেউই বোঝে না তাঁর গলায় কখন অভিমান লাগে আর চোখে কখন দুঃখ চমকায়। সে সব বুঝতেন, একমাত্র মনোরমাই। একজন পুরুষের জীবনে তাঁর স্ত্রীর মতো বুঝদার মানুষ বোধহয় আর কেউই হয় না। হয়তো স্ত্রীর জীবনেও, স্বামীর মতো। মজার কথা এই যে, দুজনেই বেঁচে থাকাকালীন ঝগড়াই হয় বেশি। ঝগড়া যে সকলের সঙ্গে করার অধিকার আদৌ নেই, এ কথাটা দু জনের মধ্যে একজন হঠাৎ চলে গিয়ে অন্যজনকে বুঝিয়ে দিয়ে যান।

খাওয়াদাওয়ার পর বারান্দায় বসেছিলেন পুলিনবাবু। এই কোয়ার্টার্সটা একেবারে ফাঁকায়। ধারেকাছে আর কোয়ার্টার্স নেই কোনো।

মনোরমা নির্জনতা, গাছগাছালি এসব পছন্দ করতেন বলেই অফিস থেকে এবং অন্য কোয়ার্টার্স থেকে দূর হলেও এই কোয়ার্টার্সই নিয়েছিলেন। একজন মেকানিকের কোয়ার্টার্স ছিল আগে এটি। বাগানের মোটর, ট্রাক্টর সারাত সে।

নিজেই পান সেজে খেলেন একটা। হাতভাঙা কাঠের ইজিচেয়ারটাতে বসে, বারান্দায় খুঁটির গায়ে দু-পা তুলে দিয়ে, জোনাকি-জ্বালা, ব্যাং-ডাকা রাতের দিকে চেয়ে বসে রইলেন।

খেতে যতটুকু সময় গেছে তারই মধ্যে চাঁদ ঢেকে গেছে মেঘে। ঝুরুঝুরু করে হওয়া বইছে। বৃষ্টি নামবে এক্ষুনি। কদম গাছ দুটিতে খুব কদম ধরেছে। কদম আর তাঁর দরজার পাশের জুঁইয়ের লতার গন্ধ মিশে আমেজের মতো লাগছে।

বিনু বারান্দায় এসে বলল, শুইবা না তুমি?

শুমু আনে! তিনু কই? তার জ্বর দেখছস?

দেখুম।

বলেই বিনু ঘরে চলে গেল।

মিনিট পনেরো পর আবার বিনু এসে বলল, তোমার আজ হইলোডা কী? শুইয়া পড়ো। রাত তো প্রায় নয়ডা বাজে।

সোজা হয়ে বসলেন পুলিনবাবু চেয়ারে। মেয়ের ব্যবহারটা কেমন যেন বিসদৃশ, সন্দেহজনক ঠেকল তাঁর কাছে।

কী মনে করে, উনি 'যাইতাছি' বলে, নিজের ঘরে গিয়ে শোবার ভান করে পড়ে রইলেন।

বাইরের বৃষ্টি-ভেজা প্রকৃতি আসন্ন বর্ষণের জন্য তৈরি হচ্ছিল। ফিশফিশ করছিল হাওয়া। দূরের ঝরনার আওয়াজের মতো মৃদু ঝরঝরানি আওয়াজ ভেসে আসছিল কানে দূরের তিস্তার আওয়াজ।

পুলিনবাবুর একটু তন্দ্রা মতো এসেছিল। এমন সময় একটা গাড়ির শব্দ শুনলেন তাঁর কোয়ার্টার্সের রাস্তায়। এদিকে এটা ছাড়া দ্বিতীয় বাড়ি নেই। গাড়ি তো আসে না এ পথে কোনো? কার গাড়ি? এত রাতে? হেডলাইট জ্বালিয়ে একটা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি এসে থামল তাঁরই কোয়ার্টার্সের সামনে।

পুলিনবাবু মড়ার মতো পড়ে রইলেন। সস্তা সেন্টের গন্ধ পেলেন হঠাৎ নাকে। বুঝলেন, বিনু তাঁর ঘরে এল। শাড়ির মৃদু খসখসও শুনতে পেলেন। শুলেই পুলিনবাবুর নাক ডাকে। বিনু ভাবল, উনি গভীর ঘুমে আছেন।

এমন সময় একটি চেনা গলা শুনতে পেলেন। তিনু!

তিনু বলল, দিদি! তুই এখনও তৈরি হস নাই?

বিনু ধমকে বলল, চুপ! আস্তে ক ছেমড়ি। বাবায় আইস্যা গেছে গিয়া।

অ্যাঁ?

হ্যাঁ।

কোথায়?

ঘুমাইতাছে।

পরক্ষণেই স্বগতোক্তি করল, ঘুমাইছে কি না তাইই বা কমু ক্যামনে? ওরে বরং বইল্যা দে তুই যে, আমি আজ যামু না। বাবায় উইঠ্যা পড়ে যদি তো এক্কেরে পেরলয় বাধাইবে।

কইস কী তুই? গিরিধারী তো নেশায় চুর হইয়া গাড়ির পেছনের সিটে বইস্যা আছে। আর বাগানের বাংলোয় বইস্যা আছে জোড়া-খাটে তাগো বাগানের মালিক। হ্যায় লোকডা একডা জংলি রে!

আস্তে। আস্তে। তরে কইলাম কী আমি?

বিনু বলল, বিরক্তি, ভয় এবং উদ্‌বেগ। নীচু গলায়।

তিনুর বয়স আঠারো। স্বভাব চঞ্চল, বেপরোয়া। গলায় স্বরও জোর। সে তেড়ে বলল, অত চুপ চুপ করতাছিস কির লইগ্যা? বাবায় কিছু বইলাই দেখুক না একবার! কী রাজকন্যাদের মত্তই রাখছে আমাগো! বেশি কিছু কইলে, আমি রাত্তারাতিই চইল্যা যামু আনে।

গলা শুকিয়ে গেল বিনুর।

বলল, যাবি কোন চুলায়?

ক্যান? কলকাতায়! গিরধারীর মালিক কইছে। কইছে, রানি কইর‍্যা রাখব আমারে। ভাবছস কী তুই?

এবারে পুলিনবাবু যথাসম্ভব কম শব্দ করে উঠে বসলেন খাটে। গিরধারী তাঁদের

বাগানের পাশেই যে মাড়োয়ারির বাগান, তার ক্যাশিয়ার। আর যে বাঙালি ছেলেটির গলা পেলেন তিনি এক্ষুনি, সে তার ছোটো ছেলের বন্ধু। স্টোর্সবাবুর সেজো ছেলে বঙ্কু।

তাঁর দুই অবিবাহিত মেয়েই তা হলে...

বুকের মধ্যে ভীষণ কষ্ট হতে লাগল তাঁর। বুকের মাঝখানটাতে ব্যথা করতে লাগল।

এখন উঠে বাইরে গেলে গিরধারী এবং ছোটোর বন্ধু বঙ্কু জেনে যাবে যে, পুলিনবাবুর কিছুই অগোচর নেই। অথচ না গেলেও...। এবং গেলেও...

কিন্তু যাবেনই বা কেন? কী করে যাবেন? কোন মুখে? তার মেয়েরা চলে যাক যেখানে খুশি। ছেলেরা যেমন গেছে। শিলিগুড়ি বা জলপাইগুড়ির পাড়ায় ঘর নিয়ে ব্যাবসা করুক গিয়ে। নয়তো কলকাতাতেই যাক। তাদের বুড়ো, হতভাগা বাবার ঘরে তারা তো রাজকন্যার মতো ছিল না! তারা যদি ভালো-খাওয়া ভালো-থাকাকেই সবচেয়ে বড়ো বলে ভেবে থাকে, তবে তাই-ই থাক তারা। তাই-ই পাক। এক জীবনে যে যা চায়, তাই-ই তো পায়। পাওয়া উচিত অন্তত। যে যেমন করে তা পেতে চায়, তেমন করেই পাক।

গাড়ি থেকে গিরিধারীর জড়ানো গলা ভেসে এল।

আররে এ বঙ্কু! কিতনা দের লাগেগি শালিকি তৈয়ারি হোনেমে?

বঙ্কু তাকে চুপ করবার জন্যে যেন কী বলল, চাপা গলায়। গাড়ির দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ হল।

পুলিনবাবু খাটে উঠে বসলেন। পুরোপুরি। পদ্মাসনে বসলেন। একটু পর শবাসন। মনটাকে দু-পায়ের জড়ো-করা বুড়ো আঙুলে সমাধিস্থ করবেন।

তিনু বলল, যা না দিদি। রাত কাবার কইর‍্যা ফিরিস না তা বইল্যা আবার। আমারও ভীষণই ঘুম পাইছে। বাজে লোক একডা। ওই মালিকডা যাচ্ছেতাই! এমন চটকাচটকি করছে না। আমি পাল্লা ভ্যাজাইয়া দিয়া শুইয়া পড়ুম।

টাকা? তরে টাকা দিছে?

বিনু শুধোল তিনুকে।

হ্যাঁ। দিবে না ক্যান?

ক দিছে?

পঞ্চাশ! তোরেও তাই-ই দিবে। যা গিয়া এখন।

তিনু, বিনুকে মিথ্যে কথা বলল।

পেয়েছিল আসলে দুটি পঞ্চাশ টাকার নোট।

মনে মনে হিসেব করল। একটি টু-ব্যান্ড রেডিয়ো আর একটা ক্যাসেট-প্লেয়ার আর ক-খানা ভালো শাড়ি সায়া ব্লাউজ এবং একজোড়া সোনার বালা এবং একশিশি বিলাইতি ইন্টিমেন্ট পারফ্যুম...। এইসব কেনার টাকা জমতে ও নিজেই ক্ষয়ে যাবে বোধহয়, চন্দন কাঠেরই মতো, ঘর্ষণে ঘর্ষণে।

পুলিনবাবু আবার শুয়ে পড়লেন। শুয়ে শুয়ে সবই বুঝতে পারলেন। তার ছোটো মেয়ে ঘরে ফিরল, বড়ো মেয়ে চলে গেল। গাড়িটার শব্দ যতক্ষণ না মিলিয়ে গেল ততক্ষণ শুয়েই রইলেন খাটে। মড়ার মতো। শবাসনে। তিনি তো মড়াই।

এখন মরে গিয়েও যে বাঁচবেন, সে সময়ও আর বাকি নেই। কিন্তু মনটা কিছুতেই দু-পায়ের জোড়া-করা বুড়ো আঙুলে বসে থাকতে চাইছে না।

পাশের ঘরে তিনু শাড়ি বদলাচ্ছিল। শব্দ পাচ্ছিলেন পুলিনবাবু। বিনুর চেয়েও তিনুর ওপরে রাগ অনেকই বেশি হচ্ছিল তার। মাত্র আঠারো বছর বয়স! এই ছোকরা ছুকরিগুলান কত্ত সহজে নষ্ট হইয়া যায়। কত্ত সহজে! কত্ত সস্তায়! সহ্যশক্তি কত্তই কম অ্যাদের! লোভও কত বেশি। ছিঃ ছিঃ! ওদের মূল্যবোধ পুলিনবাবুদের বোধ থেকে কতই আলাদা।

পূর্ব-বাংলার দেশ থেকে যেদিন ভিটে-মাটি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল পুলিনবাবুর তখন তার বয়স এই তিনুরই মতো আঠারো। বাবাকে কেটে ফেলেছিল তার পরিচিত মানুষেরা। মাকে বিবস্ত্র করে বাঁশবাগানের পাশ দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাদেরই মাঠে, এমন মানুষেরা, যাদের পুলিনবাবু মামা বা চাচা বলে ডাকতেন। মায়ের চিৎকার, "ও খোকন, আমারে বাঁচা"। তারপর "মাইরাই ফ্যালও তোমরা। মাইরাই..."

একটা তীব্র ক্রোধ, অসহায় এক বোবা বোধ কাজ করেছিল তাঁর ভেতর তখন। অসহায়ের নিষ্ফল ক্রোধ। যা পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে এই মুহূর্তেও অসংখ্য মানুষের ভেতর কাজ করছে। সেই বোধটাই আজ তেষট্টি বছর বয়সেও কাজ করে যাচ্ছে। তাঁকে প্রতিমুহূর্ত কুরে কুরে খেয়ে যাচ্ছে। কতগুলো অশিক্ষিত, নিপীড়িত, হীনম্মন্যতায়-ভোগা মানুষ যা করতে পেরেছিল তার বাবার প্রতি, মায়ের প্রতি, তা তিনি কী করে করবেন? ভাবতেই পারেননি। প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা পর্যন্ত জাগেনি। তখন ভগবানকে বলেছিলেন, ভগবান! ক্ষমা করে দিয়ো এদের। ভগবান! আমাকে আমার চেয়েও অনেক বড়ো করে দাও। যেন, ক্ষমা করতে পারি সকলকে।

মারামারি, কাটাকাটি, বলাৎকার, চুরি ডাকাতি, এসব করার শিক্ষা তো তিনি বাবা-ঠাকুরদার কাছ থেকে কখনও পাননি! তাই সেই আঠারো বছরের নিঃসম্বল অবস্থা থেকে আজকের এক অন্যরকম নিঃসম্বল অবস্থাতে পৌঁছোতে কত এবং কতরকম কষ্টই যে করতে হয়েছে, তা তিনিই জানেন। কিন্তু কখনওই সম্মান খোয়াননি। মাথা নোয়াননি। মূল্যবোধ হারাননি মোটেই। কষ্টের, সবরকম কষ্টের পরীক্ষাই তিনি পাশ করে এসেছেন। জীবনের এই পর্যায়ে পৌঁছেও তিনি নিজেকে বদলাতে পারলেন না। কিন্তু বদলানো যে দরকার নিজেকে, তা বেশ বুঝতে পারছেন। বিশেষ করে, আজ রাতে। কোনো মানুষেরই পক্ষে চিরদিন গৌতম বুদ্ধ হয়ে থাকা উচিত নয় সারাজীবন মনুষ্যত্ব খুইয়েও।

সারা রাত ঘুম হল না পুলিনবাবুর। খাটে বসে লুঙিটাকেই চাদরের মতো গায়ে জড়িয়ে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে নস্যি নিয়ে রাতটা কাটালেন। আওয়াজ পেলেন, রাত তিনটে নাগাদ তাঁর বেশ্যা মেয়েদের মধ্যে বড়োজন ফিরে এল।

ভোরের আলো ভালো করে ফুটতেই দেওয়ালের পেরেকে ঝোলানো পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে লুঙি পরেই বেরিয়ে পড়লেন পুলিনবাবু, তখন তাঁর আদরের, গর্বের, তাঁর জীবনের শেষ অবলম্বন বিনু আর তিনু অঘোরে ঘুমোচ্ছিল।

মাধবের চায়ের দোকানে অনেকে চা খাচ্ছেন। কাগজ আসতে আসতে এখানে বিকেল হয়ে যায়। ট্রানজিস্টর খুলে দিয়েছে মাধব। চা খেতে খেতে আরও অনেকেই এল দোকানে। পুলিনবাবুকে দেখে তো অবাক! এই বাগানে অনেক বছর এসেছেন। ডানকানের বাগান থেকের রিটায়ার করার পর। একদিনও মাধব দেখেনি পুলিনবাবুকে তার দোকানে আসতে। এত সকালে তাঁকে দেখে বলল, আরে! আপনি যে বাবু?

পুলিনবাবুর মাথা কাজ করছিল না। কানদুটি ভোঁ ভোঁ করছিল।

তবু বললেন মাধবের ওরিজিনাল দেশ রংপুরের ভাষাতেই। বয়স তো হতিছে! এট্টু মর্নিং ওয়াক কইরবার লাগে।

একজন অপরিচিত ভদ্রলোক চা খেতে খেতে অন্যজনকে বললেন, পঞ্জাব-সমস্যা তো মিটিয়ে দিলেন রাজীব গান্ধি। এবার আসামও মিটবে।

সন্দ আছে। মিটবে কি? আসামকে উনি দেবেনটা কী? চণ্ডীগড়? না, নদীর জল?

প্রথমজন বললেন, তা জানি না। তবে একটা কথা বুঝে ফেলেছি, যদিও বড়ো দেরি করে বুঝলাম।

কী?

এই পৃথিবী হচ্ছে শক্ত ভক্ত, নরমের যম। এ সর্দারজিগুলো তার মাকে না মারলে ছেলের সুর কি এত নরম হত? বাংলাতেও তো পার্টিশান হয়েছিল। আমরা বাঙালিরা না, আমাদের যারা তাড়াইল তাদের সঙ্গে লড়লাম, না, অন্য কারও সঙ্গেই। মার খেতে খেতে আমাদের ভদ্রলোকি গুমোর নিয়ে পিছু হাটতে হাটতে এমন জায়গায় পৌঁছেছি আজ যে, আমাদের এখন পশ্চিমবঙ্গ থেকেও চলে যেতে হয় কি না দ্যাখো!

ঠিকই কইছেন। অন্য সক্কলই হইল গিয়া বীরের জাত, আ আমরা হইলাম গিয়া ভীরুর জাত। সক্কলেই চিন্যা ফ্যালাইছে আমাগো।

হাঁটতে হাঁটতে চললেন পুলিনবাবু, চা খাওয়ার পর, কামারের বাড়ির দিকে। বাসস্ট্যাণ্ডের পাশেই তার বাড়ি আর কামারশালা। দিবারাত্র হাপর চলে খপর-খাপর।

রাধু সবেই দোকান খুলে বসেছিল।

আরে! অ্যাকাউন্ট্যান্টবাবু যে! খবর কী? এত সক্কালে? কোনদিকে আইছিলেন?

তোমারই কাছে।

কন দেহি, কী দরকার? বঁটি বানাইয়া দিমু একখান? কোদাল লাগবে নিশ্চয় বাগানের লইগ্যা?

না রাধু। বঁটি বা কোদালে চলব না। একখান রামদা বানাইয়া দাও দেহি। লাইটের ওপর। বেশ ভারী য্যান না হয়। বুঝছ!

কাইটবেন কী, তা দিয়া? তা তো আমারে কইবেন। হেই মতোই বানাইয়া দিমু আনে এক্কেরে ফাসকেলাস কইর‍্যা।

কী যে কাটুম, তা এহনো ঠিক করি নাই। তবে, ঘরে একটা থাকনের দরকার বড়ো। যা দিনকাল! মানুষ কাইটতে অইবো হয়তো।

তা ঠিকেই কইছেন বাবু। চুরি ডাকাতি তো লাইগাই আছে। চোর-ডাকাইত কাটোনের লগ্যেই বানাইয়া দিমু আনে। লাইটের উপর। ভার অইব না। দুহাতে তুইল্যা বসাইয়া দিবেন। ধড় থিক্যা মুণ্ডুখান সট কইর‍্যা খুইল্যা যাইব গিয়া!

কবে দিবা রাধু?

তাড়াতাড়িই দিমু।

কবে?

সাতদিনের মধ্যেই দিমু।

সাতদিন? কও কী তুমি? না, না। আমার একদিনের মধ্যেই চাই।

কন কী বাবু? পাঁঠা বাঁইধ্যা থুইচেন নাকি উঠানে। এত্ত তাড়াতাড়ি কীসের?

পেরায় সেই রকমেই। বাঁইধাই থুইছি কইতে পার।

বললেন, পুলিনবাবু।

তারপর বললেন, নিবা কত, তা কও?

আপনাকে সস্তা কইরাই দিমু। আইজকাল ইস্টিলের যা দাম! তাও তো র‍্যালকোম্পানির চোরাই-ইস্টিল বইল্যাই এত সস্তায় দিত্যা পারতাছি! তা, একশোই দিবেন আনে আপনি।

একশো? এতগুলা টাকা।

চমকে উঠলেন পুলিনবাবু।

তারপরই ভবলেন, পাক্কা স্টিলের একটা মানুষ-মারা হাতিয়ারই তো? তাঁর মেয়েদের এক একজনের এক-ঘণ্টা দু-ঘণ্টার ভাড়াই যদি একশো টাকা হয়, তা হলে মাধুর এত পরিশ্রম এবং ইস্পাতের বিনিময়ে একশোটা টাকা তো বেশি চায়নি। যে করেই হোক জোগাড় করে দেবেন তিনি।

উনি বললেন, দিমু আনে। কিন্তু কাল সন্ধ্যার পরই লাগব আমার।

কাউরে খুনটুন কইরবেন না তো আবার? আপনার ভাবগতিকে তো আমার ভালো ঠ্যাকতেছে না।

হাসলেন পুলিনবাবু। ম্লান হাসি।

বললেন, খুনখারাবি যদি কইরতেই পারতাম তাইলে আজ আমাগো কি এই দশা হয় রাধু? আমারই একলার ক্যান, পেত্যেক বাঙালিরই কি আজ এই দশা হইত?

রাধু কথাটার মানে না-বুঝে চেয়ে থাকল। কথাটা অস্পষ্ট হলেও তার মন যেন কথাটাতে সায় দিল।

আর কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই পুলিনবাবু চলে গেলেন। তাড়াতাড়ি হাঁটার জন্যে লুঙ্গিটাকে উঁচু করে কোমরে বেঁধে নিয়ে।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে ঘুরতে নদীর ধারে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লেন পুলিনবাবু।

তর্জনগর্জন করা তিস্তা দিয়ে জঙ্গলের কাঠ ভেসে যাচ্ছে। সেই প্রবলবেগে ভেসে যাওয়া বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়িগুলোকে কী দুঃসাহস এবং পরিশ্রমের সঙ্গে অল্প ক-টি মানুষ তাদের শক্ত সবল হাত আর হাতে-হাতে জড়ানো দড়ি দিয়ে বাঁচিয়ে নিচ্ছে। একটি করে। জীবন বিপন্ন করেও। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন অনেকক্ষণ পুলিনবাবু।

লোকগুলো চ্যাঁচামেচি করছিল।

উনি শুনলেন, গতকাল ওদেরই মধ্যে একজনকে নাকি নিয়ে গেছে তিস্তা। নেপালি চার পাঁচজন। অন্যরা, ভারতের অন্য প্রদেশের লোক।

ভেসে-যাওয়া কিছুকে বাঁচাতে হলে নিজেদের মধ্যেও কারও কারও ভেসে যাওয়ার জন্যে তৈরি থাকতে হয়ই বোধহয়। ভাবলেন উনি। এমনি করেই, বর্ষার তিস্তার স্রোতেরই মুখে ভেসে-যাওয়া কাঠের মতো একটা পুরো জাত তার ডালপালা শিকড়বাকড় সুদ্ধু ভেসে যাচ্ছে, তাঁর নিজের এবং সমস্ত জাতের চোখের সামনে দিয়েই, অথচ একজনও মানুষ, কী একটাও হাত তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করল না। প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করা দূরে থাকুক, একটা আঙুল পর্যন্ত নাড়াল না কেউই।

ভেসে যাচ্ছে, শুধু পুলিনবাবুর একার সংসারই নয়, পুরো একটা জাতের ভবিষ্যৎ; গত সাঁইত্রিশ বছর ধরে নিশ্চিত সর্বনাশের দিকে।

সময় নেই আর।

শুধু ভিক্ষা চাওয়ার জন্যেই পেতে-রাখা দুটি হাত নিয়েই বোধহয় জন্মেছিলেন পুলিনবাবুরা। ভগবানের কাছে ভিক্ষা, মালিকের কাছে ভিক্ষা, ভিনরাজ্যের ব্যাবসাদারদের কাছে ভিক্ষা, নিজের রাজ্যে, নিজের রাজধানীতে থেকেও তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকার ভিক্ষা, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ভিক্ষা।

তাঁদের উদাসীন গালে সকলেই চড় মেরে যায়। সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে, ভদ্রতার দোহাই দিয়ে থুথু গেলেন বাঙালি জাতের বুদ্ধিজীবীরা। তাঁরা সকলেই আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার প্রতিযোগিতাতে সদাই শামিল।

হাত কি পুলিনবাবুদের আদৌ আছে? বা ছিল? যে হাত প্রয়োজনে সোজা হয়ে ওপরে উঠে সত্যিকারের প্রতিবাদ করতে পারে? যে হাত, চড় মারতে পারে, যে হাত নিশ্চিত অন্যায়কারীর গলা টিপে ধরে, শ্বাসরুদ্ধ করে; তার দু-চোখের মণিকে ঠিকরে আনতে পারে?

পুলিনবাবুরা একে ঠুঁটো জগন্নাথের জাত।

কোয়ার্টার্সের দিকে ফিরতে লাগলেন তিনি। বাবুলাইনের পাশ দিয়ে। বাঙালি বাবুরা সবাই ঘুমোচ্ছেন এখনও। কে জানে, কখন ভাঙবে এঁদের ঘুম।

চিরঘুম পেয়েছে সকলকে।

চুনাওট এবং ইতোয়ারিন

ইতোয়ারিনকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই খুব জোরে দৌড়ে যাচ্ছিল উদ্‌বিগ্ন মুঙ্গলি। তার মোটা সস্তা নোংরা লাল শাড়িটা ফুলে ফুলে উঠছিল জোলো হাওয়ায়।

কালো মেঘে আকাশ আদিগন্ত ঢেকে ছিল। জুগগি পাহাড়ের ওপার থেকে বৃষ্টি-ভেজা হাওয়া ছুটে আসছিল দমকে দমকে দূরাগত বৃষ্টির ছাঁট বয়ে। একঝাঁক সাদা বক দূরের হোন্দা বাঁধের জলা থেকে উড়ে আসছিল সাদা কুন্দফুলের মালারই মতো দুলতে দুলতে।

এখানেও বৃষ্টি আসছে। মোরব্বা খেতের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে পাটকিলেরঙা একটা ধাড়ি খরগোশ দ্রুত দৌড়ে গেল মুঙ্গলির পায়ে পায়ে। ভিজে হাওয়ায়, নিমের ফুলের গন্ধ ভাসছে। একটা মস্ত গহুমন সাপ ধীরে ধীরে ঢুকে গেল উইঢিবির পাশের ইঁদুরের গর্তে। একবার নাক তুলে গন্ধ নিল ষোড়শী মুঙ্গলি জোলো হাওয়ায়। নিমফলের, খরগোশের এবং সাপের।

সুরাতিয়া দিদিদের খেতের বেড়ার এ-পাশের কদমবনে কদমফুল ভরে রয়েছে। তার গন্ধও ছিল হাওয়াতে। নানা রকম মিশ্র গন্ধ। ঝিম ধরে আসে তাতে।

একদিন ওই কদমবনের নীচে মুঙ্গলি কাড়ুয়াচাচার ব্যাটা পুনোয়ার সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণ খেলেছিল গত বছরের আগের বছর। হঠাৎই মনে পড়ে গেল ওর। এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাতে গিয়ে পুনোয়া পড়ে যাচ্ছিল বার বার। আর মুঙ্গলির কী হাসি!

সেই পুনোয়া গত বছর এমনই এক বর্ষার দিনে জুগগি পাহাড়ে মূল কুড়োতে গিয়ে গহুমন সাপের কামড়ে মারা গেছিল। মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়েছিল। নীল হয়ে গেছিল সারা শরীর। মনে পড়তেই, মনটা খারাপ হয়ে গেল মুঙ্গলির। ওদের জীবন এবং মরণ এমনই! কোনো জোয়ারভাঁটা নেই। মানুষ-মানুষীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গই আছে শুধু। একচল্লিশ বছর দেশ স্বাধীন হয়েছে অথচ দেশের অধিকাংশ মানুষই এই মুঙ্গলিদের মানুষের মর্যাদা দিল না।

অনেকদিন আসে না মুঙ্গলি এদিকটাতে। এই অবাধ্য অসভ্য ইতোয়ারিনটাই তাকে ছুটিয়ে নিয়ে এল ভুল করে, ভুল পথে; আজ এই ভেজা দুপুরে। এদিকে এলেই পুনোয়ার কথা মনে পড়ে যায়। আর মন খারাপ করে।

পিচের রাস্তা ধরে নিপাসীয়রা থেকে খুব জোরে পর পর তিন-চারটে ট্রাক ও একটা বাস সারি বেঁধে দৌড়ে আসছিল। ইতোয়ারিন তো কিছুই বোঝে না। বুদ্ধু একটা। যদি চাপা পড়ে মরে! সেই ভয়েই দিগ্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলেছে মুঙ্গলি। তার আঁচল এই দৌড়ে সরে যাওয়াতে তার নবীন পেলব মসৃণ স্তন দুটির বৃন্তে ভিজে হাওয়া সুড়সুড়ি দিচ্ছে। কিন্তু শাড়ি সামলাবার সময়ও আর নেই। ট্রাকগুলো আর বাসটা এসে পড়ল বলে। ইতোয়ারিনও উদোম টাঁড়টা পেরিয়ে গিয়ে প্রায় পিচ রাস্তায় ওঠার মুখে। সর্বনাশ হবে এখুনি।

প্রথম ট্রাকটার নীচে প্রায় পড়ে পড়ে ইতোয়ারিন, ঠিক এমনই সময়ে রাস্তার পাশের চাপ-চাপ নরম সবুজ ঘাসের ঢাল-এর মধ্যে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েই মুঙ্গলি জাপটে ধরল ইতোয়ারিনকে। তারপর দুজনে মিলে জড়ামড়ি করে গড়াতে গড়াতে ঢাল গড়িয়ে নেমে এল উদোম টাঁড়ে। হাঁটু গেড়ে বসে ইতোয়ারিনকে তার দু উরুর মধ্যে চেপে ধরে দু'হাতে ওর দু'কান ধরে আচ্ছা করে মুলে দিয়ে বলল, "ট্রাকোয়াকা নীচে যা কর আইসেহি এক রোজ মরেগি তু!"

ইতোয়ারিন ঘুচুক-ঘুচুক, ঘোঁতঘোঁত করে আওয়াজ করল মুঙ্গলির কথার জবাবে। সোহাগ জানাল। মাদি শুয়োরের সোহাগের রকমই আলাদা।

বেলুনের মতো পটাং করে ফেটে যাবি একদিন, তা বলে দিলাম।

আবার স্বগতোক্তি করল মুঙ্গলি। রাগের ও অনুযোগের গলায়।

কোনো উত্তর না দিয়ে ইতোয়ারিন ওর হেঁড়ে মাথাটা মুঙ্গলির উরুতে শুধু একবার ঘষে দিল আদরে।

মুঙ্গলি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল হঠ।

বলে, বস্তির দিকে রওনা হল। ইতোরিয়ান চলতে লাগল ওর পায়ে পায়ে। বন রাস্তা থেকে একটু ডান দিকেই লালমাটির কর্দমাক্ত রাস্তা বেয়ে কিছুটা গেলেই ভাঙ্গি বস্তি। মানে, ধাঙড়দের বস্তি। বস্তির লাগোয়া একটি তালাও। বর্ষার জল পেয়ে তিন ধার থেকে লালমাটি ধুয়ে এসে পড়েছে সেই তালাওতে। বছরের এই সময়টাতে যেই চান করুক সেখানে, মানুষ অথবা শুয়োর; তার গায়ের রং লাল হয়ে যায়। এই তালাওটিই ভাঙ্গি বস্তির প্রাণ।

তালাওর তিনপাশে জলের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে ঝাঁটি জঙ্গল এবং পুটুসের ঝাড়। কটুগন্ধ গাঢ় কমলারঙা ফুল এসেছে পুটুসের ঝাড়ে ঝাড়ে। পাড়টা উঠে গেছে তিনদিকে উঁচু হয়ে। তারপর জুগগি পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে মিশেছে সেই চড়াই।

এক সময়ে ঘন শালের বন ছিল এই চড়াইয়েই। সে বন গিয়ে মিশে গেছিল জুগগি

পাহাড়ের বনের সঙ্গে। ওরাওঁ মুন্ডারা তখনকার দিনে জেঠ-শিকারের পরবে ভালুক কুটরা অথবা হরিণ শিকার করত। কখনও কখনও শিয়াল, সাপ অথবা খরগোশও। মুঙ্গলি তখন শিশু ছিল। তবু স্পষ্ট মনে আছে।

জঙ্গল এখন আর নেই। কেটে সব সাফ করে দিয়েছে ঠিকাদাররা। ভাঙ্গি বস্তির কাছের দুই বস্তির লোকেরাও। বাড়ি বানাবার জন্যে। জ্বালানি কাঠের জন্যে। মুঙ্গলিরা নিজেরাও কেটেছে কিছু। এখন কিছু বুনো পলাশ, যাদের প্রাণশক্তি আর বাড় এই ভাঙ্গি বস্তির শুয়োরদেরই মতো; ঝাঁটি জঙ্গল এবং পুটুসই শুধু আছে।

দু-একটি খরগোশ, বুনো শুয়োর এবং কিছু বটের তিতির ওরই মধ্যে ইতিউতি ঘোরাঘুরি করে। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে অথবা বৃষ্টির ঠিক পরে এক আশ্চর্য নরম-হলুদ আলোয় বন-প্রান্তর ভরে যায় এবং সূর্য পাহাড়ের ওপাশে ডুবে যাওয়ার ক্ষণটিতে, মাথা তুলে, গলার শির-ফুলিয়ে বার বার ডেকে তারা জানান দেয় যে, তারা এখনও আছে।

বড়ো রাস্তাটা পিচের। মাঝে মাঝেই গড়হির অথবা নিপাসিরার দিকে মার্সেডিজ ট্রাক এবং সার্ভিসের বাস চলে যায় জেঠ-শিকারির তির-খাওয়া বড়োকা দাঁতাল-শুয়োরের মতো প্রচণ্ড জোরে গোঁ-গোঁ শব্দ করতে করতে।

রাস্তাটা ব্রিটিশদের আমলে বানানো। তখন অবশ্য পিচ ছিল না। লালমাটির রাস্তাই ছিল। কিন্তু পোক্ত ছিল। বর্ষায় ভাঙত না। চুরি হত না তখন সরকারি কাজে। মুঙ্গলি শুনেছিল, তার নানার কাছে।

রাস্তাটার দু'পাশে বড়ো বড়ো অনেক প্রাচীন গাছ ছিল। মেহগনি, শিশু, নানারকম কেসিয়া। কিছু জ্যাকারান্ডাও। সাহেবরাই লাগিয়ে গেছিল।

শুধু আশেপাশের বনের পাহাড়ের গাছ কেটেই মানুষের খিদে মেটেনি। এখন পথপাশের বড়ো বড়ো গাছগুলোর গা থেকে পুরু ছালও তার তুলে নিচ্ছে। তাই দিয়েই ফুলবাগ শহর আর গড়হির আর নিপাসিরা বাজারের হালুইকরেরা উনুন ধরায়। মানুষের মতো আগ্রাসী খিদে খুব কম জানোয়ারেরই আছে। শুয়োরের খিদেও হার মানে এই খিদের কাছে।

কোনো রকম বাছবিচার না করে শুয়োরগুলো সব-কিছুই খায়। মানুষের ময়লা থেকে, যা কিছুই মাটি কুড়িয়ে পায়। আর ওদের অন্য কাজ বংশ বৃদ্ধি করা। রাক্ষসের মতো সর্বক্ষণ খাওয়া আর রমণ করাই হল শুয়োরদের একমাত্র কাজ।

বড়ো বাস্তার বাঁদিকে মুসলমানদের মস্ত বস্তি আছে একটি। মাইলখানেক দূরে। ডানদিকেও আর একটি আছে। গিরিয়া পাহাড়ের নীচে।

ভাঙ্গি বস্তি থেকে পিচ রাস্তায় উঠলেই কয়েকটি দোকান। একটি পুরোনো পিপ্পল গাছের নীচে দোকানগুলো গজিয়ে উঠেছে। একটি মুদিখানা, পানবিড়ির দোকান; একটি চায়ের দোকান। তার সামনে শালকাঠের তক্তা দিয়ে খুঁটি পুঁতে বেঞ্চিমতো বানানো।

বৃষ্টিতে, রোদে ফেটেফুটে গেছে। তার ওপরে চা খেতে খেতে আড্ডা মারে ভাঙ্গি বস্তির মানুষে এবং ওই দুই বস্তির মানুষেও।

ওই দোকানগুলোরই উলটোদিকে টাঁড়ের মধ্যে দিয়ে লালমাটির পায়ে-চলা পথ চলে গেছে এঁকেবেঁকে। সেখানে কাহারদের বস্তি আছে। এই পিপ্পল গাছের উলটোদিকে কাহার বস্তিতে যাবার পথেই শুক্কুরবারে শুক্কুরবারে হাট বসে। হাটের নাম জুগগি হাট। শুঁড়িখানা আছে। হাটের দিনে ঢালাও মহুয়া খায় মুঙ্গলিদের বস্তির সকলে শালপাতার দোনায়। সারা সপ্তাহের রোজগার ওখানেই চলে যায়।

আগে হাট বসত রবিবারে রবিবারে। তবে শুক্কুরবারে "জুম্মা বার" বলে এবং এই এলাকা মুসলমান-প্রধান বলে গরিষ্ঠদের সুবিধার জন্যে রবিবারের বদলে আজকাল শুক্কুরবারেই হাট বসে। পঞ্চায়েত তাই ঠিক করে দিয়েছে।

ভাঙ্গি বস্তির ভগলু আর ফুলবাগের দিকের মুসলমান বস্তির গিয়াসুদ্দিনের বয়স হয়েছে প্রায় সত্তরের মতো। দুজনেই ব্রিটিশের হয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লড়াই করছিল। গিয়াসুদ্দিন লড়াই করেছিল বার্মাতে আর ভগলু মধ্যপ্রাচ্যে। যদিও তারা আলাদা আলাদা রেজিমেন্টে ছিল কিন্তু এখন অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু হয়ে গেছে। যুদ্ধে যখন যোগ দেয় তখন দুজনেই কিছুদিন একসঙ্গে ছিল রানিখেত ক্যান্টনমেন্টে। শিকারের দোস্তি, যুদ্ধের দোস্তি, একবার হলে, জীবনভর তা অটুটই থাকে।

চায়ের দোকানের আড্ডাতে বীরহানগরের প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারও সাইকেল নিয়ে আসে। থাকে বীরহানগরেই। ফুলবাগের পথে। এখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল পথ। বয়স হবে মাস্টারের কুড়ি-একুশ। সবে বি.এ. পাশ করেছে। অনেক খবরাখবর রাখে সে। চেহারাটিও ভারী সুন্দর। জাতে সে ভূমিহার। কিন্তু তার স্বভাবের জন্যে এ অঞ্চলের মুসলমান, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, চামার, ভোগতা, কোলহো, ওরাওঁ, মুন্ডা সকলেই ভালোবাসে তাকে। মুঙ্গলিও ভালোবাসে। মাস্টারকে দেখলেই মুঙ্গলির বুকটা ধকধক করে ওঠে। সারা শরীরে একটা অনামা ব্যাখ্যাহীন রিকিঝিকি ওঠে। এমনি আর কাউকে দেখলেই হয় না। তেমন রিকিঝিকির কথা শুধু মুঙ্গলির বয়সি মেয়েরাই জানে।

সেদিন বিকেলবেলা বীরহানগরের নবীন মাস্টার, নাম তার সরজু, প্রবীণ ভগলু আর গিয়াসুদ্দিনের সঙ্গে বসে চায়ের দোকানের সামনে আড্ডা মারছিল। দুপুরে খুব বৃষ্টি হয়ে যাবার পর এখন আকাশ পরিষ্কার। সন্ধে হতে দেরি আছে এখনও ঘণ্টাখানেক। মাস্টার নবীন বলেই এমন অনেক কিছুর খোঁজ রাখে, যা প্রবীণেরা আদৌ জানে না। আবার এই দুই প্রবীণ তাদের অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারে এত কিছুই জমিয়ে রেখেছে, যে নবীন মাস্টার হাঁ করে তাদের কথা শোনে। যৌবনের বিকল্প বার্ধক্য নয়। বার্ধক্যের বিকল্পও নয় যৌবন। যাদের শেখার ইচ্ছা ও মন আছে তারা একে অন্যের কাছে অনেকই শিখতে পারে।

সকলেই এক ভাঁড় করে চা খাবার পর ভগলু বুড়ো গিয়াসুদ্দিন বুড়োকে বিড়ি এগিয়ে দিয়ে বলে, বোলো ইয়ার।

॥ ২ ॥

ইতোয়ারিন মুঙ্গলির বড়ো আদরের মাদি শুয়োর। রবিবারে জন্মেছিল তাই তার নাম দিয়েছিল মুঙ্গলি, ইতোয়ারিন। ইতোয়ারিনের চার ভাই-বোন ছিল। তারা সবাই বিক্রি হয়ে গেছে জুগগির হাটে। এইবার পাল খাওয়াবে মুঙ্গলি। একপাল বাচ্চা। সম্পত্তি বাড়বে মুঙ্গলির। বাচ্চাগুলোকে বেচে দেবে জুগগির হাটিয়াতে কিন্তু ইতোয়ারিনকে বেচবে না।

মুঙ্গলি রোজ দিনশেষের আবছা অন্ধকারে, নিজে যখন তালাওতে চান করতে নামে, তখন ইতোয়ারিনকেও চান করায় নিজে হাতে। জলে নেমেই আশ্চর্য কায়দাতে সাঁতার কেটে তালাওর গভীরে চলে যায় ইতোয়ারিন। মুঙ্গলিও সাঁতরে গিয়ে তার পিঠে চড়ে। দুই অরক্ষিতা কুমারীর এই এক খেলা। একজন নারী। একজন শুয়োরী। শুয়োরী হলেও ইতোয়ারিনকে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে মুঙ্গলি। পোষা পাখির মতো। তারপর রাতের কাঁচামাটির সোঁদা-গন্ধ ঘরে ইতোয়ারিনকে কোলবালিশ করে মুঙ্গলি শুয়ে থাকে। মুঙ্গলির বাবা ঝড়ু ওকে বকে খুব। কিন্তু শেষমেষ থেমে যায়। মা-মরা মেয়ে। তা ছাড়া মুঙ্গলিও বা আর কতদিন থাকবে ঝড়ুর কাছে? মেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। অগেকার দিন হলে তো আট-নবছরেই বিয়ে হত। তারপর গওনা হলে শ্বশুরবাড়ি যেত। দিন পালটে গেছে। প্রতিদিনই পালটাচ্ছে দিন। তবু এবারে তার বিয়ে-থার কথা ভাবতে হবে। ভাবে ঝড়ু।

মুঙ্গলিও কানাঘুষোয় এসব কথা শোনে। গা-শিরশির করে বিয়ের কথায়, অনামা ভালো লাগায়। জীবনের এখনও অনেকই বাকি আছে। অনেক ভালো লাগা বাকি আছে এখনও। দারিদ্র্যই শেষ কথা নয়। দরিদ্রদেরও বড়োলোকি থাকে। এসব কথা শুনে মুঙ্গলির কেবলই সরজু মাস্টারের কথা মনে হয়। ওর বিয়ের কথা তাই উঠলে মনখারাপও লাগে। সরজুকেও তো মুঙ্গলি কোনোদিনও পাবে না।

মাইল সাতেক দূরের শহরের ফুলবাগ মিউনিসিপ্যালিটির জমাদার মোতির ছেলেকে ঝড়ুর পছন্দ। মোতি ঝড়ুর বন্ধুও বটে। অনেক দিনেরই বন্ধু। মোতির ছেলে জগনু এ বছরই মোতি রিটায়ার করলে মোতির জায়গায় চাকরি পাবে। কাজটা যদিও বাজে। এখনও খাটা-পায়খানা আছে অনেকই ফুলবাগ শহরে। নামেই শহর। ব্রিটিশদের সময়ে যেমন ছিল তা থেকেও অনেক ঘনবসতিপূর্ণ এবং নোংরা হয়ে গেছে। উন্নতি কিছুই হয়নি। অবনতিই হয়েছে। তবু ঝড়ু ভাবে, মরদের কাজের আবার খারাপ ভালো কী? যার যা কাজ। নিজেকে বোঝায় ওই সব বলে। তা ছাড়া কজন মানুষই বা কাজ পায়? পাঁচ বছর বাদ বাদ ভোটের আগের বক্তৃতা তো অনেকই শুনল। লাশকাটা ঘরের ডোমেদের কাজের থেকে তো এই কাজ অনেকগুণেই ভালো। সারাদিন খাটাখাটনি করে দুটি মকাই বা বাজরার রুটি আর হিং-দেওয়া খেসারির ডাল গরম-গরম খেতে যদি পায় মুঙ্গলির ভাবী স্বামী এবং মুঙ্গলি, তাই তো অনেক পাওয়া। বেশি লোভ নেই ঝড়ুর। তার মেয়ে মুঙ্গলি তো রাজরানি হবে এমন-আশা করে না সে।

॥ ৩ ॥

দুপুরবেলা।

এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

মাটি থেকে সোঁদা সোঁদা গন্ধ উঠছে।

মুঙ্গলি ইতোয়ারিনকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ইদগার দিকে চলে গেছিল। সারা বছর এই পুরো অঞ্চলটা ফাঁকাই পড়ে থাকে। দুই সম্প্রদায়েরই ভিখিরি, নেশা-ভাং করেনওয়ালারা হিন্দু এবং মুসলমানদের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, গোরু ছাগল চরে বেড়ায়। তবে শিশুকাল থেকে মুঙ্গলি দেখে আসছে যে ইদের আগে ও জায়গাটার চেহারাই যেন পালটে যায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। ঝাঁট দেওয়া হয়। সাজানোও হয়। সাদা চাদর পাতা হয় তিনদিকে দেওয়াল-ঘেরা জায়গাতে। ইমামসাহেব অথবা মোল্লাসাহেবের জন্যে উঁচু পাটাতন বাঁধা হয়। ভাঙ্গি বস্তির ডানদিক-বাঁদিকের দুটি গাঁয়ের মুসলমানেরা নতুন জামা পরে টুপি মাথায় চড়িয়ে ইদের নামাজ পড়তে আসে ইদগাহ্।

যখন ছোটো ছিল, একবার মুঙ্গলি তার বাবা ঝড়ুর সঙ্গে অনেকদিন আগে এসে বাবার হাত ধরে বড়ো রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখেছিল ইদের নামাজ পড়া। বড়ো হবার পর আর এদিকে আসে না ইদের দিনে। বস্তির বড়ো মেয়েরা বারণ করে দিয়েছে। কোনো মেয়েই আসে না হিন্দু বস্তির। মুসলমান মেয়েরাও আসে না। ওদের ধর্মে মেয়েদের অন্যরকম চোখে দেখা হয়।

প্রতি বছরই ইদের দিনে সন্ধেবেলায় গিয়াসুদ্দিন চাচা টিফিন-ক্যারিয়ারে করে বিরিয়ানি- পোলাও, মুরগির চাঁব আর ফিরনি নিয়ে আসে তার বন্ধু ভগলু নানার জন্যে। জাফরান দেওয়া বিরিয়ানির স্বাদ প্রতি বছরই পেয়ে আসছে মুঙ্গলি আর ঝড়ু, ভগলু নানার দয়ায়। বড়ো সোহাগভরে চেটেপুটে খায় ঝড়ু, ভগলু নানা আর ও। গিয়াসুদ্দিন চাচাও ওদের আনন্দ দেখে খুশি হয় খুব। বিরিয়ানিতে যে জাফরান দেয় তা নাকি আসে কাশ্মীরের উপত্যকা থেকে।

ইদগাহ্র ওপাশে একটি ছোটো মসজিদ আছে। মোল্লা রমজান হাজি থাকেন সেখানে। প্রতিদিন কাক ডাকারও আগে মসজিদে নামাজ পড়েন রমজান হাজি। তারপর দিনে রাতে বিভিন্ন প্রহরে। ওদের নামাজের ভাষা বোঝে না মুঙ্গলি অথবা মুঙ্গলিদের বস্তির অন্য কেউই। ভাষাটা উর্দু বোধ হয় নয়। হিন্দুস্থানের ভাষা নয়। গিয়াসুদ্দিন চাচারাও পুরো বোঝে কি না তা জানে না। তবে শুনতে বেশ লাগে। আল্লার প্রশংসা থাকে কি সেই সব নামাজে? কে জানে? ইদানীং মসজিদের সব দিকে লাউডস্পিকারও লেগেছে। ফুলবাগ, নিপাসিয়া, গড়হি সব জায়গার মসজিদেই। আজানের সময় বহু দূর দূর থেকে শোনা যায় তা মাইকের জন্যে। জুগগি পাহাড়ের পাদদেশে ধাক্কা মেরে আওয়াজ হাঁ-হাঁ করে ফিরে আসে।

পিপ্পল গাছের নীচের চায়ের দোকানে সেদিনও আড্ডা হচ্ছিল। গিয়াসুদ্দিন চাচা আসেনি সেদিন। সরজু মাস্টার বলল, বুঝলে ভগলুনানা, শোনা যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের পয়সাওয়ালা সব দেশ থেকে নাকি প্রচুর টাকা আসছে ভারতবর্ষে। আরবদের স্বপ্ন নাকি সমস্ত পৃথিবীকেই একটি মাত্র ইসলামিক রাষ্ট্র করে তোলা। প্লেন যারা ছিনতাই করল সেদিন সেই গেরিলারা বলেছিল না!

পাকিস্তান কি এই অঢেল টাকার লোভেই ইসলামিক রাষ্ট্র হয়ে গেল? বাংলাদেশও কি তাই হবে?

ব্যাপারটা ভালো নয়।

বলল, ভগলু নানা।

ভারতবর্ষকেও ইসলামিক রাষ্ট্র করে তোলার চক্রান্ত চলছে চারদিকে। বিদেশি রাষ্ট্রদের মদত তো আছেই। চোখ-কান খুলে না রাখলে একদিন বড়োই বিপদ হবে।

সরজু মাস্টার বলল।

তা কেন হবে। আর হবেই কী করে? ভগলুচাচা বলেছিল অবিশ্বাসের গলায়। হিন্দুস্থানের মধ্যেই পাকিস্তান হবে?

মুঙ্গলির বাবা ঝড়ুও সেদিন চা খেতে গেছিল। তাই জিজ্ঞেসও করেছিল ভগলুনানাকে। ঝড়ু, গাঁওয়ার সোজা লোক। লোখাপড়াও জানে না ও, নিজেই বলল ধ্যাত। তাও কখনও হয়! যেমন এখন আছি সকলে মিলেমিশে তেমনই থাকব চিরদিন।

সরজুমাস্টার বলেছিল, সবই হতে পারে!

ছোকরা সরজুমাস্টারের কথাটা কারওই ভালো লাগেনি।

॥ ৪ ॥

ইদগাহ্‌র চারপাশে বড়ো বড়ো গাছ। বেশিই তেঁতুল। পথের পাশে পিপ্পল ছাড়াও একটা বড়ো নিমগাছ আছে। কিন্তু ইদের নামাজ, গিয়াসুদ্দিন চাচারা কখনওই ছায়াতে পড়ে না। যেখানে একটুও ছায়া পড়ে না সেখানেই সার সার করে হাঁটু গেড়ে বসে সকলে নামাজ পড়ে। সাদা নতুন কাপড় বিছিয়ে দেয় নীচে।

নামাজ পড়তে কিন্তু হিন্দুদের পুজোটুজোর মতো আদৌ সময় লাগে না বেশি। নামাজের তিনটি ভাগ আছে। মুঙ্গলি তো শুনেছেই, দেখেওছে দূরে থেকে শিশুকালে। বড়ো বড়ো জায়গাতে ইমাম এবং ছোটো ছোটো জায়গাতে মোল্লাসাহেব কোরান থেকে কিছু পড়ে শোনান। তাকে বলে "খুটবা"। প্রত্যেকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে তা শোনেন। তাতে মিনিট পাঁচেক সময় যায় বড়ো জোর। তার পরেই সকলে একসঙ্গে দু'হাত তুলে "দুয়া" মাঙেন। এক মিনিট, কি দু মিনিট! তারপর নামাজ শেষ হয়ে যায়।

তারপর হিন্দুদের দশেরার মতো প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে কোলাকুলি করেন। এই বিরাদরি দারুণই ভালো। হাসিমুখে একে অন্যকে বলে "ইদ মুবারক"। প্রত্যেকের

বাড়িতেই সেদিন ভালো-মন্দ খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত থাকে। যার যেমন অবস্থা। কানে থাকে তুলোয়-মাখানো আতর।

মেয়েরা কেউই আসে না নামাজে। মেয়েরা সব কিছু থেকেই বাদ। এইটা ভেবেই ভারী খারাপ লাগে মুঙ্গলির। মুসলমানদের কাছে মেয়েরা মানুষ বলেই গণ্য নয় না কি? পর্দা আর বোরখার মধ্যেই থাকে কি আজীবন? দাসী বৃত্তি ছাড়া অন্য কোনো অধিকার কি মেয়েদের নেই? বাইরের পৃথিবী পুরোপুরিই বন্ধ কি ওদের কাছে? বেচারারা! যেহেতু ওই দুই বস্তির বড়ো মেয়েরা বাইরে একেবারেই আসে না, ওদের সুখ-দুঃখের কথা জানারও উপায় নেই কোনো মুঙ্গলিদের।

মুঙ্গলি ভাবে, ভাগ্যিস মুঙ্গলি, ভাঙ্গি ছাড়া অন্য গাঁয়ে জন্মায়নি। জন্মালে ও আত্মহত্যা করত। ওর স্বাধীনতাকে বড়োই ভালবাসে মুঙ্গলি। প্রাণ গেলেও এই স্বাধীনতা, এই ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ানো, এই বৃষ্টিতে ভেজা, জুগগি পাহাড়ের পায়ের কাছে বসে রোদ পোয়ানো, সেজেগুজে হাটে যাওয়া, শুক্কুরবারে শুক্করবারে; দুর্গাপুজো দেখতে যাওয়া ফুলবাগ শহরে, ঝুমরি-গিলাতে দশেরার মেলাতে গিয়ে গরম জিলাবি খাওয়া আর কাচের চুড়ি কেনা; এসব কিছুকেই ও কখনওই ছাড়বে না।

মেয়েদের পায়ের নীচে দাবিয়ে রেখে পুরুষদের যে "বিরাদরি" তার প্রতি মুঙ্গলির অন্তত কোনো শ্রদ্ধা নেই। কোটি কোটি এমন সব মেয়ের জন্যে দুঃখে মুঙ্গলির বুক ফেটে জল আসে।

এলোমেলো পায়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানো মুঙ্গলি হঠাৎ চোখ তুলে দেখল আকাশ আবার কালো করে আসছে।

মুঙ্গলি বলল, চল রে ইতোয়ারিন। ঘর লওট যাব।

ইতোয়ারিন সায় দিল।

বলল, ঘোঁতঘোঁত!

॥ ৫ ॥

আজ ইদ।

ট্রাকে করে বাসে করে, দলে দলে মানুষ আসছে দুদিক থেকে ইদগাহ্‌তে। অনেকগুলো মাইক লাগানো হয়েছে। পথের পাশে দোকান বসেছে অনেক। মেলার মতো দেখাচ্ছে দূর থেকে পুরো জায়গাটা। দোকানে নানারকম মিষ্টি বিক্রি হচ্ছে। ফল, মোরগা, আন্ডা। বকরির বাজার বসেছিল গতকাল। গোরু কাটা হয়েছে দু গ্রামেই। পিঁজরাপোলের গোরু নয়। নধর গোরু।

পুলিশ এসেছে এক ট্রাক। পাছে নামাজ পড়ার সময়ে নামাজিদের কোনোরকম অসুবিধে হয়, তাই। প্রতিবারই আসে নামাজ পড়ার ঘন্টাখানেক আগে। নামাজ পড়া শেষ হলে আবার ফিরে যায় কোতোয়ালিতে। পথের দোকানে চা-পান খেয়ে। চলে যাওয়া

তাদের উঁচু গলার গালগল্প চলন্ত-ট্রাক থেকে উড়ে আসে ভাঙ্গি বস্তির মনুষদের কানে।

মুঙ্গলির বাবা ঝড়ু সকালেই বলে গেছিল; বাড়িঘর সব পরিষ্কার করে রাখতে। ঝড়ু গেছে এক বোঝা শালপাতার দোনা নিয়ে ফুলবাগ শহরে বেচতে। ভাঙ্গি বস্তি নামেই ভাঙ্গি বস্তি। আজকাল ধাঙড়ের কাজ করে খুব কম মানুষই। সাহেবি "সিস্টেম" "কমোড" হয়ে গিয়ে ধাঙড়দের প্রয়োজন কমে গেছে। শহরের মানুষেরা নিজেরাই বা তাদের বাড়ির কাজের লোকেরাই কমোড পরিষ্কার করে নিতে পারে। অ্যাসিড পাওয়া যায় বোতলে। কোমোড পরিষ্কার করার। বাজারে নানা রকম ব্রাশ কিনতে পাওয়া যায় লম্বা-বেঁটে হাতলওয়ালা।

বাড়িঘর পরিষ্কার করতে বলে গেছে বাবা, কারণ কাল নাকি ফুলবাগ শহর থেকে মেহমান আসবে। তার ভাবী শ্বশুর।

শ্বশুর কেন? মুঙ্গলি নিজেকে শুধিয়েছিল। সেই মোতি না ফতির ছেলে যে, সে নিজে আসবে না কেন? যার সঙ্গে মুঙ্গলির সারাজীবন দুঃখে-সুখে ঘর করতে হতে পারে তাকে একবার চোখের দেখাও দেখবে না পর্যন্ত নিজে বিয়ের আগে? মুঙ্গলির কি কোনো ইচ্ছে-অনিচ্ছে নেই? বাবা কি তাকেও পরাধীন করে দিল?

আর মাস্টার? সরজুমাস্টার। কত কী জানে শোনে সে! একদিন মাস্টারের সঙ্গে একাই আলাপ করবে মুঙ্গলি। ঠিক করেছে মনে মনে। অনেক কথা বলবে তাকে। পলাশ বনে বসন্তদিনে একা একা চড়া-বেলায় ঘুরতে ঘুরতে কী বলবে তার মহড়াও দিয়েছে অনেকবার। কিন্তু বলা হয়নি কোনো দিনও। ধাঙড় বলে কি চিরদিন এই সমাজেই থাকতে হবে মুঙ্গলিকে? ভারী রাগ হয় মুঙ্গলির একথা ভেবেই। মাস্টারের মুখটা কেবলই বার বার মনে আসে। চান করার সময়ে, ঘুম আসবার আগে, স্বপ্নের মধ্যে, বৃষ্টির মধ্যে, জুগগি পাহাড়ের ঢালে ঝাঁটি-জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাক-ভেজা ভিজতে ভিজতে।

একটা বড়ো দীর্ঘশ্বাস পড়ে মুঙ্গলির। ও জানে যে এ স্বপ্নও ওর অনেক স্বপ্নেরই মতো সত্যি হবে না। মুঙ্গলি এও জানে যে, প্রত্যেক মেয়ের মনের মধ্যে যে-মানুষ থাকে তার সঙ্গে ঘর করার বরাত ভারতের সাধারণ মেয়েদের হয় না। কী হিন্দুর! কী মুসলমানের!

বাবা বলেছে, শুয়োরের মাংস নিয়ে আসবে গামারিয়ার হাট থেকে। আর ছোলার ডাল। আটাও আনবে কলে-পেষা। কাল ভালো করে রাঁধতে হবে মুঙ্গলিকে। ফুলবাগের মতি না ফতি, হবু শ্বশুর না ফসুর; তার জন্যে।

ইতোয়ারিনকে মুঙ্গলি বস্তির অন্য শুয়োরের সঙ্গে কোনোদিনই মিশতে দেয়নি। সে যে তার পোষা প্রাণ। তার সখী। আজেবাজে জিনিসও খেতে দেয় না। ওরা যা খায়, তার থেকেও একটু দেয়। তা ছাড়া, জঙ্গল পাহাড়ে বা টাঁড়ে এইজন্যেই তো সঙ্গে করে নিয়ে ফেরে রোজই যাতে ইতোয়ারিন, মূল খুঁড়ে খেতে পারে। মহুয়ার সময় মহুয়া, আমলকীর সময়ে আমলকী, আমের সময় জংলি আম।

তেঁতুল একেবারেই খেতে পারে না বেটি। মুখে দিলেই মুখ যা ভ্যাটকায়! হেসে বাঁচে না মুঙ্গলি দেখে!

মোরব্বার দড়ি দিয়ে সামনের খোঁটাতে ইতোয়ারিনকে সকাল থেকে ভালো করে বেঁধে রেখে যত্ন করে উঠোন নিকোচ্ছিল মোষের গোবর দিয়ে মুঙ্গলি। ঠিক সেই সময়ই ইদগাহ্ থেকে মাইকগুলো সব একসঙ্গে গমগম করে উঠল। মোল্লাসাহেবের গলা! এ তো "খুটবা" নয়। এ তো বড়ো উত্তেজিত ক্রুদ্ধ গলা। তার উপরে বিজাতীয় ভাষা। মরুভূমির গন্ধ আছে এই ভাষায়! কী ভাষা কে জানে? নামাজের এই অংশকেই তো "খুটবা" বলে। এর পরেই "দুয়া" মাঙার কথা। তারপরই নামাজ শেষ!

মাইকের আওয়াজ গমগম করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। "খুটবা" শুনতে শুনতেই হঠাৎ মাইকে একটা প্রচণ্ড শোরগোল উঠল। সেই শোরগোল, বিরক্ত ক্রুদ্ধ জনরব হয়ে অসংখ্য মাইকের মধ্যে দিয়ে অনেক জোরে ভেসে এল এদিকে।

পাশের ঘরের সুরাতিয়াদিদি চেঁচিয়ে বলল, আর রে। এ মুঙ্গলি! ইতনি হল্লাগুল্লা কওন চি কি?

মুঙ্গলির উঠোন নিকোনোর সামান্যই তখনও বাকি ছিল। তার হাতে গোবর।

বিরক্তির গলায় বলল, সে কওন জানে, কওন চি কি?

সুরাতিয়াদিদি বোধহয় ঘরের বাইরে গিয়ে শিমুলগাছটার নীচে কালো পাথরের স্তূপের উপরে গিয়ে উঠে দাঁড়াল, ব্যাপার কী তা ভালো করে দেখবার জন্যে গলা লম্বা করে। তার গলার অপস্রিয়মাণ আওয়াজেই বুঝল মুঙ্গলি। শিমুলতলিটা উঁচু। ওখান থেকে পিচ রাস্তা, মসজিদ আর ঈদগাহ্ সবই দেখা যায়।

পরক্ষণেই সুরাতিয়াদির আতঙ্কগ্রস্ত চিৎকার শোনা গেল, পুলিশয়কে মার দেল হো। পাখর ফেকতা হ্যায় ঢেরসা উনলোগোনে সব্বে মিলকর।

কাহে লা?

মুঙ্গলি শুধোল আরও বিরক্তি কিন্তু উদাসীনতারই সঙ্গে, ঘর নিকোনো শেষ করতে করতে।

ঘরের মধ্যে থেকেই শুধোল। সামান্য কাজ তখনও বাকি ছিল।

ম্যায় জানু ক্যায়সি?

উত্তেজিত গলায় সুরাতিয়াদিদি বলল।

এবার গোবর-হাতেই মুঙ্গলি বাইরে এসে শিমুলতলিতে সুরাতিয়াদিদির পাশে দাঁড়াল। দেখল, নামাজিরা ফটাফট পাথর মারছে পুলিশদের। পুলিশদের মধ্যে দুজন পড়ে গেল। অনেক পুলিশেরই মাথা ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে। লাল রক্ত। ফিনকি দিয়ে। তখন একজন পুলিশ রাইফেল ভিড়ের দিকে তুলে গুলি করল। গুড়ুম করে শব্দ হল।

সুরাতিয়াদিদি অত্যন্ত ভীত এবং আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বলল, ভাগ ভাগ। জলদি ঘর ভাগ যা, মুঙ্গলি।

বলতে বলতেই সুরাতিয়াদিদিও দৌড়োতে দৌড়োতে নামল নীচে। মুঙ্গলি কিন্তু তখনও দাঁড়িয়েই ছিল। পুলিশের সঙ্গে জনতার মারামারি কখনও দেখেনি আগে।

ততক্ষণে বস্তির মেয়েদের মধ্যে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। মরদরা কেউই নেই এখন বস্তিতে। একমাত্র বুড়ো রিটায়ার্ড বউ-মরা নিঃসন্তান ফউজি ভগলু নানা তার ঘরের সামনে মাটির দাওয়াতে বসে তখন দাড়ি বানাচ্ছিল মুখের সামনে আয়না ধরে। সেও গুলির শব্দ শুনে দৌড়ে এসে মুঙ্গলির পাশে দাঁড়াল।

এমন সময় হঠাৎ মুঙ্গলি দেখল, ইতোয়ারিন ওই ভিড়ের মধ্যে থেকে ভীষণ ভয় পেয়ে দৌড়ে আসছে লাফাতে লাফাতে ভাঙ্গি বস্তির দিকে। ইতোয়ারিন যে কখন মোরব্বার দড়ি ছিঁড়ে ওদিকে চলে গেছিল, টেরই পায়নি মুঙ্গলি। অন্যেও না। ইদের নামাজের জন্যে অনেকেই দোকানপাট বসেছিল ওখানে আজ। কিন্তু দড়িটা ছিঁড়ে বা গেল কী করে? মোরব্বা, মানে সিসাল-এর দড়ি।

মুঙ্গলি ভাবল, সাধে কি আর মুসলমানেরা শুয়োরকে হারাম বলে! শুধু হারামই নয়, ইতোয়ারিন একটি নিমকহারামও বটে। এত তাকে যত্ন করে রাখে তবুও খাবার লোভে গেল! হারামজাদি!

জলিদ আ। জলদি আ। আ। আজ তোর টেংরি তোড়ব।

চরম বিরক্তিতে চেঁচিয়ে উঠল ক্রুদ্ধ হতচকিত মুঙ্গলি। যদি পুলিশের গুলি বা পাথর লাগে ইতোয়ারিনের গায়ে, এই ভয়ে ও সিঁটিয়ে ছিল।

টেংরি ভাঙার ভয়ের চেয়েও রাইফেলের গুলির শব্দে অনেক বেশি ভয় পেয়ে ইতোয়ারিন প্রাণপণে থপথপ করে দৌড়ে আসছিল। পুলিশদের উপরে শয়ে শয়ে পাথর পড়ছিল তখন। নামাজ বন্ধ হয়ে গেছিল। এবারে আবার গুলির শব্দ হল পরপর কয়েকবার। পাথর-বৃষ্টির মধ্যে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে গুলি করছে পুলিশ।

ইতোয়ারিন বস্তিতে না পৌঁছোনো অবধি মুঙ্গলি অপেক্ষা করছিল। এমন সময় নামাজিদের ভিড়ের মধ্যে থেকে কয়েকজন আঙুল তুলে দেখাল ইতোয়ারিন আর মুঙ্গলির দিকে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই একদল মানুষ পাগলের মতো দৌড়ে এল ইতোয়ারিনের পিছু পিছু।

এক গালের দাড়ি কামানো, অন্য গালে সাবান নিয়ে ভগলু নানা আতঙ্কগ্রস্ত গলায় বলল, ভাগ বেটি। ভাগ যা সব্বে বস্তি ছোড়কর। তুরন্ত। ভাগ সুরাতিয়া! ভাগ মুঙ্গলি! সব্বে ভাগ।

কিন্তু অত তাড়াতাড়ি কি পালানো যায়?

যৎসামান্য সম্বল, তা সে যত সামান্যই হোক না কেন, তা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া অত সোজা নয়। মেয়েদের পক্ষে তো নয়ই। মুঙ্গলি প্রথমে নিজেদের ঘরের দিকে দৌড়ে এল। কিন্তু নিজেদের ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই একটি তীব্র আর্তচিৎকার শুনল ভগলুনানার। কী হল দেখতে না পারলেও বুঝল যে সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেল।

পরক্ষণেই রে-রে-রে করে শয়ে শয়ে নামাজি ভাঙ্গি বস্তির ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ল। পালাতে মেয়েরা এখনও পারল না।

মুঙ্গলির ওপরে অনেকগুলো দাড়ি-গোঁফওয়ালা পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ-ভরা রাগি, কামার্ত, কুৎসিত মুখ নেমে এল। নেমে এল অনেকগুলো হাত ওর সারা শরীরের আনাচেকানাচে। সরজুমাস্টারের মুখটা হঠাৎ ভেসে উঠল একবার এক ঝলক চোখের সামনে। তারপর মুহূর্তেই তার শাড়িখানি ফালাফালা করে ছিঁড়ে তাকে মাটির মেঝেতে চিত করে শুইয়ে ফেলল মানুষগুলো।

সুরাতিয়াদিদি তীব্র চিৎকার করে ককিয়ে কেঁদে উঠল। বলল, হায় রাম!

সুরাতিয়াদিদির বয়স হবে তিরিশ। ছেলেমেয়ে নেই কোনো। প্রতি ঘর থেকেই বিভিন্ন বয়সি নারীর আর্তচিৎকারে পুরো বস্তি খানখান হয়ে গেল। তালাও-এর জল ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। বাইরে থেকে শিশুদের আর্তনাদ।

তীব্র, তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে যেতে যেতে মুঙ্গলি শুনল একজন নামাজি ওকে বলছে, "হারাম ভেজিন থি নামাজ মে? শালি! হারামজাদি!"

দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে-যাওয়া একটি অবলা অবোধ যুবতি শুয়োরী ইতোয়ারিনের ওপরেই যে একটি বিশ্বব্যাপী-ব্যাপ্ত প্রাচীন ধর্মের পুরো সম্মান নির্ভরশীল ছিল, এই জটিল এবং অবিশ্বাস্য কথাটা মুঙ্গলির মোটা মাথায় কিছুতেই ঢুকছিল না।

হতভম্ব, স্তব্ধ হয়ে গেছিল ও।

॥ ৬ ॥

জ্ঞান যখন ফিরল মুঙ্গলির, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। রাত নেমে এসেছে। তার বাবা তখনও ফেরেনি। বস্তির অন্য পুরুষেরা যদিও ফিরে এসেছে। বস্তির বেশির ভাগ ঘরই আগুনে পুড়ে গেছে। মুঙ্গলিদের ঘরও। তার ভাবী শ্বশুর না ফসুর, মোতি না ফতির আসা হল না।

চোখ মেলে দেখল মুঙ্গলি যে, জুগগি পাহাড়ের নীচে ঝাঁটি-জঙ্গলভরা জমিতে শুয়ে আছে সে আরও অনেকের সঙ্গে। দুই পা রক্তে ভেজা। ভেজা শাড়ি। গায়ে অনেক জ্বর, বড়ো ব্যথা। ধাইমা তাকে কী সব জড়িবুটি করছেন। ধাইমাকে মানুষগুলো ছোঁয়নি। সাদা চুলের অশীতিপর বুড়ি।

ভগলুনানার উদার বুকটা কসাই-এর গোরু-কাটা ছুরি দিয়ে এফোঁড় করে দিয়ে গেছে ওরা। তার ওপর অন্য একজন পেটে একটা ছুরি ঢুকিয়ে মোচড় দিয়ে নাড়িভুঁড়ি সব বের করে দিয়েছে। শিমুলতলিতে শকুন পড়েছে ভগলুনানার ওপরে। শেয়ালে-শকুনে ঠুকরে খাচ্ছে সেই মৃতদেহ।

পুরুষেরা ছিল না বলেই প্রাণে বেঁচে গেছে। যদিও মানে মরে গেছে মেয়েরা। চতুর্দশীর রাত আজ। আলো আছে। সদরে লাশ-কাটা ঘরে যখন ভগলুনানাকে নিয়ে যেতে আসবে

পুলিশ তখন তার লাশের বোধহয় আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। বস্তির ছোটো ছেলেমেয়েদের মধ্যে দশ-বারোজনকে ওইভাবেই কুপিয়ে কেটেছে ওরা।

শকুন বসে আছে চাঁদভাসি আকাশের পটভূমিতে জুগগি পাহাড়ের ঢালে পলাশবনের ডালেও। চারধারে কান্না, বিলাপ আর আর্তনাদ।

মুঙ্গলির বাবা ফিরল হাতে শুয়োরের মাংস আর ছোলার ডাল নিয়ে ফুলবাগ থেকে হেঁটে। যানবাহন সব বন্ধ।

মুঙ্গলি শুনতে পেল, সরজুমাস্টার কথা বলছে দূরে পুরুষদের জটলার মধ্যে বসে। তার গলা স্পষ্ট শুনতে পচ্ছে মুঙ্গলি। বড়ো কষ্ট হতে লাগল ওর। বড়ো কষ্ট। পুজোয় লাগার আগেই দলিত, পিষ্ট, গলিত হয়ে গেল ফুল।

দশরথ চাচা বলল, মুঙ্গলি শুনল, শুয়োর ওদের কাছে "হারাম"। মুঙ্গলির ইতোয়ারিন যদি ঘুরতে ঘুরতে ওখানে না যেত...।

শুয়োরও তো ঈশ্বরের সৃষ্টি! মুঙ্গলি তা ইতোয়ারিনকে ইচ্ছে করে পাঠায়নি। সে গেলেও তো লাথ মেরে তাকে তাড়িয়েও দিতে পারত ওরা। তা হলেই তো মামলা মিটে যেত।

সরজুমাস্টার বলল।

না তা তাড়ায়নি। ওদের ধর্মে আঘাত লেগেছিল বলে...। হঠাৎ গিয়ে পড়া শুয়োরীর মতো একটা বদবু, সুরতহারাম মাদি জানোয়ার অতগুলো সুস্থ স্বাভাবিক এবং অসংখ্য শিক্ষিত মানুষকেও পাগল করে দিল! পুলিশদের না মেরে, সকলে পাথর মেরে ইতোয়ারিনকেও না-হয় মেরেই ফেলত! মুঙ্গলি না-হয় কাঁদত খুবই। আর কী হত? তা ছাড়া পুলিশদেরই বা মারল কেন?

কোনও যুক্তি.... কোনও যুক্তি কি?

পুলিশদের মারল, পুলিশেরা শুয়োরটাকে অ্যারেস্ট করেনি বলে। আটকায়নি বলে। ওদের ধারণা, পুলিশেরা চক্রান্ত করেই নাকি নামাজের মধ্যে শুয়োর ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এ চক্রান্তের মধ্যে ভাঙ্গি বস্তির মানুষেরাও ছিল।

দশরথ চাচা বলল।

সরজু মাস্টার বলল, ক্যা বাত!

দশরথচাচা বলল, ইতায়ারিনকে তো মুঙ্গলি বেঁধেই রেখেছিল। ইদের নামাজ তো আর ইদগাহ্‌তে এই প্রথম বারই হল না! এত বছর ধরে হচ্ছে। কোনোদিনও এমন ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটেনি। ওরা ভাবল কী করে যে, চক্রান্ত ছিল এর পেছনে? এত বদমেজাজ কীসের ওদের? ভাবে কী ওরা নিজেদের? মানুষ এমন অন্ধও হতে পারে? গিয়াসুদ্দিনচাচার মতো মানুষও তো সেখানেই ছিল! সেও কি বোঝাতে পারল না? এমন অবুঝপনা! ভাবা যায় না। সত্যিই ভাবা যায় না।

গিয়াসুদ্দিনচাচা পুলিশের গুলিতে মারা গেছে।

কে বলল?

সমস্বরে অনেকেই বলে উঠল অবিশ্বাসের গলায়।

সরজুমাস্টার বলল, হ্যাঁ, তাই।

ইসস! তাই?

স্তব্ধ হয়ে গেল সকলে।

হ্যাঁ। পুলিশেরা তো আর দেখে দেখে গুলি করেনি।

দশরথচাচা বলল, নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই করেছিল।

সরজুমাস্টার বলল, ভগলুনানা যেমন ওদের ছুরিতে ফালা-ফালা হয়ে গেছে তেমন গিয়াসুদ্দিনচাচাও পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা কতগুলো মাথামোটা ধর্মান্ধ লোকই চিরদিন লাগিয়ে এসেছে। কী হিন্দু, কী মুসলমান! আর তাতে মারা গেছে চিরদিনই ভগলু নানা আর গিয়াসুদ্দিন চাচাদের মতো ভালো, বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ, যুক্তিসম্পন্ন, বুদ্ধিমান, হৃদয়বান মানুষেরাই। এই হচ্ছে এই সবের নতিজা।

ওরে! এসব আলোচনা আস্তে করো। কে শুনে ফেলবে। তারপর পুলিশ এসে আমাদেরই ধরবে। গরিবের সহায় তো কেউই নেই।

ওদের মধ্যে থেকেই কে একজন বলল। অন্ধকারে তাকে ঠিক ঠাহর হল না।

ঝড়ু বলল, আবার যদি ওরা আমাদের কোতল করার জন্যে ফিরে আসে? কী হবে?

দশরথ বলল, আবার যদি আসে তবে আমরা তো আর মেয়ে নই, এসেই দেখুক না। আসোয়া, তিরধনুকগুলো? এসেই দেখুক। মেয়েদের একা পেয়ে যারা এমন করে যেতে পারে সেই মানুষগুলো কি মানুষ?

সব আছে হাতের কাছেই।

আসোয়া বলল।

দোষটা তো আসলে এই ভোটের কাঙাল বদমাশগুলোরই! বেয়াল্লিশটা বছর চলে গেছে। এখনও মুখ বুঁজে থাকব? ফিরে এসেই দেখুক না তারা!

সরজুমাস্টার বলল ঠিক বলেছ। স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে বাস করেও ন্যায্য কথা যদি না বলার সাহস থাকে তবে ওই শিমুলগাছে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলেই পড়ো ঝড়ুচাচা। প্রত্যেক অন্যায়েরই একটা সীমারেখা থাকে। সেই সীমান্তে অন্যায়কে যদি আটকাতে না পারি আমরা তবে আর কোনোদিনও সেই অন্যায়কে আটকাতে পারবে না। এমনিতেই অনেকই দেরি হয়ে গেছে।

ঝড়ু বলল, রিলিফ আসবে না সদর থেকে? এই বস্তির জন্যে?

দশরথ বলল, এসেছে তো।

কে যেন বলল, এ বস্তির জন্যে কিছুই আসেনি। রিলিফটিলিফ ওই দুই বড়ো বস্তিরই জন্যে। পাঁচ ট্রাক খাবারদাবার। এয়ার-কন্ডিশনড গাড়ি করে সামনে পিঁ-পিঁ পাঁ-পাঁ করে ট্যাঁড়া বাজানো এসকর্ট কার নিয়ে কালোমতো বদবু এম.এল. এ ধবধবে সাদা পোশাক

পরে এসে ওই দুই বস্তিতেই ঘুরে গেছেন, আশ্বাস দিয়ে গেছেন যে কোনো ব্যাপারেই কোনো চিন্তার দরকার নেই। পুলিশের যে কোতোয়াল ইদগাহ্‌তে ডিউটিতে ছিল তাকে ইতিমধ্যেই বরখাস্ত করা হয়েছে এবং শুয়োরের যে মালিক, একটি মেয়ে ধাঙ্গি বস্তির মুঙ্গলি, তার শুয়োর সুদ্ধ তাকে গ্রেফতার করা হবে। হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত জজসাহেবকে দিয়ে এই শুয়োরঘটিত চক্রান্তর গোড়া ধরে টান দেবার জন্যে বিচারবিভাগীয় তদন্তও করানো হবে। ট্রাক-ট্রাক ওষুধও এসেছে। লঙ্গরখানাও খোলা হয়েছে। গুলিতে আহতদের অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে গিয়ে সদরের হাসপাতালে ভরতিও করা হয়ে গেছে। মারা গেছে ন'জন। তার মধ্যে ন'জনই পুলিশের। আহত দশ। তার মধ্যে পুলিশের ছ'জন আর চারজন নামাজি।

মুঙ্গলিকে অ্যারেস্ট করবে। এম.এল. এ-র মতে মুঙ্গলিই এই দাঙ্গা বাধাবার মূলে। সত্যিই এস.পি নিজেই আসছেন অনেক ভ্যান পুলিশ সঙ্গে নিয়ে সদর থেকে। গাগারির পুলিশ চউকি নামাজিরা ইতিমধ্যেই আক্রমণ করে পুড়িয়ে দিয়েছে। অনেক পুলিশ মরেছে নাকি সেখানে।

পুলিশ হাতে রাইফেল নিয়েও মরে গেল? রাইফেল হাতে নিয়ে পাথর খেয়ে কী করে মানুষ মরে তা জানি না। এ আমাদের মহান ভারতবর্ষেই সম্ভব।

আর রে! হিন্দুস্থানের পুলিশের রাইফেলের ট্রিগার থেকে রাজনৈতিক নেতাদের আঙুলে। পুলিশেরা সব পুতুল। বহু জন্মের অনেক পাপ থাকলে তবেই কোনো ভদ্রলোক মহান ভারতীয় গণতন্ত্রে পুলিশের চাকরি করতে আসেন! পুলিশের চাকরিতে ঢোকার পর অবশ্য অনেকেই আর ভদ্রলোক থাকেই না।

রিলিফি আসেনি।

কেন আসবে?

ওখানে দুঃখেও সরজুমাস্টার হেসে ফেলে বলল, সে সব কোনো কারণই নয় আসোয়া। ওরাও মানুষ, আমরাও মানুষ।

তবে?

ঝড়ু বলল হতবাক হয়ে, তবে এই তফাতটা কেন? কীসের জন্যে?

হাঃ! চুনাওটতো এসে গেল! আর কত দেরি? ওই দুটি বস্তি মিলিয়ে যে পুরো ছ'টি হাজার ভোট! আর ঝড়ুচাচা, তোমাদের এখানে মাত্র তিনশো ভোট। শুয়োরদেরও যদি ভোট থাকত তা ধরেও। আর সেই ভোটের প্রত্যেকটি তো তোষণ-নীতির কারণে গদিতে-আসীন দলগুলোই পেয়ে আসছে চিরদিনই। গদি রাখতে হলে কোনো গদি-লোভীরই মুসলমানদের সলিড ভোটগুলি না পেলে চলে না.এই কাঁরডারি জেলাতে। তোমাদের জন্যে কাদের মাথাব্যথা আছে বলো? এখন ইতোয়ারিনের মতো শুয়োরীরাই এই দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তারাই এখানে দাঙ্গা বাধায়, ভোট আনে; অথবা ভাঙায়। রাজা-উজির বানায়।

মুঙ্গলি তার কানের কাছে ঘোঁতঘোঁত শব্দ শুনল একটা। হাত বাড়িয়ে গা ছুঁল ইতোয়ারিনের।

ইতোয়ারিনও তো জাতে মেয়েই! বে-ইজ্জত হওয়ার ভয়ে, সেও বুঝি তখনও থরথর করে কাঁপছিল।

মুঙ্গলি তার হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরল ইতোয়ারিনের। মুঙ্গলির মাথার ওপরে কালো আকাশের পটভূমিতে বাজে-পোড়া একটা শিমুলের ডালে ডালে শকুনগুলো অন্ধকারে অন্ধকারতর পিণ্ডর মতো বসে ছিল সার-সার সবুজ নীল তারাদের পটভূমিতে।

তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যে, তারাই বোধহয় এ দেশের হতভাগ্য মানুষদের শেষ অভিভাবক।

ক্রীড়াভূমি

ছোটোকাকা বললেন, ছাড়ো তো! কবে ঘি খেয়েছিলাম! এখনও আঙুলে তুড়ি বাজে না! তোমার হয়েছে সেই অবস্থা।

বাবা রাগ করলেন না। বললেন, তোরা তো সে কথা বলবিই! খেলাধুলো তুই কখনও করেছিলি যে এসব ঘটনার গুরুত্ব বুঝবি?

খেলাধুলো কি শুধু খেলার মাঠেই হয় বলে তোমার ধারণা? প্রতিযোগিতা জীবনের কোন্ ক্ষেত্রে নেই? আমাদের অফিসে কাজের ক্ষেত্রেও কি ল্যাং-মারামারি আর গায়ের জোরে নোংরামি করে জেতা নেই? জীবন মানেই প্রতিযোগিতা; লড়াই। অ্যান্ড নাথিং ইজ আনফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার।

তোরা তাই ভাবিস। লড়াই তো বটেই। যে কোনো খেলাই, যে-কোনো কাজই প্রতিযোগিতা। কিন্তু লড়াই আর স্পোর্ট-এর মধ্যে তফাত আছে। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই ওরকম করে জেতাকে জেতা বলে না।

কী তফাত?

তোকে বলে লাভ কী? বললেও তুই বুঝবি না। এই যে চাঁদু তোর ভাইপো গ্রেট ফুটবলার। সেও কি বোঝে স্পোর্টসম্যানশিপ কাকে বলে? ফুটবলে লাথি তো সেও মারে।

তোমার ছেলে চাঁদু তো গোলকিপার। ও লাথি মারবে কেন? অন্যের লাথিমারা বলকে ও বুকে জড়িয়ে ধরে আটকায়।

তোর সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। গোলকিপার বল ধরে, তারপরে কি লাথি মেরে মাঠের মাঝখানে পাঠায় না? ফুটবল খেলা আদৌ কি যায় বলে লাথি না মেরে?

পাশের বারান্দায় আমি স্কিপিং করছিলাম। আমার নাম কানে যাওয়াতে ওইটুকু শুনলাম কান খাড়া করে।

এবারে রিটার্ন ম্যাচে আমাদের 'নবযৌবন সংঘ' যদি ক্যামেরুনের টিমকে হারাতে পারে তবে যদুমোহন শিল্ডটা আমরাই পাব। চালকলের মালিক যদুবাবু টিভিতে ওয়ান-ডে ক্রিকেট দেখে দেখে চেগে গিয়ে তাঁর নিজের নামের শিল্ড খেলাতেও একটি "ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ" ট্রফি ও পাঁচশো টাকা ক্যাশ প্রাইজের বন্দোবস্ত করছেন। এই শিল্ডের প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ খেলাতে এবং ফাইন্যাল খেলাতে তো বটেই, উনি এই 'ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ' পুরস্কার দেবেন। যদুবাবু বলেন, "হিঃ হিঃ হোয়াট নাকিপুর থিংকস টুডে আই এফ এ থিংকস টুমরো।" কালকের রিটার্ন-ম্যাচেই প্রথম এই পুরস্কার দেওয়া হবে। সকলেরই ধারণা, যদিও আমি গোলকিপার, তবু ওই ট্রফি ও পুরস্কারটা আমারই হাতে আসবে। নলিনী আঢ্যর দোকানে ট্রফি তৈরি হয়ে গেছে। লোকে শুনলে হাসবে হয়তো কিন্তু আমি পরশুদিন গিয়ে নলিনীবাবুর দোকানের ক্যাশিয়ার রামতারণকে ভজিয়ে-ভাজিয়ে ট্রফিটি দেখেও এসেছি। ছোট্ট হলেও সলিড রুপোর তৈরি। যদুমোহনবাবুর টাকমাথা সমেত একটি এমব্লেম রুপোর ওপরে ফোটানো হয়েছে। পালিশকরা কালো কাঠের ফ্রেমে সেই ট্রফিটি বাঁধানো। পাঁচশো টাকা হাতে পেলে কী কী করব তাও মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি। মাকে একটি ভালো ধনেখালি লালপেড়ে শাড়ি কিনে দেব। বাবাকে সুনীল গাভাসকারের বইটি। ছোটো বোন বুঁচিকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁচটি বই। অনেকদিন আগেই লিস্ট ধরিয়ে দিয়েছে আমাকে। কিন্তু অতগুলো বই কিনে দেবার সামর্থ্য ওর বেকার দাদার ছিল না। এবার হবে। ম্যাচের পরদিনই খুব বড়ো চিতলের পেটি কিনে আনব। মাকে বলব ধনেপাতা কাঁচালংকা দিয়ে বেশি করে তেল ঢেলে জম্পেশ করে রাঁধতে। বাবার সামান্য পেনশানের টাকাতে চিতলমাছের পেটি খাওয়া যায় না। আমারই মতো, বাবাও খুব ভালোবাসেন চিতলের পেটি। তেলওয়ালা। বাবা তো বলেন, চিতল খেলে এমন পেটিই খেতে হয়, মানে এমনই তেলওয়ালা, যে খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হার্ট অ্যাটাক। তবে না চিতল!

পাঁচশো স্কিপিং করার পর দুশোবার বেন্ডিং ও টো-টাচিং করে চান করতে গেলাম আমি। টিনের চালের বাথরুমে চটরপটর শব্দ করে বৃষ্টি পড়ছে। যতেদের বাড়ির পাশের মাঠে জল জমেছে। বড়ো বড়ো হলুদ ব্যাং ডাকছে ঘ্যাঙরঘ্যাঙর করে। মা খিচুড়ি চাপিয়েছেন মুগের ডালের। ছোটোকাকা খেয়ে তারপরই আসানসোলে ফিরে যাবেন রাতেই। খিচুড়ির গন্ধে সারা বাড়ি ম-ম করছে।

যা বৃষ্টি হচ্ছে গত এক সপ্তাহ ধরে যে মাঠে গোলপোস্টের সামনে পা রেখে দাঁড়ানোই মুশকিল। পরশু খেলা। তাই পুটুদা কাল প্র্যাকটিসে ডেকেছেন সকলকেই। বেলা তিনটেতে। ক্যামেরনের টিম প্র্যাকটিস করবে সকালে। একই মাঠে। ওদের টিমের প্লেয়ারদের বুট, হোস, অ্যাংক্লেট, নীকাপ, জার্সির চেহারাই আলাদা। ক্যামেরন বিরাট কোম্পানি। তাদের বড়োসাহেব পাঞ্জাবি। চাড্ডাসাহেব নিজেই উড়ে আসছেন দিল্লি থেকে প্লেনে কলকাতা এয়ারপোর্ট, সেখান থেকে সোজা গাড়িতেই আসবেন এখানে।

সার্কট-হাউসে ক্যামেরনের প্লেয়ারদের সঙ্গে লাঞ্চও খাবেন তিনি। কানাঘুষো শুনছি যে যদি ওদের টিম এবারে জেতে তবে প্রত্যেক প্লেয়ারকে নাকি হাজার এক টাকা করে দেবেন। ভদ্রলোক ছেলেবেলায় কিছুদিন কলকাতায় ছিলেন। তাঁর বাবার একটি স্পোর্টস-গুডসের দোকান ছিল নিউ মার্কেটে। সেই থেকেই ফুটবল-প্রেমিক তিনি।

যদুমোহন শিল্ড-এর প্রচণ্ড নামডাক আছে, এই অঞ্চলে। এই শিল্ডে কলকাতার ভালো ভালো সেকেন্ড ডিভিশান টিম নিয়মিত খেলতে আসে। তাই এই শিল্ড পাওয়া খুব প্রেস্টিজের ব্যাপার।

বাইরের ঘরে গিয়ে দেখি ছোটোকাকা নেই।

কোথায় গেলেন? ছোট্‌কা?

ইলিশমাছ কিনতে গেছে। খিচুড়ির সঙ্গে আমাদের খাওয়াবে। তোর মাকে বলে দে গিয়ে। বেশি পদ যেন না করে। মিছিমিছি অপচয় হবে। আজ মাসের তেইশ তারিখ। মনে রাখতে বলিস।

একটু চুপ করে থেকে বাবা আবার বললেন, কলকাতায় সেনসাহেবের কাছে চিঠিটা নিয়ে যা না একবার। ওঁদের কোম্পানিতে চাকরি করে দেবেনই একটা। আমাকে খুবই সম্মান করেন। আমার কথা ফেলবেন না। তা তোর সময় হল কই? পেনশানের এই ক-টা টাকাতে চারজনের পেট কি চলে? শুধু খেলা নিয়েই মেতে আছিস।

আমি হাসলাম। বললাম, আজকালকার খেলা আর তোমাদের সময়কার মতো খেলাই শুধু নেই। দ্যাখোনা, এবার যদি 'নবযৌবন সংঘ' জেতে তো আই-এফ-এর লিগে আর শিল্ডে খেলার জন্যে ডাক পাব নিশ্চয়ই কোনো ফার্স্ট ডিভিশান টিমের কাছ থেকে। সেখানে একটু ভালো খেলতে পারলে রেইলওয়েজ, বা কাস্টমস, বা টাটা কোম্পানি চাকরি দিয়ে ডেকে নেবে। না হলেও শুধু খেলেই তো কত ফুটবলার আজকাল গাড়িবাড়ি করেছে। খেলা আর সে খেলা নেই। দারুণ পয়সার ব্যাপার হয়ে গেছে। লুক্রেটিভ প্রফেশান।

সেইটেই তো হয়েছে সর্বনাশের মূল। ছোটকা বলছিল সাহিত্যও নাকি আজকাল দারুণ পেইয়িং ব্যাপার হয়ে গেছে। ওর নতুন কবিতার বই বেরিয়েছে। নাম "আমি কবি"। আমাকে উৎসর্গ করেছে। ওটা দিতেই তো এসেছে আজ। অথচ আমাদের সময়ে তোর ন'মামা তো সাহিত্য করতে গিয়েই না খেয়ে মরল। ন'বউদি বলতেন না, যে শুধু ফুলের মালা নিয়ে এলে কী হবে? টাকা মালা আনতে পারতে তো বুঝতুম। কী তুমি করলে জীবনে!

তা জানি না। কিন্তু এখন ন'মাইমাও ন'মামার লেখা বইয়ের ওপরেই মাসে হাজার টাকার মতো রয়্যালটি পান। ন'মামার মৃত্যুর পঁচিশ বছর পরও। চিন্তা কোরো একবার। এটা কি খারাপ?

তা পান। কিন্তু যতদিন খেলায় টাকা ছিল না, লেখায় টাকা ছিল না এত ততদিনই

খেলাটা ছিল, সাহিত্যও সাহিত্য ছিল। আসল বাপারটাই আজকাল চলে গেছে। খেলা, লেখা ও সবের সঙ্গে পাটের ব্যাবসা বা তেলের ঘানির কোনো তফাত আর নেই। সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে টাকা। আরও টাকা। আমাদের সময়কার সামাদ, উমাপতি কুমার, গোষ্ঠ পাল, করুণা ভট্টাচার্য, মনা দত্ত, মনা গুহরা যা সম্মান পেয়ে গেছেন; শরৎবাবু, মানিকবাবু, বিভূতি বাঁড়ুজ্যেরা যে সম্ভ্রম তাঁদের কবজির জোরেই আদায় করে নিয়েছেন আমাদের কাছ থেকে, তা কি আজকের খেলোয়াড় বা সাহিত্যিকরা পান? না পাবেন? স্পোর্টসম্যানশিপ নেই খেলার মাঠে। ভাবলেও কষ্ট হয়।

কীসের কষ্ট?

হাতে মস্ত একটা ইলিশমাছ ঝুলিয়ে নিয়ে ছোটকা ঘরে ঢুকেই বললেন।

আমি মাছটা নিলাম ওঁর হাত থেকে। রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে শুনলাম বাবা বলছেন ছোটোকাকাকে, জাল হয়ে গেছে সব কিছু। সব দু'নম্বরি কারবার।

মার হাতে ইলিশমাছটা দিতেই মা বললেন, পচার মাকে ডেকে দে। বাসন মাজছে। আস্ত মাছ কাটাকুটি করবার ঝক্কি কে পোয়াবে এখন বল তো? আর শোন। তোর বাবা-কাকার গল্প না শুনে রিংকিদের বাড়ি থেকে বুঁচিকে ডেকে নিয়ে আয়। আর ওকে বলিস ওদের বাড়ি থেকে দুটো ডিমও চেয়ে আনতে। তোর ছোটকা এতবড়ো মাছ আনল, ওকে একটা ওমলেট তো বানিয়ে দিতে হয়।

॥ ২ ॥

রাইট উইংগার রাজেন, লেফট উইংগার গজা এবং সেন্টার ফরোয়ার্ড জয়ধ্বজ পেনাল্টি বক্সের মধ্যে দাঁড়িয়ে সমানে কিক করে যাচ্ছে। নয় নয় করেও জনা পঞ্চাশেক ছেলে এবং পাঁচজন মেয়ে এসেছে। মধুসূদন এবং মৃণালিনী কলেজ এবং স্কুল থেকে। প্র্যাকটিস দেখতেই। যদিও কাদাতে পা রাখতে পারছি না আমি তবুও এই অবধি একটিও গোল করতে পারেনি ওরা কেউই। আজ আমার শরীরে চিতাবাঘ ঢুকেছে এসে একটা। কাদামাখা পিছল বলটাকে আসুরিক অথবা ঐশ্বরিক শক্তিতে পাঞ্চ করে বুকে এবং কোলে জড়িয়ে ধরে এক একটা মিথ্যে গোল বাঁচাচ্ছি আমি আর মৃদু গুঞ্জরন উঠছে জমায়েত-হওয়া দর্শকদের মধ্যে।

আমাদের টিম ম্যানেজার রাধুদা আগে যাত্রা কোম্পানির মালিক ছিলেন। উনি শুধু মর‍্যাল আর ফিনান্সিয়াল সাপোর্টই দেন। অন্য সব ব্যাপারে পটুদাই সব। রাধুদা নিজেও "কংস"র পার্ট করতেন। তার হাতে এমন এমন উত্তেজনার সময়ে ক্লারিয়োনেট থাকে একটি। রাধুদা আমার সাফল্যের উত্তেজনায় মাঝে মাঝে দুহাতে ক্লারিয়োনেট তুলে ধরে বাজিয়ে দিচ্ছেন। যাত্রাদলের বিবেকের গান। খেলার মাঠেও কি বিবেকের ভূমিকায় দরকার পড়েছে আজ কাউকে? রাধুদাকে পুরোনো লোকেরা রাধু বলে ডাকে না, বলে অধিকারী। যাত্রা দলের পরিচয়টা এখনও রয়েই গেছে তাঁর শিশুকালে পূর্ববঙ্গে ফেলা-আসা জমিদারিরই মতো।

এক-একটা শট যে আমি সিংহবিক্রমে বাঁচাচ্ছি তাতে কিন্তু আমার নিজের বাহাদুরি বিশেষ নেই। পাঞ্চ করার সময়ে আসলে আমি আমার বাবাকে "বিশেষ সম্মান" করা সেনসাহেবের মুখেই ঘুসি মারছি। আমাকে পাঁচদিন ঘুরিয়েও চাকরি দেননি ভদ্রলোক। বলেছেন, বাঙালিদের চাকরি দেয় না কেউ। কোম্পানি এখন নামেই সাহেব কোম্পানি। মাড়োয়ারি কিনে নিয়েছে বহুদিন। কোনো কোনোবার বলটাকে কোলের মধ্যে ধরে ফেলেই সজোরে লাথি মারছি তাতে। পাঠিয়ে দিচ্ছি মাঝ-মাঠে। মস্ত কালো ঝকঝকে মার্সিডিজ গাড়ি থেকে নামতে-দেখা, সেনাসাহেবের বস-এর একমুহূর্ত-দেখা মুখেও মারছি লাথি মাঝে মাঝে। বাবাকে সব কথা বলিনি। বাবার সঞ্চয় বলতে এখন গর্ব ছাড়া, অতীতের স্মৃতি ছাড়া বিশেষ কিছুই আর নেই। বাবার জন্যে খুব কষ্ট হয় আমার।

ছ'টি বল নিয়ে একসঙ্গে চেষ্টা করেও ওরা কেউই যে একটাও গোল দিতে পারছে না তার পেছনে আমার কৃতিত্ব সিঁদুর-টিপ-পরা, সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুর মাখা আমার মায়ের মুখখানির। মলিন, চিন্তিত, ক্লিষ্ট সে মুখ সবসময়। জয়ধ্বজ একটা দারুণ শট করল। অ্যাঙ্গুলার শট। লোকে বলে ওর পায়ে জাদু আছে। ও পায়ের কাজ দিয়ে স্পিন-বোলারদেরও লজ্জা দিতে পারে। কিন্তু সেই শর্টও আমি আটকে দিলাম। সকলেই হাততালি দিল। আমি অজেয়। হাততালি যারা দিচ্ছে তারা কেউই জানে না যে আসলে যে-মানুষ বলটাকে এইমাত্র আটকাল সে আমি নই, আমার আদরের একমাত্র ছোটো বোন বুঁচিরই মুখটি। বাবা যাকে মাধ্যমিকের পর আর পড়াতে পারেননি। অথচ হাই ফার্স্ট-ডিভিশন পেয়েছিল। গান শিখতে চেয়েছিল সে শান্তিনিকেতনে ভরতি হয়ে। সংগীত-ভবনে। কিছুই হয়নি। আমাদের পাড়ার বড়োলোকের বখা ধুমসো অশিক্ষিত ছেলে নদে ওকে লাইন করার চেষ্টা করছে। আমার গোল খাওয়ার সঙ্গে আদর্শবাদী, স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষের দিকে জেল-খাটা আমার বাবা, আমার শান্তশ্রী সম্পন্না মা, আমার আদরের ছোটো বোনের ভবিষ্যৎ, ভাগ্য সবই ওই কাদামাখা বলটার গায়ে কাদারই মতো মাখামাখি হয়ে আছে। এই ম্যাচে 'নবযৌবন সংঘ'র জেতার চেয়েও বড়ো কথা আমার নিজের সম্মানের জেতা। এই ম্যাচ যতটা ক্লাবের সংকট তার চেয়েও বেশি আমার অস্তিত্বের সংকট। আমাদের উইঙ্গার আর সেন্টার ফরোয়ার্ডেরা ক্যামেরনকে গোল দিয়ে টিমকে জেতাতে পারে কি না পারে তাতে আমার বিন্দুমাত্রই এসে-যায় না। আমার স্বার্থ, টিমের স্বার্থের ওপরে। কাল আমার একটিও গোল খাওয়া চলবে না। 'ম্যান-অফ-দ্য মাচ' আমাকেই হতে হবে। খেলা দেখে চাড্ডাসাহেব হয়তো ক্যামেরনেই আমাকে চাকরি অফার করবেন। করলেই চলে যাব। চুলোয় যাক 'নবযৌবন সংঘ'। টিম স্পিরিট বলে কোনো কথা আজ আর নেই। বেঁচে থাকা আমার কাছে এখন ভীষণই জরুরি। শুধু আমার একার বেঁচে থাকাই নয় আমার এখনও গর্বিত রিটায়ার্ড বাবার, ছেঁড়াশাড়ি পরা মায়ের এবং আমার সহোদরারও। বাবাদের দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন জীবনের সব ক্ষেত্রেই— সে খেলাই হোক, আর গান-বাজনাই হোক, কি সাহিত্যই হোক সাফল্য আর আর্থিক সাচ্ছল্য অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গেছে। ভালো থাকা, সুখে থাকা, একটা মোটরসাইকেল,

বাবা-মায়ের অবসর বিনোদনের জন্যে একটি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভি, বুঁচির জন্যে একজন ভদ্র, মোটামুটি মাইনের পাত্র— এই আমার খেলাধুলোর উদ্দেশ্য। আমার স্পোর্ট। স্পোর্টসম্যানশিপ-এর দিন আর নেই। ওসব কেতাবি বুলি। মিথ্যে কথা। আর্ট যেমন জন্মায় সুপারফ্লুয়িটি থেকে, স্পোর্টসম্যানশিপও তাই। পেটে খিদে নিয়ে স্পোর্টসম্যান হবার মতো মহত্ত্ব আমার নেই। বাবার মতো রিটায়ার্ড, সেনাইল মানুষদেরই অ্যাকাডেমিক ডিসকাশনের বিষয় ওসব। নবযৌবন নয়, ক্যামেরন দিয়েই আমার সাচ্ছল্যের শুরু হোক। তারপর ভালো খেলতে পারলে কোনোদিন যে টাটারাও ডেকে নেবে না আমাকে তা কে বলতে পারে? সত্যি কথা বলতে কী ক্যামেরনের কোনো দালাল যদি এসে পাঁচ-দশ হাজার টাকা কবুল করে যেত তবে গোল ছেড়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। ফার্স্ট ডিভিশানের কোনো-কোনো ম্যাচে নাকি এই খেলাও চালু হয়ে গেছে। আত্মসম্মানজ্ঞান, সততা এসব জোলো কথা। গত চল্লিশ বছরে মানুষ অনেক 'চালাক' হয়ে গেছে। খেলা আর খেলা নেই আমার কাছে, জীবনের সমুদ্রে এই আমার বেঁচে থাকার ভেলা।

প্র্যাকটিস শেষ হতেই রাধুদা আবার ক্লারিয়োনেটে সুর ধরল। একটি মেয়ে বলল তার সাথিকে, কী গানের সুর বলতো? তার সাথি বলল "জয়যাত্রায় যাও গো। ওঠো ওঠো, জয়রথে তব, জয়যাত্রায় যাও গো।" কথাটা শুনে গর্ব হল আমার। কিন্তু ন'মামার মতো আমি খালি পেটে গর্ব-চিবিয়ে বাঁচতে চাই না। টাকা চাই টাকা।

আমাদের টিমের স্টপার মাধো এসে আমার কাদামাখা নীল জার্সির কাঁধে এক বিরাশিসিক্কার থাপ্পড় কষিয়ে বলল, লা-জওয়াব মাইরি গুরু। কোন শালা গোলে মাল গলায়, তুই থাকতে? ক্যামেরনের বাপের নাম খগেন করে ছেড়ে দিবি তুই! তবে গুরু স্রেফ একটাই কথা।

কী?

ক্যামেরনের রাইট-উইগার বিষ্ণুকে একটু চোখে চোখে রাখিস। বর্ধমান-উইনিভার্সিটির সেরা ছাত্র সে শালা, আবার সেরা খেলোয়াড়। তার উপর বেদম বড়োলোকের ছেলে। শালা একেই বলে, "খোদা যব দেতা, ছপ্পর ফাড়কে দেতা।" ওর গোল ঠেকানো কিন্তু চাট্টিখানি কথা নয়। জয়ধ্বজ যদি মুনিন্দর সিং তো ও হচ্ছে তৌসিক আহমেদ। তৌসিক আহমেদ হাতে যা করে, বিষ্ণু লাহিড়ি পায়ে তাইই করে। ফুটবলারের লাথি মারা বলের অ্যাঙ্গল এবং ফ্লাইট, ক্রিকেটার গাভাসকার আর শ্রীকান্তদের ঘোল খাইয়ে দেবে। যেমন ড্রপশট মারে, তেমনই হেড করে। আর কী ব্যাকভলি! কেচাইন। আমি গত সপ্তাহে বর্ধমান গিয়ে ওর খেলা দেখে এসেছি। বড়োলোকের একমাত্র ছেলে, শালার কী দরকার ছিল বলো তো গুরু আমাদের পিছনে লাগার? খেললে আমাদের একটা হিল্লে হয়। খেলাটা আমাদের কাছে বাঁচামরার ব্যাপার। ওর কোনো অভাব নেই। খেলাফেলার কী দরকার ছিল কে জানে! এত পেয়েও সাধ মিটল না। এই খেলার লাইনে গুঁতোগুঁতি করতে এল কেন বলো তো মাইরি! ক্যামেরনের সে চাকরিও করে ন। শখের খেলোয়াড়।

আমি জার্সি খুলে ফেলে, মাঠে বসে পা থেকে হোস ও বুট খুলছিলাম। মাধোর কথার উত্তর দিলাম না কোনো।

মাধো বলল, তবে আমার নামও মাধো চৌধুরি। এমনিতে ঠেকাতে না পারলে আমার মোক্ষম পেটো ঝাড়ব। আমাদের মাথার ওপরে চড়ে থাকবে সেটি হতে দিচ্ছি না।

আমি তবুও কথা বললাম না।

মাধো বলল, বাড়ি যাবি না? সাইকেল আছে আমার।

বললাম, তুই এগো। আমি নুরপাড়া একবার হয়ে যাব।

তা হলে আমি চলি! বলে, মাধো খেলার পোশাক পরেই কাদার মধ্যে সাইকেলের টায়ারে পিচির-পিচির আওয়াজ তুলে চলে গেল। মাধোদের পারিবারিক ব্যাবসা দাদের মলমের। যতদিন দাদের চুলকুনি থাকবে মাধোদেরও অভাব থাকবে না কোনো। বিষ্ণু সম্বন্ধে যে-সব কথা ও বলে গেল তা আসলে ও আমাদের অবস্থার কথা জানে বলেই। বিষ্ণুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে গেল আমাকে। যাতে আমি জান দিয়ে ওকে ঠেকাই। বড়োলোকের ছেলে আছ আছ, আবার ভালো খেলোয়াড়ও হবার শখ কেন? এমনই ভাব একটা। সকলেই একে একে চলে গেল। বুঁচির বন্ধু অঞ্জলি যাওয়ার আগে একবার কাছে এল। বলল, কাল ভালো করে খেলো কিন্তু চাঁদুদা। দাদার সঙ্গে বাজি ধরেছি আমি।

কী বাজি?

তুমি একটাও গোল খাবে না।

কেন?

তোমাকে সকলে ভালো বললে গর্বে আমার বুক ফুলে ওঠে।

কেন?

কী জানি? এমনিই। যাই এখন।

মেয়েটা বোধহয় ভালোবাসে আমাকে। ভালোবাসার অনেক রকম হয়। কিন্তু আমার যোগ্যতা নেই কাউকেই ভালোবাসার।

নুরপাড়ায় পিরের দরগা আছে। পিঠে কিটব্যাগ আর কাদামাখা বুট ফিতে বেঁধে ঝুলিয়ে বাদার দিকের নির্জন পথ দিয়ে গিয়ে পৌঁছে তাগা বাঁধলাম একটা। মোমবাতি সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিলাম। সেটাও জ্বালালাম। কাছেপিঠে কেউই ছিল না। পিরের কাছে অনেক করে প্রার্থনা করলাম যেন কাল একটাও গোল না খাই এবং ক্যামেরন যেন চাকরির অফারটা দেয়। গোল না খেলে "ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ" আমিই হব— সে বিষয়ে কারও কোনো সন্দেহ ছিল না। গোলকিপার হিসেবে আমার খ্যাতি পুরো বর্ধমান জেলার লোকেই জেনে গেছিল। ওই বিষ্ণু না কে, সেই ছেলেটিই প্রধান সমস্যা এখন। তার খেলা দেখিনি। এই সিজনেই প্রথম খেলছে। ওর বাবা বর্ধমানে ব্যাবসার নতুন ব্রাঞ্চ করে সেখানে নাকি একটি বাড়িও করেছেন। আসানসোল থেকে এবারেই এসে ভরতি হয়েছে বর্ধমানের উইনিভার্সিটিতে।

॥ ৩ ॥

রাতে কিছুতেই ঘুম আসছিল না আমার। কাল বিকেল চারটেতে খেলা। আকাশে আবার মেঘ জমছে। আজই যা অবস্থা ছিল মাঠের তাতেই পা ঠিক রাখা যাচ্ছিল না। আবার যদি বৃষ্টি হয় রাতে তো সত্যিই মুশকিলে পড়ব। যারা অন্য পজিশানে খেলে তারা সবসময় গতির ওপরেই থাকে। কখনও কম, কখনও বেশি। তাদের পক্ষে পিছল কাদাতেও খেলতে অতটা অসুবিধে হয় না যতটা হয় গোলকিপারের। যারা কখনও গোলে খেলেছে তারাই এ কথা জানে। মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মেঘ ডেকেই চলেছে।

বাবার যৌবনে বাবাও মেঘ গর্জনের মতো নাক ডাকতেন। বার্ধক্যে বাবা কেমন যেন হয়ে গেছেন। ফিসির-ফিসির আওয়াজ হয় এখন। এই বাবাকে দেখে কষ্ট হয় আমার। যখন রিটায়ার করেছিলেন তখন পেনশানের অঙ্কটাকে "রেসপেক্টেবল অ্যামাউন্ট" বলেই মনে হত। প্রতি বছরেই এই নরখাদক মুদ্রাস্ফীতির কারণে সেই অঙ্কটা হাস্যকর পর্যায় থেকে বিপজ্জনক পর্যায়ে নেমে আসছে। আমিই এই পরিবারের ভরসা। ভবিষ্যৎ। আগামীকাল আমার এবং আমার পরিবারেরও জীবনে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন।

পথের বাঁকে দুটি কুকুর কামড়াকামড়ি করছে। কাঁউ-কাঁউ কেঁউ-কেঁউ করে। পথের আলো এসে পড়েছে ওদের গায়ে। একটা লাল। আর-একটা সাদা। মনে হল ওরা দুজনে খেলছে। খেলছেই যদি তো কামড়াকামড়ি করছে কেন? বিছানা ছেড়ে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি, একটি হাড়ের টুকরো নিয়ে ওরা মারামারি করছে। মনে হল, গোরুর হাড়। মাহমুদপাড়া থেকে মুখে করে এনেছে বোধহয়। ওদের বিবদমান, লম্ফমান সাদা আর লাল শরীরে, মেঘে-ঢাকা আকাশের নীচে, পথের পাণ্ডুর আলো পড়ায় মনে হচ্ছে ওরা যেন জার্সি-পরা দুই ফুটবলার, বল নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। সাদা কুকুরটা লাল কুকুরটাকে হঠাৎই গলা কামড়ে ধরল। লাল কুকুরটা যন্ত্রণায় কাতরে উঠে পালাতে গেল হাড়টি ফেলে রেখে। কিন্তু সাদা কুকুরটি ছাড়ল না তাকে। হাড়টির মালিকানা পাওয়া সত্ত্বেও তার লড়াইয়ের সাধ মিটল না। এমন করে সে লাল কুকুরটার গলা কামড়ে তাকে মাটিতে ফেলে চেপে রইল যে মনে হল যতক্ষণ না সে মরে যাচ্ছে ও ছাড়বে না তাকে। আমার মনে পড়ে গেল, বাবা একদিন বলেছিলেন যে, জানোয়ার আর মানুষের মধ্যে অনেকই তফাত। তার মধ্যে মস্ত বড়ো তফাত হচ্ছে এই যে ওদের মধ্যে স্পোর্টসম্যানশিপ বলে কোনো ব্যাপার নেই। ন-সেট ম্যারাথন টেনিস খেলার পর সর্বাঙ্গ ঘামে-ভেজা ক্লান্ত হতাশ-হওয়া বিজিতও দৌড়ে যেত নেটের কাছে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বিজয়ীকে অভিনন্দন জানাতে। আন্তরিকতার সঙ্গে। সে সব আমাদের সময়। আজকাল টেনিসের বড়ো বড়ো খেলার হারজিতের সঙ্গে কোটি কোটি টাকা জড়িয়ে তাকে। আজকালও বিজিতরা করমর্দন করে হয়তো বিজয়ীর সঙ্গে কিন্তু কলের পুতুলেরই মতো। স্পোর্টসম্যানের মতো নয়। তার সেই লোক-দেখানো অভিনন্দন তাকে বড়ো না করে ছোটোই করে তোলে। যে-কোনো খেলাতেই হারজিত থাকেই। তবু, খেলাটা, প্রতিযোগিতাটা খেলাই। স্পোর্ট।

খেলাতে যে হারে সেও কিছু কম জেতে না যে জেতে তার থেকে। বিজিতর পটভূমিতেই, স্বীকৃতিতেই জয়ীর জয়ের সমস্তটুকু মূল্য নির্ধারিত হয়। বিজিতর আন্তরিক অভিনন্দনের মধ্যে দিয়ে বিজিত জয়ীর সমান হয়ে উঠেছে চিরদিনই। আজকালকার খেলোয়াড়েরা কী মাঠে, কী জীবনে হারকে তার নিজস্ব গরিমায় গ্রহণ করতেই ভুলে গেছে। এবং ভুলে গেছে বলেই জয়ী এবং বিজিত দুজনেই তাদের সামান্যতায় বড়োই ছোটো হয়ে যায়। স্পোর্টস-এর প্রকৃত তাৎপর্যই নষ্ট হয়ে গেছে আজ।

বাবাদের দিন সত্যিই আর নেই। এখন আমরা ট্রফি নিয়ে, গোরুর হাড় নিয়ে এ দুটি কুকুরেরই মতো কামড়াকামড়ি করি। এবং শুধুমাত্র জয় পরাজয়ের মধ্যেই আমাদের খেলা মহিমামণ্ডিতভাবে শেষ না করে, আমরা বিজিতর গলা কামড়ে ধরে, তাকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে একেবারেই শেষ করে দিতে চাই। তারই সঙ্গে হয়তো নিজেরাও শেষ হয়ে যাই।

জানালা ছেড়ে সরে এসে আমি বিছানাতে শুলাম। পুটুদা বলেছিল, ভালো করে ঘুমোবে আজকে। সকালে উঠে একটু ফ্রি-হ্যান্ড এক্সারসাইজ করে নেবে। ব্যস্‌স্‌। তারপর খেলার আগে গা-গরম করে নিলেই হবেখন একটু। অথবা স্ট্রেইন করবে না কালকে কোনোরকমই।

॥ ৪ ॥

এত লোক আমাদের এই ছোট্ট সাবডিভিশনাল টাউনের মাঠে কোনো দিনও হয়নি। ভিড় উপচে পড়ছে চারধারে। বেশিই আমাদের সমর্থক। সামান্য আছে ক্যামেরনের।

দূর থেকে বিষ্ণুকে দেখলাম। গোলপোস্টের সামনেই দাঁড়িয়ে। ফরসা, সুন্দর ছিপছিপে চেহারা। ওকে দেখে খেলোয়াড় মনে হয় না, মনে হয় লিটল-ম্যাগাজিন করা কোনো কবি অথবা গ্রুপ-থিয়েটারের অভিনেতা। সত্যিই অবাক হলাম। মাধোর কথা মনে হল। "কী দরকার ছিল মাইরি শালার এ লাইনে আসার?"

রেফারির হুইসিল বাজার দশ সেকেন্ডের মধ্যে বিষ্ণুর পায়ে কেউ বল ঠেলে দিল এবং বল পেয়েই সে বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে আসতে লাগল। আমাদের ফরোয়ার্ডেরা ছিটকে গেল এদিকে-ওদিকে।

চুনিদার প্রথম দিকের খেলা দেখেছিলাম। বিষ্ণুর ড্রিবলিং-এর কায়দা অনেকটা চুনিদারই মতো। বলটাকে যেন অ্যারালডাইট দিয়ে এক হাত সুতো বেঁধে কেউ ওর দু পায়ে সেঁটে দিয়েছে। একবার ডান অন্যবার বাঁ পায়ে নিচ্ছে বলটাকে অবলীলায় কিন্তু কোনো সময়েই বল তার দুপায়ের মধ্যে থেকে বেরোচ্ছে না। স্টপার মাধো সিংহবিক্রমে এগিয়ে গিয়ে বাধা দিল ওকে কিন্তু বিষ্ণু ভেলকি দেখিয়ে এমন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শরীরটাকে বেঁকিয়ে নিয়েই ডান পায়ে ফলস দিয়ে বাঁ পায়ে বলটাকে টেনে নিয়েই বাঁ দিকে পুরো শরীরটাকে কার্নিক মেরে, পরমুহূর্তেই ডান দিকে সরে এল যে মাধো ভিজে মাঠের মধ্যে সাপের তাড়া-খাওয়া ক্লান্ত হতবুদ্ধি কোলাব্যাঙেরই মতো থেবড়ে বসে পড়ল।

এবার আর কেউ নেই। ওর আর আমার মধ্যে। সমস্ত পৃথিবীকে যেন পেছনে ফেলে বিষ্ণু তার পায়ে সুদর্শন-চক্র বেঁধে জগৎ-সংসারকে দুটি ঘূর্ণায়মান পায়ে কাটাতে কাটাতে স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে এসে ঠিক গোলের সেন্টারে আমার হাত দশেক দূরে থমকে দাঁড়াল একমুহূর্ত।

বিষ্ণু লাহিড়ি নয়; যেন আমারই নিয়তি।

ওর বাঁ পা-টাকে শট নেবার জন্যে উঁচু করল। ওর ডানদিকে এবং আমার বাঁ দিকে গোলপোস্টের ওপরের দিকে কোনাকুনি শট-এ বলটা ঢোকাবে বলে মনে হল। আমি ওর মুখ অ্যান্টিসিপেট করে ততক্ষণে বাঁ দিকে ডাইভ দিয়েছি পাখির মতো ক্ষিপ্রতায়। আফটার অল আমিও চাঁদু রায়। হাতে ধরতে না পারলে পাঞ্চ করে বলটা গোলপোস্টের ওপরে ঠেলে দিতে যে পারব এ বিশ্বাস আমার ছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই তার উড়ন্ত বাঁ পায়ের গতি শ্লথ করে ও আমাকে সম্পূর্ণ বোকা বানিয়ে আমার ডানদিকে নীচু করে শট করল। তীব্র বেগে। জমি থেক ইঞ্চি ছয় উঁচু দিয়ে এসে সরলরেখায় কামানের গোলার মতো বলটা নেটে এসে নেট-জড়ানো গোলপোস্টে ঝাঁকি তুলে কিছুক্ষণ নড়েই স্থির হয়ে গেল।

আমার ভাগ্যলিপির মতো ক্যামেরনের সাপোর্টাররা সহর্ষে চেচিঁয়ে বলল গো—ওওল। আমাদের সাপোর্টাররা তাদের অনেক গর্ব এবং বিশ্বাসের গোলকিপারকে অমনভাবে পরাস্ত হতে দেখে 'থ' মেরে গেল। নৈঃশব্দ্য বিরাজ করল কয়েক মুহূর্ত। পরক্ষণেই হতাশার মর্মরধ্বনি।

মাধো কাদামাখা ভূত হয়ে গোলপোস্টের কাছে এসে বলল, বলেছিলাম তোকে! বে-ইজ্জত মাধো নিজেও কম হয়নি।

ও বলল, বার বার ঘুঘু ধান খায় না। এবার আমি গোলপোস্ট ছেড়ে দশহাতও এগোব না ও এলে। আবার এলে বাছাধনের টেংরি খুলে রেখে দেবে। নয়তো কলারবোন ভেঙে দেবে। আমার নাম মাধো দাড়িপা। আমি হারি না।

মাধোর বাবা অ্যাফিডেভিট করে চৌধুরি হলেও মাধো নিজেকে দাড়িপাই বলত। ও যা ও তা। ছেলেটার আর যাই দোষ থাক ও ভণ্ড ছিল না।

সদ্য গোল খাওয়ার গ্লানি তখনও বল-জড়ানো নেটের মতো আমাকে জড়িয়ে ছিল। বাবার মুখ, মায়ের মুখ, ছোটোবোন বুঁচির মুখ সব একসঙ্গে ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। বড়ো কষ্ট হল, লজ্জা। এবং একধরনের রাগও। কাল রাতের কুকুর দুটোরই মতো। সাদা কুকুরটার মতো বিষ্ণুর গলা কামড়ে ধরে মাটিতে ফেলে ওকে শেষ করে দিতে ইচ্ছে করল।

মাধোই বলটা নেট থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জোরে কিক করে পাঠিয়ে দিল মাঝ-মাঠে। আবার বাঁশি বাজল। আমাদের টিমের চারজন প্লেয়ার সেই ক্ষণ থেকে শুধুই বিষ্ণুকে ঘিরে রইল। পুটুদার ইশারা অনুসারে। আর পাঁচজন অন্যদের মোকাবিলা করতে লাগল। জয়ধ্বজ রাজেনের কাছ থেকে খুব ভালো একটা পাস পেয়ে চমৎকার শট করল গোলে।

ফুটবলও যে সত্যিই গুগলির মতোই ঘোরানো যায় পা দিয়ে মেরে, তা দেখিয়ে দিল জয়ধ্বজ। কিন্তু ক্যামেরনের গোলকিপার কেষ্টা বলটাকে দৈবদয়ায় পাঞ্চ করে বের করে দিল। সকলে হইহই করে উঠল। তার কিছুক্ষণ পরেই হাফটাইম হয়ে গেল।

পুটুদা মাঠে এসে গোল-খাওয়ার জন্যে আমাকে বকলেন না। বরং বললেন ওই গোল ক্যাবলা ভট্‌চাজও বাঁচাতে পারত না। সাংঘাতিক ছেলে। ওকে এ বছরই মোহনবাগান কি ইস্টবেঙ্গল ডেকে নেবে। দেখিস।

যে-স্ট্যাটেজিতে ওঁরই নির্দেশমতো আমাদের দল খেলছিল তাই-ই উনি কন্টিনিউ করে যেতে বললেন। বললেন, ওকে আটকে রাখ চারজনে যেমন রাখছিস আর অন্যরা গোল করার চেষ্টা করে যা ক্রমাগত। গোল কি আর প্রত্যেক শটেই হয়? পাঁচটা বল গোলে গেলে একটা গোল হয়। ওই বিষ্ণুর কথা ছাড়। ওর ওপর মা-কালীর ভর আছে।

পটুদা শর্টপাস এবং ফ্রিকোয়েন্ট পাস-এ বিশ্বাস করতেন না। সে মারাদোনা বা পেলেরা যেমন খেলাই খেলুন। বলতেন, মিছিমিছি এনার্জি আর অ্যাডভান্টেজ নষ্ট হয়ে যায় অমন করে খেললে। লংপাস-এ খেলতে বলতেন সব সময়েই।

হাফটাইমের ঠিক পরেই আবারও সেই দুর্ঘটনা। পায়ে বল পেয়েই বিষ্ণু আমাদের চারজন প্লেয়ারের ব্যূহ মুহূর্তে ভেদ করে পায়ে বল নিয়ে এত দ্রুতগতিতে আরও দুজনকে হতভম্ব করে কাটিয়ে গোলপোস্টের সামনে চলে এল উল্কারই মতো, যে তা বলার নয়। ক' সেকেন্ডের মধ্যে যে পুরো কাণ্ডটা ঘটাল তা বুঝতেই পারলাম না। এবারে কিন্তু দেখলাম, মাধো কাল রাতের সাদা কুকুরটারই মতো ঘাড়ের কেশর ফুলিয়ে তৈরি হয়ে আছে। ওর ভাব দেখেই বুঝলাম যে ওর চোখ বলের ওপরে নেই, বিষ্ণুর পায়ের ওপরে। গতবারের অপমানটা ও হজম করতে পারেনি। মাধোর ওপাশে দাঁড়িয়েই বিষ্ণু শট করার জন্যে পা তুলল। মাধোর চোখের ভাষা ও হয়তো বুঝেছিল। কিন্তু বিষ্ণু ক্লাস প্লেয়ার; গুন্ডা নয়। ও পরের মুভ নেওয়ার আগেই মাধো ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর পায়ের ওপর। তবুও শটটা আটকাতে পারল না। কিন্তু বলটা কর্নার হয়ে গেল। ততক্ষণে রেফারির হুইসিল বেজে উঠেছে। এবং বিষ্ণু মাটিতে পড়ে কাটা-পাঁঠার মতো ছটফট করছে। মুখে বলছে মা। ও মা। অস্ফুটে। একটু পরে আর বসে থাকতে না পেরে ও শুয়ে পড়ল মাঠের কাদাতেই। মাধো এমন নিখুঁত ভাবে মেরেছে বিষ্ণুকে যে বিষ্ণুর ঠিক পেছনে থাকা রেফারিও ওর চালাকি ধরতে পারেনি।

আমি ভাবছিলাম, মাধোর কথা। যে-মানুষ এত নিপুণ করে কাউকে মারতে শিখেছে সে ইচ্ছে করলে নিপুণতর করে বাঁচানোও শিখতে পারত। কিন্তু কাউকেই বা কোনো কিছুকেই বাঁচাতে শেখাটা আমাদের প্রজন্মের মানুষদের মানসিকতাতেই নেই।

কর্নার কিক হবে। বিষ্ণু তখনও শুয়ে আছে। ওর দলের প্লেয়াররা ওকে টেনে তুলতে গেল। কিন্তু ও আবারও পড়ে গেল। মনে হল, পায়ে মালটিপল ফ্র্যাকচার হয়েছে। ও কী যেন বলল ওর দলের একজনকে কানে কানে। একজন ডাক্তারকে ডাকতে চাইল। বিষ্ণু হাত দিয়ে মানা করল। তারপরই ওর দুজন সাথি ওকে প্রায় কোলে করেই

গোলপোস্টের দিকে বয়ে নিয়ে এল। আমার থেকে সামান্য সামনে। ও ওখানে পৌঁছে কাতরাতে কাতরাতে শুয়ে পড়ল আবার। এদিকে কর্নার কিক-এর বন্দোবস্ত হচ্ছে। ক্যামেরনের লেফট উইংগার কিক নেবে। আমাদের রাজেন আর জয়ধ্বজকে মাধো কী যেন বলল কানে কানে। যারা বিষ্ণুকে এতক্ষণ ঘিরে ছিল তারা বিষ্ণুকে ছেড়ে অন্যান্যদের, যারা হেড করে গোল দিতে সক্ষম, তাদের ঘিরে রইল। মাধো কিন্তু বিষ্ণুকে ছাড়ল না। সে একা দাঁড়িয়ে রইল বিষ্ণুর পাশে। ভাবটা, আবার ওঠবার চেষ্টা করলে শেষই করে দেব প্রাণে। বল বসানো হল রেফারির নির্দেশে। রেফারি একটু সরিয়ে ঠিক করে দিলেন। শট নেবার জন্যে ওদের লেফটউইংগার যখন পেছিয়ে গেল আমি ওই ভিড়ের মধ্যেই দেখলাম মাধোরই হাঁটু জড়িয়ে ধরেছে বিষ্ণু। ও কি ক্ষমা চাইছে মাধোর কাছে? প্রাণভিক্ষা? কাঁদতে কাঁদতে বলছে? ছেড়ে দাও। প্রাণে মেরো না? কিন্তু নাঃ। দেখি মাধোর হাঁটু জড়িয়ে ধরেই বিষ্ণু উঠে বসল। তারপর মাধোরই কোমর জড়িয়ে ধরল। কর্নার কিক হবার ঠিক আগের মুহূর্তে ও বোধহয় ওর নিজের শরীরের সব যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে, সে তার দলের জন্যেই মরিয়া হয়ে উঠল। ওর যন্ত্রণাকাতর নীল রক্তশূন্য মুখে ও শুকনো ঠোঁটে কী এক দৃঢ় প্রত্যয় ফুটে উঠল এবং কর্নার কিক হবার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে আশ্চর্য করে বিষ্ণু লাফিয়ে উঠল ওপরে হেড করার জন্যে। কিন্তু মাধোও তৈরি ছিল। বিষ্ণু ওঠার আগেই ও লাফ দিল। বলটাকে পাওয়ার জন্যে যতখানি লাফানো দরকার ছিল ততখানিই লাফাল বিষ্ণু কিন্তু বিষ্ণু যখন উঠছে তখন মাধো নিজে বলটাকে অন্যদিকে হেড করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে, নিজে নামতে লাগল ডান কনুইটা এমনভাবে নীচু করে যে বিষ্ণুর ওঠার ইমপ্যাক্ট আর মাধোর নামার ইমপ্যাক্টের সম্মিলিত জোরে যেন মাধো বিষ্ণুর বুকের কলার-বোন ভেঙে চুরচুর করে দিতে পারে।

বলটা কিন্তু বিষ্ণু ঠিকই হেড করে দিল অন্য তিনজনের চেষ্টাকে তুচ্ছ করে। মাথায় এমন একটা ঝাঁকি দিয়ে হেড করল যে অতবড়ো সাদা-কালো বলটা সত্যিই ইনস্যুয়িং-করানো ক্রিকেটের বলেরই মতো অর্ধচক্রাকারে ঘুরে এসে গোলে ঢুকে গেল। কিছুমাত্রও করতে পারলাম না আমি, মুগ্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া। সেই মুহূর্তে আমি বুঝলাম যে খেলোয়াড় হওয়া হবে না আমার এ জীবনে। প্রতিপক্ষর দিকে যে মুগ্ধতার চোখে তাকিয়ে থাকে তার মধ্যে শত্রুকে না প্রত্যক্ষ করে, সে কি খেলোয়াড়?

কনুই দিয়ে বিষ্ণুর কলার-বোন ভাঙার আওয়াজ আমি পাইনি। কিন্তু হেড করে গোল দেওয়ার পর বিষ্ণু যখন হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ল তখন মনে হল ও মরে গেছে। ও আর মাধো এমনই ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে ছিল জড়াজড়ি হয়ে যে পেছনে দাঁড়ানো রেফারি গুণেন চাটুজ্যে অত মাথার ভিড়ের মধ্যে ব্যাপারটা যে কী ঘটল তা দেখতে পেলেন না। অথবা কে জানে? মাধো যে ডানকুনিতে খেলতে গিয়ে গত সিজনে ওখানকার রেফারির কানে এভাবেই কনুই চালিয়ে বাঁ কান কালা করে দিয়েছিল সে খবরও হয়তো তাঁর জানা ছিল।

চতুর্দিক থেকে আবার গা-ও-ও-ল! গো-ও-ও-ল! চিৎকার উঠল! ক্লাবের কর্তাব্যক্তিদের

মধ্যেই কে যেন বলে উঠলেন গোলকিপার বদলাও পুটু। এই গোলকিপার নিয়ে জীবনে কোনো ম্যাচ জিততে পারবে না। ক্যামেরনের সাপোর্টাররা বিষ্ণুর অচৈতন্য শরীর ঘিরে ধরল। তাকে বয়ে বাইরে নিয়ে যেতে যেতেই খেলা শেষের বাঁশি বেজে উঠল।

মাধো আমার কাছে এসে বাহাদুরি করে বলল, এ জন্মে আর বড়োলোকের ছেলেকে শখের ফুটবল খেলতে হবে না। প্রাণে বাঁচে কি না তাইই দেখো গুরু!

আমি বকলাম ওকে না মেরে বলটা তো তুই হেড করে অন্যদিকে পাঠিয়ে দিতে পারতিস?

মাধো বলল, লাভ কী হত? আর সময় কত বাকি ছিল হাতে। হেরে তো বসেই ছিলাম। দু গোলে হেরে না হয় এক গোলেই হারতাম। হারামির বাচ্চার এনথু দেখলি? এক গোল দিয়েও আশ মেটেনি, ভাঙা পা নিয়ে আবার লাফাল। কিন্তু লাফাল কী করে তাই ভাবছি। তবে বাছাকে বাকি জীবন আর খেলতে হবে না। এমনিতেই শালা এ লাইনে যা ভিড় লেগেছে তার ওপরে এই সব শৌখিন পার্টিদের কোনোমতেই প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। যে করে হোক বিষ্ণুকে খেলার মাঠ থেকে তাড়াতেই হত। আমাদের সকলের স্বার্থে। তাই সে কম্মটি তাড়াতাড়ি করতে পেরে খুব ভালো লাগছে। রাজেনদারা আজ খাওয়াবে বলেছে। আগেই কথা হয়েছিল। মালও চলবে। আসবি নাকি তুই? গোপীদের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপটা ফাঁকা পড়ে আছে। ওর বাপ গেছে রানিগঞ্জ। সেখানেই পাঁঠার মাংসর কষা আর মাল চলবে আজ। ম্যাচ তো শালা হেরেই গেলাম! এখন একটু দুঃখু ভুলব না?

আমি বললাম, নাঃ। আমার কাজ আছে।

অঞ্জলি ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল। কোনো কথা বলল না। চেয়ে রইল মুখে। দেখলাম জল টসটস করছে ওর চোখে।

মাইকে ঘোষণা হল বিষ্ণুকেই "ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ" ডিক্লেয়ার করা হল। অচৈতন্য বিষ্ণুকে নিয়ে চাড্ডাহেব নিজের গাড়িতে বর্ধমানে চলে গেছেন। বাজারে ফার্স্ট এইড করে নেবেন। ঘোষসাহেব যদুবাবুর চালকল থেকে ট্রাংক-কল বুক করেছেন নাকি বর্ধমানে বিষ্ণুর বাবাকে খবর দেবার জন্যে। সোজা হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন ওঁকে চাড্ডাসাহেব।

মাধো ভেবেছিল যে আমি বাহবা দেব ওকে। কিন্তু আমি চুপ করেই রইলাম। ওকে বলতে গেলাম যে, কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না আসলে। আমিও তো মাধোদের দলেরই একজন। বিষ্ণু তো একা। নির্দল। ওকে ভালো বলতে গিয়ে এই দলসর্বস্ব দিনে আমি একা হতে যাই কোন দুঃখে? তাছাড়া মনে হল সব কথা সবার জন্যে নয়ও। অনেক কথাই থাকে যা চেঁচিয়ে বলারও নয় তা চেঁচিয়ে বললেও অন্য পক্ষের কানে বা মনে তা পৌঁছোয় না।

যে কথা বলা হয় এবং যে-কথা শোনা; তাদের পারস্পরিক সমঝোতার জন্যে শব্দতরঙ্গের মিল থাকা দরকার। খুবই দরকার।

সকলের শেষে বাড়ি ফিরলাম আমি। 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' ডিক্লেয়ার করা হয়েছে বিষ্ণুকেই। বাড়ি ফেরার আগেই আমাদের হারের খবরটা বাড়িতে পৌঁছে গেছিল।

মা কালো মুখ করে বললেন, ভেবেছিলাম, এই ম্যাচ জিতলে তুই ক্যামেরনের চাকরিটা পাবি। জিতলে, অথবা গোল না খেলে। খুবই আশা করেছিলাম যে....

আঃ। চুপ করো তো তুমি!

বাবা ধমক দিলেন মাকে। তারপরই ঘরের ভিতরে গিয়ে জামাটা পরেই ফিরে এলেন। বললেন, চল চাঁদু।

কোথায়?

আমি অবাক হয়ে বললাম।

বাবা বললেন, আমি সবই শুনেছি। তুই এই ক্লাব ছেড়ে দে। মাধোর মতো খুনিরা যেখানে ফুটবলারের জার্সি পরে মাঠময় ঘুরে বেড়ায় সেই দলে কোনো স্পোর্টসম্যানের থাকা উচিত নয়। আমি জানি যে তুই স্পোর্টসম্যান। আফটার অল আমারই ছেলে তো! ইট রানস ইন দ্যা ব্ল্যাড। বুঝলি।

কিন্তু যাব কোথায়?

বিষ্ণুর কাছে। বর্ধমানে। ঠিকানাও জোগাড় করেছি। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চল। এই লোকালটা পেয়ে যাব। এগারোটার মধ্যেই ফিরে আসব। বুঝলে মণি। মায়ের দিকে ফিরে বললেন এবারে।

কিন্তু জামাকাপড়? এই কাদামাখা...

প্রতিযোগীকে খেলার জামাকাপড় পরা অবস্থাতেই কনগ্রাচুলেট করতে হয়। এই কাদামাখা জার্সি, এই ঘাম গায়েই। চল।

হাওয়ায় চাবুক মেরে লোকাল-ট্রেনটা জোরে ছুটে চলেছিল বর্ধমানের দিকে। রাত হয়ে গেছে। ভেজা জামাকাপড়ে জোলো হাওয়া লেগে ঠান্ডা লাগছে। এখন ট্রেনে বিশেষ ভিড় নেই। বাবা জানালার পাশে একটা সিট পেয়ে বসে বাইরের ভেজা অন্ধকারে চেয়ে আছেন। পরের স্টেশনেই বাবার উলটোদিকের একটি সিট খালি হল। সসংকোচে আমি বসলাম। যাতে পাশের যাত্রীর গায়ে কাদা না লাগে।

বাবা কিছু বলতে চাইলেন। আমার দিকে চেয়ে গলাটা ঘড়ঘড় করে উঠল। বললেন, তোর তো মাস্থলি আছে। ফেরার ভাড়া নেই কিন্তু আমার কাছে। তোর কাছে কি কিছু আছে?

বাড়িতে আমার ড্রয়ারে পাঁচটাকার নোট ছিল একটি।

আমি বললাম, এক নয়াও নেই বাবা, সঙ্গে।

বাবাকে মুহূর্তের জন্যে চিন্তিত দেখাল।

বললে, বর্ধমান স্টেশনের শ্যামলের কাছে না হয় চেয়ে নেব গোটা কুড়ি টাকা। তোর মাও বলেছিলেন যে কালকে বাজার করার টাকাও নেই। পেনশানটা পেলেই শোধ...

আমি বললাম, কেন? ছোটোকাকার কাছ থেকেও তো...

নাঃ।

বাবা বললেন দৃঢ় গলায়। তোর ছোটোকাকাও ওই মাধোদেরই দলের। জীবনের মাঠে তার যা উন্নতি, তার বাড়ি গাড়ি কোনো কিছুই সে স্পোর্টসম্যানের মতো অর্জন করেনি। এক মায়ের পেটের সব ছেলে একরকম হয় না। কার মধ্যে যে কার জিন চলে আসে! আমি ওকে আমার ভাই বলে স্বীকার করি না। ও আমার আত্মীয়ও নয়। রবীন্দ্রনাথের লেখায় পড়েছিলাম, আত্মীয় কথাটার মানে হচ্ছে যে আত্মার কাছে থাকে সেই আত্মীয় জন্মসূত্রেই। আত্মীয়তায় আমি বিশ্বাস করিনি কোনোদিনও চাঁদু। তোর ছোটোকাকার চেয়ে বিষ্ণু এই মুহূর্তে আমার অনেক বড়ো আত্মীয়। মাধোরা যাতে বিষ্ণুদের দাবিয়ে না রাখতে পারে তা দেখাটা প্রত্যেক স্পোর্টসম্যানেরই কর্তব্য। সেই স্পোর্টসম্যান তোর মতো যুবকই হোক কী আমার মতো রিটায়ার্ড পেনশনার তাতে কিছু এসে যায় না।

আমার গলা কান্নায় বুঁজে এল। আমি বাবার বড়ো ছেলে। বি এতে ডিস্টিংশান পাওয়া বেকার ছেলে। 'কানেকশানস' না থাকায় আমার চাকরি হল না দু-বছরেও। যদি এ ম্যাচটাও...

বাবা গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, চাঁদু, আমার বয়স হচ্ছে। শরীরও আদৌ ভালো নেই বুঝতে পারি। সময় হয়ে আসছে। তোকে একটা কথা বলে যেতে চাই। তোর সঙ্গে দেখাই বা কতটুকু হয়। বলবার সময় আর নাও পেতে পারি। বড়ো গোলকিপার হওয়ার চেয়েও, বড়ো স্ট্রাইকার হওয়ার চেয়েও অনেকই বড়ো কথা বড়ো স্পোর্টসম্যান হওয়া। নিছক একজন অনামা অখ্যাত স্পোর্টসম্যান। কিন্তু স্পোর্টসম্যান। খেলার মাঠেই বল আর জীবনের মাঠেই বল সব ক্ষেত্রেই এই কথাটা মনে রাখিস বাবা। দেশে ইদানীং স্পোর্টস-এর জন্যে অনেক কিছুই হয়েছে। হচ্ছে। আমাদের সময়ে এসব কিছুই ছিল না। এশিয়াড ভিলেজ, নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম, ইডেনগার্ডেনের স্টেডিয়াম, সল্টলেক স্টেডিয়াম। আরও কত কী হবারও খবর তো রোজই পড়ি কাগজে। কিন্তু স্পোর্টসম্যানই...। খেলার মাঠে, জীবনের মাঠে হারজিত তো থাকবেই। চিরদিনই ছিল। জীবনেরও আর-এক নাম ময়দান। জন্ম থেকে প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়েই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাই আমরা প্রত্যেকে। কিন্তু মাধোদের মতো, তোর ছোটকাকার মতো....

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে জানালার দিকে মুখ করে বাবা বললেন, আমাদের সময়ে কিন্তু... বুঝলি...

বাইরের জলভরা ধানখেতের গন্ধমাখা শেষ-শ্রাবণের ভেজা জোলো-হাওয়া রাতের অন্ধকার থেকে দৌড়ে এসে বাবার কথাগুলিকে কুড়িয়ে তুলেই উড়িয়ে নিয়ে গেল। লোকাল ট্রেনের চাকাগুলো সমস্বরে অট্টহাস্যে হেসে উঠল।

হাঃ। হাঃ। হাঃ। করে।

আমার বাবার কথায়?

লজ্জাস্থান

না দাদা, যাব না বললে তো হবে না। সকলেই যাচ্ছেন। আপনাকেও যেতে হবে।

আপনাদের মাথাটাথা খারাপ হয়েছে। গল্প শুনতে ডিসেম্বরের শীতের রাতে কে আসবে জলপাইগুড়ি শহরে? জলপাইগুড়িতে আজ থেকে যাচ্ছি না! প্রথমবার গেছি উনিশশো পঞ্চাশে যখন ক্লাস এইটে পড়ি।

তা যেতে পারেন। কিন্তু আমরা বলছি যে আপনি অবাক হয়ে যাবেন দাদা দেখে যে, কত অনুরাগী আছেন আপনাদের সেখানে।

জানি না। তা ছাড়া সকলে যাচ্ছেন মানেটা কী? কে কে যাচ্ছেন? আমি তো সভাসমিতি কোথাও যাই না। তার ওপরে দলেবলে তো যাইই না।

দাদা, এ তো আর যাত্রাপার্টি নয়! আমরা জলপাইগুড়ি শহরকে একেবারে তাক লাগিয়ে দেব। সাহিত্যিকের মেলা বসবে সেখানে। মিলন-মেলা।

তার মানে? কিশোরকুমার নাইট করার মতো?

তা না, তা না। সাহিত্য-জগতের এতজন নামি নক্ষত্রকে একইসঙ্গে জলপাইগুড়িতে কখনও পাঠক-পাঠিকারা দেখেননি। তা ছাড়া আসল কথাটাই বলা হয়নি। এই গল্পপাঠের আসরের প্রধান উদ্যোক্তা এমন একজন নামি সাহিত্যিক যিনি জলপাইগুড়িরই মানুষ।

কে?

অবাক হয়ে বললাম আমি। তাই যদি হবে তা তিনিই তো একটা ফোন করতে পারতেন আমাকে।

করবেন, তিনি করবেন। আমাদের কথাতে চিঁড়ে না ভিজলে উনি দই দিয়ে ভেজাবার বন্দোবস্ত করবেন। অবশ্যই করবেন ফোন।

দই মানে? টাকা পয়সা? টাকা পয়সা নিয়ে কোনো সভাসমিতিতে যাইনি। আজ পর্যন্ত

যাইনি। ভবিষ্যতের কথা বলতে পারি না। প্রয়োজনে সবই করতে হয় মানুষকে। হয়তো আমাকেও হবে।

না, না দাদা, আমরা ওসব কথা জানি। কে কী দিল যান। কার কত রেট। কিন্তু আগে আপনি একটু ধৈর্য ধরে সবটা শুনুন। আপনি বড়োই অধৈর্য।

আমি তো আর বড়ো খবরের কাগজের অপিসে কাজ করি না যে, কোনো কাজ করি আর নাই করি নাম-মাহাত্ম্যেই বসে বসে মাস গেলে মোটা খাম পাব একটা। আমাকে খেটে খেতে হয় ভাই। এখুনি বেরোতে হবে যে। আগে ফোন করে এলেন না কেন? আগে না জানিয়ে এলে যে সময় দেওয়া মুশকিল। সত্যিই মুশকিল।

জানি, আপনার সময় কম। তাই শর্টেই বলছি। তা ছাড়া আরও দু-একজন খেটে-খাওয়া সাহিত্যিক যাচ্ছেন আপনি ছাড়াও। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা হলেন সমরেশ মজুমদার। জলপাইগুড়ির গর্ব। তিনিও কাগুজে সাহিত্যিক নন।

আরে মশাই কাগুজে-সাহিত্যিক বা কাগুজে-বাঘ বা কাগজের বউ এসব কথার মানে অন্য। অমন কাউকে বলবেন না।

সরি দাদা। মাফ করে দেবেন।

সমরেশ! তা সমরেশই তো ফোন করলে পারত।

করবেন দাদা, করবেন। পুরোটা শুনে নিন। কে কে ইতিমধ্যেই কনসেন্ট দিয়েছেন তাঁদের নামগুলো একবার শুনুন।

বলুন।

সমরেশদা, মানে সমরেশ বসু, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, বিমল দেব আর সমরেশদা, মানে, ছোটো সমরেশদা অর্থাৎ মজুমদার। তিনি তো যাচ্ছেনই। এখন সুনীলদা আর আপনি হ্যাঁ করলেই ষোলোকলা পূর্ণ হয়। কোনো কষ্ট দেব না দাদা। প্লেনে করে নিয়ে যাব। প্লেনেই ফিরিয়ে দেব। জলপাইগুড়িতে ফার্স্টক্লাস গেস্ট হাউসে রাখব। খাওয়াদাওয়ার কোনোই অসুবিধে হবে না। প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ঘর দেব। দোতলা গেস্ট হাউস। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। দেখার মতো। কেয়ারি-করা ফুলের বাগান। সামনে পেছনে। শুধু একটাই কষ্ট হতে পারে।

সেটা কী?

মশা। সেটার ওপরে সাহিত্যানুরাগীদের কোনো ডাইরেক্ট কনট্রোল তো নেই। মানে, সাহিত্যিকদেরও কোনো প্রভাব নেই মশার ওপরে। থাকলে, সে বন্দোবস্তও করা যেত। বিধানবাবু মশা নির্মূল করে গেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে। জ্যোতিবাবুরা রোশনচৌকি বসিয়ে তাদের মহাসমারোহে ফিরিয়ে এনেছেন বরযাত্রীদের মতো। আমাদের কিছুই করণীয় নেই দাদা। মশাটা সহ্য করে নিতে হবে।

আর একজন বললেন, দমদম থেকে সকালের প্লেনে স্ট্রেইট বাগডোগরাতে গিয়ে নামবেন। সেখান থেকে প্রাইভেট কার-এ জলপাইগুড়ি। সেদিনই রাতে আপনাদের

গল্পপাঠ, রবীন্দ্রভবনে। পরদিন সারাটা দিনই রেস্ট। ভক্ত পাঠক-পাঠিকারা হয়তো মাঝেমধ্যে আলাপ করতে বা সই নিতে গেস্ট হাউসে আসতে পারেন।

তারপর? তারপর সন্ধেবেলা আরও গল্পপাঠের আসর। এত মানুষ আপনাদের দেখতে, নিজেদের গলাতেও নিজেদের গল্পপাঠ শুনতে আগ্রহী যে তাদর সকলেকে তো একদিনে অ্যাকোমোডেট করতে পারা যাবে না। দ্বিতীয় রাতের অনুষ্ঠানের পরেই সোজা নিয়ে যাব আপনাদের সকলকে চা-বাগানে। দুদিন চা-বাগানে থেকে, রেস্ট করে, বেড়িয়েটেড়িয়ে তার পরদিন ভোরে রওনা হয়ে স্ট্রেইট আবার বাগডোগরাতে এসে প্লেন ধরে বিকেলেই কলকাতা।

সুনীলবাবু রাজি হয়েছেন যেতে?

হননি। তবে হয়ে যাবেন। হননি মানে, উনি কলকাতার বাইরে গেছেন কোনো আত্মীয়ের বিয়েটিয়ে উপলক্ষ্যে। ফিরলেই ছোটো সমরেশদা ওঁকে গিয়ে ক্যাঁক করে ধরবেন। এবং রাজি করাবেন। সে ভার ওঁরই।

ভার নিয়ে থাকলে অবশ্যই পারবে সমরেশ। সে উদ্যোগী পুরুষ, অশেষ করিতকর্মা। মনোজ মিত্র, বিমল দেব ওঁরাও কি গল্পই পড়বেন?

না, না, তা কেন? ওঁরা "স্কিট" পড়বেন। মানে, করবেন। নইলে এতজনের লাগাতার গল্পপাঠ। পাবলিক একটু বোরড হয়ে যেতে পারে। রিলিফ হবে একটু।

আমাদের এতজনকে এখানে না নিয়ে গিয়ে জলপাইগুড়ির সকলকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে এলেই তো পারতেন।

হাঃ। কী যে বলেন বুদ্ধুদা।

আমার এই বন্ধুর মা আমাকে "বুদ্ধু" বলে ডাকতেন। আর এই দ্বিতীয়জনকে দেখলাম বুদ্ধু বলে ডাকতে। বলা বাহুল্য, মোটেই খুশি হলাম না।

ওঁদের মধ্যে একজন বললেন, একটা কথা বলব দাদা?

কী? বলুন। তাড়াতাড়ি বলুন।

কোনো চিন্তা করবেন না। সন্ধেবেলাতে আপনাদের শরীর মেরামতির বন্দোবস্তও থাকবে। আমাদের আলাদা বাজেট থাকবে শরীর মেরামতি খাতে।

শরীর মেরামতি মানে? সেটা কী ব্যাপার?

সে কী দাদা? জানেন না? আগেকার দিনে যজ্ঞিবাড়ির ঠাকুরেরা যে লম্বা ফর্দ বানাত মশলাপাতির শেষ আইটেম থাকত— "শরীর মেরামতি খাতে"— দুই টাকা। পাঁচ টাকা, দশ টাকা, দিন বুঝে, ঝক্কি বুঝে। অর্থাৎ কি না অহিফেন। মানে বুঝলেন তো? আফিং।

আমাদের আফিং খাওয়াবেন নাকি?

তা কেন! যিনি যা খাবেন। অবারিত দ্বার স্যার আমাদের মানে, যাঁদের শরীর আছে এবং সেই শরীরে মেরামতির দরকার আছে, তাঁদেরই জন্যে। জোর করে কি আর খাওয়াব? তবে সেটা সন্ধেবেলাতে নয়, হবে অনুষ্ঠানের পরেই। অনুষ্ঠানের আগে করাটা

ঠিক হবে না। অধিকাংশই তো পাঠিকা। কেউ কিছু মনে করতে পারেন। আমাদের ওখানে প্রচুর গন্ধগোকুল আছে দাদা। হাওয়াতে গন্ধ পাবে। এবং তা করলে আপনাদেরই বদনাম হবে। নামি লোকদের নিয়ে গিয়ে বদনাম করিয়ে দেব অমন কাজ আমাদের দ্বারা হবে না। শরীর মেরামত অবশ্যই হবে, তবে রাখঢাক করে।

আমার শরীর এমনিতেই মজবুতই আছে। কোনোরকম মেরামতিরই দরকার নেই।

তবুও দাদা। আমাদের কর্তব্য সব কথা খুলে বলা যাতে বুঝতে কোনো অসুবিধে না হয়।

আচ্ছা। আজকে আমাকে এখুনি বেরোতে হবে। সমরেশ মজুমদারকে বলবেন, দয়া করে যেন আমাকে একটা ফোন করেন।

কোথায় দাদা? অফিসে?

না, বাড়িতে। রাতে।

আপনার বাড়ির ফোন নাম্বার?

ওঁর কাছে আছে।

তা হলে আমরা আশা নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু। কথা দিচ্ছেন তো?

কথা এখনও দিচ্ছি না। আমি কোথাওই যেতে পারি না। বহু বছর আগে একবার উত্তর আসামের ডিগবয়তে গেছিলাম। তাও তার আগের বছর আমার স্ত্রী গান গাইতে গেছিলেন সেখানে, তাই। মানে, তাঁর কাছ থেকেই জায়গাটার সৌন্দর্য এবং উদ্যোক্তাদের আদর-আপ্যায়নের আন্তরিকতার কথা শুনে রাজি হয়ে গেছিলাম। নইলে—।

আমাদের ওখানেও আদর-আপ্যায়নের কোনোই ত্রুটি হবে না। তবে আপনি তো জলপাইগুড়ির রাজবাড়ির অতিথি হন। জ্যোতিবাবুর দাদা-বউদিদের। অতখানি আশা করবেন না।

আপনাকে কে বলল?

আমরা কি জানি না নাকি? জলপাইগুড়ির নবাবকেও তো আপনি চেনেন।

নবাবকে চিনি না। কারা এসব রটান। ওঁদের পরিবারের দু-একজনকে চিনি। পরের প্রজন্মের। একজন নবাবজাদা একবার আমাদের সঙ্গে শিকারে গেছিলেন সুন্দরবনে। কিন্তু তার সঙ্গে কী? আপনারা তো দেখছি গোয়েন্দা লাগিয়েছেন আমার পেছনে!

না, মানে খাতির-যত্নের আদর-আপ্যায়নের যদি কিছু সামান্য খামতি হয়। আগে থাকতেই বলে রাখা ভালো দাদা। ক্ষমাঘেন্না করে নেবেন দাদা।

সমরেশ রাতে ফোন করল।

দাদা আমার ছেলেরা গেছিল?

হ্যাঁ।

কী বলল?

বলল, শরীর মেরামত করে দেব।

মানে?

না। মানেটা খারাপ নয়। নতুন একটি শব্দ শেখা হল ওদের কল্যাণে। ভারী ভদ্র এবং বিনয়ী ছেলেরা তোমার।

যাচ্ছ তো? না ডোবাবে?

তোমাকে ডোবাতে পারি? দক্ষিণ বাংলার সুন্দরবনের বাঘ আর উত্তরবাংলার ডুয়ার্সের সমরেশ মজুমদারকে ডোবাবে এমন কে আছে! কার ঘাড়ে ক-টা মাথা!

চলো চলো। তোমার সঙ্গে তো কলকাতাতে দেখাই হয় না। দু-তিনটে দিন খুব আনন্দে কাটবে।

সাধুসঙ্গে।

সাধু না অসাধু তা জানি না।

আমরা যে দুদিন জলপাইগুড়িতে থাকব তারই মধ্যে সমরেশদার জন্মদিনও পড়েছে। তোমাকে কিন্তু গল্পপাঠ ছাড়াও গান গাইবার জন্যে ধরতে পারেন ওঁরা। 'না' কোরো না যেন। উত্তরবঙ্গে তোমার যে কত ভক্ত আছে নিজে না গেলে বুঝবে না।

তোমার ভক্তদের চেয়েও বেশি? বাজে বোকো না।

বলেই বললাম, আমাকে ছেড়ে, সঞ্জীবকে গাইতে বোলো।

সঞ্জীব গান গায় নাকি?

গায় না? সঞ্জীব বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন। ভালো ছবি আঁকে। ভালো আবৃত্তি করে। শ্রুতি নাটক। ভালো গান গায়। বিশেষ করে পুরাতনী গান। রীতিমতো প্রফেশনাল গায়কের মতো ভালো গায়। নিজেই হারমোনিয়াম বাজিয়ে গায়। আগে কিছু বোলো না। তা হলে ও বেঁকে বসবে। ওখানেই স্টেজে উঠিয়ে তারপরে ওকে পাকড়াও কোরো। হারমোনিয়াম-এর জোগাড় রেখো একটা ব্যাক স্টেজে। আমি বললে যদি নাও গায় তা হলে সুনীলবাবুকে দিয়ে বলিয়ো। সঞ্জীব তো তাঁরই ডিপার্টমেন্টের, মানে 'দেশ'-এর। সুনীলবাবুর অনুরোধ ফেলতে পারবে না।

এটা ভালো বলেছ দাদা। সাগরদার পরে তো সুনীলই 'দেশ'-এর সম্পাদক হবে। সুনীলের অনুরোধ সত্যিই ফেলতে পারবে না।

॥ ২ ॥

ফ্লাইট অনেকই ডিলেড ছিল। উদ্যোক্তারা সমরেশের পরামর্শে এয়ারপোর্টের দোতলার রেস্তোরাঁতে আমাদের এবং ছোটো সমরেশকেও নিয়ে গিয়ে নিজৌষধি সেবন করিয়ে "দুঃকু" ভোলাবার চেষ্টা করলেন। তবে সঞ্জীব এবং শীর্ষেন্দু দুজনেই নিরামিষাশী। ছারপোকা- তেলাপোকা ইত্যাদি বেটে যেসব কালচে-লালচে জলীয় পদার্থ হয় সে সবও আমিষের মধ্যেই গণ্য বলে ওঁরা মুখেও দেন না। তা ছাড়া ওসব তো মোটেই সুখাদ্য

সুপানীয়র মধ্যে গণ্য নয়! দুজনেই ভোরে উঠে পুজো-আচ্চা করেন। শীর্ষেন্দু শ্রীশ্রীঅনুকুল ঠাকুরের ভক্ত। সঞ্জীব, সম্ভবত শাক্ত। শীর্ষেন্দু নিরামিষাশী তো বটেই পেঁয়াজ-রসুনের ছোঁয়া পর্যন্ত খান না। সঞ্জীবের বোধহয় অতটা বাছবিচার নেই।

প্লেনটা সত্যিই ভীষণই ডিলেড হল। এদিকে উদ্যোক্তাদেরও সকলের তো বটেই আমাদের প্রত্যেকের টেনশান হচ্ছিল। শুনলাম টিকিট বিক্রি করে অনুষ্ঠান হচ্ছে। যাত্রাপার্টি, অধিকারী সমেত, যথাসময়ে না পৌঁছোলে আমাদের পরিবর্তে উদ্যোক্তাদের নিজেদের শরীর মেরামতিতে লাগতে হবে।

আমারও শেষ দেশ উত্তরবঙ্গেই। তবে তা বাংলাদেশে পড়ে গেছে। রংপুরে। হারাগাছার ফুটবল টিম-এর খেলার রকম আমি জানি। দুটি গোল খেয়ে গেলেই তাদের ক্যাপটেন লুঙি কষে বেঁধে নিয়ে বলত : "বল ছাড়ি ম্যান ধরো বা হে।" গোল ফুটবল, অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে মাঠের এককোণে পড়ে থাকত আর হারাগাছার ফুটবল টিমের ষাঁড়ের ডালনা খাওয়া, মোটা মোটা বাঘের মতো পায়ের গোছওয়ালা প্লেয়ারেরা চটাফট পটাপট শব্দ করে রংপুরের "ধাপ"-এর প্লোয়ারদের পায়ের আর গোড়ালির হাড়ের চলটা ওঠাত। সেইসব বাঘ না থাকলেও আমি বিলক্ষণ জানি যে, "বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি।" জার্মান জঙ্গলের মতো (চোতরা বিছুটি) অফুরন্ত প্রাণশক্তিসম্পন্ন বহুত মানুষ উত্তরবঙ্গে আছেন। তাঁরা আমাদের হাড় নিয়ে দুন্দুভি বাজাতে ছাড়বেন না যদি সময়ে পৌঁছোনো না যায়। এমন একটা আশঙ্কা সমরেশের মুখেও স্পষ্টই ফুটে উঠেছিল।

আমি ভাবলাম, আমাদের কী! আমরা তো অতিথি-শিল্পী। সমরেশ মজুমদার উদ্যোক্তাদের একজন। তবে সেও কিছু দুবলা-পাতলা নয়। হারাগাছার ষাঁড়ের ডালনা খাওয়া টিমের সঙ্গে টক্কর দিতে অবশ্যই পারবে প্রয়োজনে। ষাঁড়ের ডালনা না-খেয়েই, এটাই ভরসার কথা।

তার ওপরে টেনশান আরও বাড়ল যখন বাগডোগরাতে নেমে, ছোটো সমরেশের মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও সবিশেষ মাতৃ-পিতৃভক্ত শীর্ষেন্দু গোঁ ধরল যে মা-বাবাকে না দেখে সে অকুস্থলের দিকে আদৌ রওনা হবে না। তাতে আমার ভালোই হল। শীর্ষেন্দুর মা ও বাবার সঙ্গে দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হল, তাঁদের প্রণাম করার সৌভাগ্যও।

উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ি ভার্সাস জলপাইগুড়ির মধ্যে রীতিমতো মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলেরই মতো প্রতিযোগিতা আছে শীর্ষেন্দু ও সমরেশ মজুমদারকে নিয়ে। এঁরা দুজনেই আমারই মতো উদ্বাস্তু। সঞ্জীব খাঁটি ক্যালকেসিয়ান। বিমল দেবও তাই। মনোজের কেসটা ঠিক জানি না। যাই হোক, শিলিগুড়ি ন্যায্যত গর্বিত শীর্ষেন্দুকে নিয়ে। এবং জলপাইগুড়িও সমরেশ মজুমদারকে নিয়ে। শীর্ষেন্দু অবশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে ছোটো সমরেশের চেয়ে অনেকদিন আগে এসেছে। আমার চেয়েও আগে। অবশ্য আমি এখনও "এসেছি" যে এ কথা অনেকে স্বীকার করেন না। এবং হয়তো ন্যায্যতই!

শিলিগুড়ি থেকে ছুটল গাড়ি জলপাইগুড়ি শহরের দিকে। এক সময়ে প্রতি মাসে

কাজে একাধিকবার শিলিগুড়ি যেতে হত। এবং গেলেই গাড়ি করেই পাহাড়ে এবং সমতলের নানা জায়গাতে ঘুরে বেড়াতাম। নানারকম গাড়ি এবং অন্যান্য স্থলযানে এবং বহুবিধ জলযানে চড়ে শিশুকাল থেকেই অভ্যস্ত ছিলাম। বিভিন্ন রকম বায়ুযানেও নিয়মিত চড়ছি উনিশশো সাতচল্লিশ আটচল্লিশ থেকে। কিন্তু জাতে স্থলযান, অথচ আসলে বায়ুযানে চড়ার অভিজ্ঞতা সেই প্রথম হল। অমন উড়ুক্কু গাড়ি এবং অমন ড্রাইভার এর আগে ভূ-ভারতে কোথাওই দেখিনি এবং দেখবার ইচ্ছেও আর নেই এ জীবনে।

অক্ষত অবস্থাতে যথাসময়ে, অর্থাৎ অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার আধঘণ্টাটাক আগেই দারুণ সরকারি দোতলা গেস্ট হাউস-এ গিয়ে আমরা তো দুটি গাড়িতে করে পৌঁছোলাম। সেই বিকেলে মোটর দুর্ঘটনা ঘটলে অনেকেই সমসাময়িক এবং আমাদের পরের প্রজন্মের লেখকেরাও সত্যনারায়ণের শিরনি খেতেন, দরগাতে মোমবাতি জ্বালতেন, কালীবাড়িতে পাঁঠাবলি দিতেন। বায়োস্কোপ-থ্যাটারের কিছু লোকেরাও আনন্দে শরীর মেরামতিতে লেগে যেতেন। কারণ, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, বিমল দেব, সমরেশ মজুমদার এবং এই তল্লিবাহক একই সঙ্গে বহুজনকে অপার আনন্দ সাগরে ভাসিয়ে ফণ্ডত হয়ে যেতেন ও যেতাম। মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব) লিখেছিলেন, "একই অস্ত্রে হত হলো মৃগী ও নিষাদ।" এ শুধু এক নিষাদ নয় গন্ডা গন্ডা নিষাদ একই আশ্চর্য যানে এক লহমাতে খতম হয়ে যেতেন।

রাতে যেখানে অনুষ্ঠান, সেই রবীন্দ্রভবনে ছুঁচ গলবার জায়গা ছিল না। ওই ঠান্ডাতে, অত মানুষে যে নিঃশব্দে অত দীর্ঘ অনুষ্ঠান ওইরকম অখণ্ড মনোযোগ সহকারে এবং পরম শ্রদ্ধাসহকারে শুনবেন তা অন্তত আমার ভাবনীয় ছিল না। আমার মনে হয় সমস্ত মফস্‌সল শহরের মানুষেরাই কলকাতা এবং বৃহত্তর কলকাতার শ্রোতা এবং দর্শকদের চেয়ে অনেক বেশি মনোযোগী এবং শ্রদ্ধাশীল। তাঁদের অধিকাংশর মানসিক গভীরতাও হয়তো কলকাতায় মানুষদের চেয়ে বেশি। তার কারণ, হয়তো প্রকৃতি-যুক্ততা। মানুষের অনেক গুণই সম্ভবত হ্রাস অথবা লোপ পেয়ে যায় প্রকৃতি-বিযুক্ত হলে। অবশ্য আমার মত যে অভ্রান্ত এমন মনে করার মতো পণ্ডিতম্মন্যতা আমার নেই।

অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে রাত সাড়ে দশটা। পরদিনও হবে আবার ওই একই সময়ে। জলপাইগুড়ি শহরে অত রাতে শ্রোতাদের বাহন বলতে এক সাইকেল আর সাইকেল-রিকশা। সামান্য কয়েকটি গাড়ি দেখলাম। চা-বাগানের মালিক টালিকেরই হবে। আর অধিকাংশ শ্রোতাকেই পায়ে হেঁটেই ওই শীতের অন্ধকার রাতে বাড়ি ফিরতে দেখলাম আমাদের গাড়ির হেডলাইটে। ভারী অপরাধী মনে হচ্ছিল নিজেদের। এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাতেও মাথা নুয়ে আসছিল।

জলপাইগুড়ি পশ্চিমবঙ্গের চা-বাগানগুলির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র অথচ এই শহরের তেমন কোনো উন্নতি কেন যে হল না যুগযুগান্ত ধরে, তা ভাবলেও কষ্ট হয়। বহু বছর যাওয়া হয়নি। শুনেছি সাম্প্রতিক অতীতে পথঘাট এবং শহরের অনেকেই উন্নতি হয়েছে।

শুনে খুব ভালো লাগল। বীরেন ঘোষ, খাঁদা রায় (চা-বাগানের মালিক এবং ফুটবলার) এবং আরও অনেক বাঙালির কত যে চা-বাগান ছিল। রাইকতরাজের ছিল দুটি বাগান শিকারপুর আর ভাণ্ডাগড়ি। রাজকুমারী প্রতিভাদেবী এবং বীরেনবাবু আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। এখন বিজন নাগ, রাজকুমারীর ছোটো জামাই, চা-বাগানগুলি নিয়ে নিয়েছেন। সম্ভবত অন্য বাগানও কিনেছেন। কিন্তু তা নইলে অধিকাংশ বাগানই হস্তান্তরিত হয়ে গেছে। যে ক-টি আছে, তাও হয়তো যাবে কারণ মালিকেরা কলকাতাতে বসে ক্লাববাজি করেন, আর রাজাউজির মারেন, অধিকাংশ কর্মচারীরা চুরি করে শেষ করে দেন। সুযোগ বুঝে বিচক্ষণ মাড়োয়ারি ব্যাবসাদারেরা টাকা দাদন ও ধার দিতে থাকেন। তারপর একসময়ে বাগান কবজা করে নেন। দোষ তাঁদের নয়। তাঁরা ব্যাবসাদার। আমরা নিজেদের কাজ আর খাটনি ছাড়া আর সবকিছু করতে অত্যন্তই দড় হয়ে উঠেছি। নিজেদের কাজটি ছাড়া অন্য সব কিছুই ভালো বুঝি। এবং সেই কারণেই সমস্ত শিল্পবাণিজ্য, এমনকি চাকরি বাকরির ক্ষেত্রেই আজ এই অবস্থা আমাদের!

অবশ্য সব অন্য প্রদেশীয়রাই যে শুধু মেহনত আর সততার কারণেই সফল এ কথা আমি একবারও বলব না, কিন্তু এ কথা অবশ্যই বলব যে, তাঁরা প্রত্যেকেই আমাদের চেয়ে অনেকেই বেশি পরিশ্রম করেন, সৎ-অসৎ, বোকা-চালাক নির্বিশেষে।

সমরেশ মজুমদারের ছেলেরা যে কী যত্নআত্তি করলেন আমাদের জন্যে তা বলার নয়! সরকারি গেস্ট-হাউসে পৌঁছোতে পৌঁছোতে রাত এগারোটা হল। সকলেরই ধকল গেছে সকাল থেকে। একটু শরীর মেরামতি করতে চাইলেন অধিকাংশই। আমিও অরাজি ছিলাম না। কিন্তু খাবার-দাবার তো সবই ঠান্ডা হয়ে গেছিলই শীতের রাতে। তা গরম করার কোনো উপায়ও হল না, কারণ গেস্ট-হাউসের কর্মচারীরা (কর্মীরা) কুক-বেয়ারা-দারোয়ান ইত্যাদিরা বললেন, আমাদের ডিউটি আওয়ার্স শেষ। ওভারটাইমের সিস্টেমও নেই। তাই আমরা কিছুই করতে পারব না।

সমরেশের ছেলেরা তাঁদের প্রায় হাতে-পায়ে ধরলেন। বললেন, কলকাতা থেকে পশ্চিমবঙ্গের এত নামি-দামি সব লেখকেরা এসেছেন, জলপাইগুড়ির ইজ্জত রক্ষার্থে অন্তত একটু কষ্ট স্বীকার করে খাবারগুলি আধঘণ্টা পরে একটু গরম করে দিতে। কিন্তু তাঁরা তা করতেও অস্বীকার করলেন। ওই এক রাতই আমরা থাকব ওই সরকারি বাংলোতে। কারণ, পরদিন তো সোজাই চলে যাব চা-বাগানে, রবীন্দ্রভবন থেকে। কিন্তু ওই একটি রাতের জন্যেও তাঁরা তাঁদের ডিউটি আওয়ার্সের পরে আমাদের জন্যে অত কষ্ট করতে রাজি হলেন না। কেউ গিয়ে শুয়ে পড়লেন, কেউ অন্যত্র গেলেন। নিয়মনিষ্ঠা দেখে খুবই খুশি হলাম। নিয়মানুবর্তিতা ছাড়া কোনো জাতই কি বড়ো হতে পারে!

সমরেশ এবং তার ছেলেরা গাড়িতে করে খাবার নিয়ে গিয়ে কারও বাড়ি থেকে গরম করে নিয়ে এল। কিন্তু ওই শীতের রাতে গরম হয়ে আসতে আসতেই খাবার ঠান্ডা হয়ে গেল। ওরা অত্যন্তই লজ্জিত হল এবং আমরা দুঃখিত।

আমাদের শীতের রাতে ঠান্ডা খাবার খেতে হল। সমরেশ এবং উদ্যোক্তারা খুবই লজ্জিত এবং অপ্রতিভ হলেন কিন্তু সরকারি অতিথিশালার কর্মীদের (তিস্তা ব্যারাজের গেস্ট হাউস ছিল ওটি সম্ভবত) সে জ্ঞানই নেই।

পরদিন সঞ্জীব বড়ো ভালো গান গেয়েছিল নিজে হারমনিয়াম বাজিয়ে। গানটির কথা আমার এখনও মনে আছে। "ব্যাভারেতে বোঝা গেল"— প্রথম কলি।

পরদিন যখন আমাদের মালপত্র সব গাড়িতে তুলে নিয়ে আমরা অনুষ্ঠানে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে বিকেলে বেরোলাম— অনুষ্ঠান শেষেই চা-বাগানে চলে যাব সোজা— দেখি, গেস্ট হাউসের স্টাফেরা গেটের দুপাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন।

না! আমাদের সম্মান বা শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে নয়। ভালোবাসাও নয়। সম্মান ও শ্রদ্ধা আমাদের প্রত্যাশারও ছিল না, কারণ সাহিত্যিক বা কবি বা নাট্যকারকে সম্মান তাঁরাই করেন যাঁদের সাহিত্য-কাব্য-নাটকের সঙ্গে বিন্দুমাত্র যোগাযোগ আছে, যাঁরা বই পড়েন, গান শোনেন; বা নাটক দেখেন। শ্রদ্ধা বা সম্মান আমরা কেউই আশা করিনি ওঁদের কাছ থেকে, কারণ গত রাতের অপমান গভীর ক্ষতের মতো লেগেছিল প্রত্যেকেরই মনে। তাঁদের কাছে আমাদের কারওই আর কোনো প্রত্যাশা ছিল না। আশাপূরণের কারণে নয়, যা আমাদের প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছিল, বাঙালি হিসেবে, বাংলা ভাষার লেখক হিসেবে তা হল যাঁরা এক রাতের অতিথিদেরও খাবারটুকু একটু গরম করে দিতেও গররাজি ছিলেন অতজন স্থানীয় মানুষের এবং বেচারি সমরেশের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁরাই বকশিশ-এর জন্যে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়েছিলেন গেটের দুপাশে। বকশিশও যে অর্জনের বস্তু, সম্মানেরই মতো; ভিক্ষার ধন নয়। যে ন্যূনতম গুণ, মেধা নয়, সৌন্দর্য নয়, ডিগ্রি নয়, বৃত্তি নয়, যা নইলে কোনো মানুষই আর মানুষ থাকে না সেই গুণকুটুও যে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি— সেই আত্মসম্মান বোধটুকুকেও; তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে বড়োই ঘেন্না হয়েছিল নিজেদেরই ওপরে। আত্মসম্মানজ্ঞানই যাঁদের নেই তাঁরাও কি মানুষ!

না, জলপাইগুড়ির ওই শহরের ওই সরকারি অতিথিশালার মুষ্টিমেয় কর্মচারীর বিরুদ্ধেই এই অনুযোগ নয়, আমরা জাত হিসেবে ওঁদের সমগোত্রীয়ই হয়ে উঠেছি। আলাদা করে ওদের দোষী করাটা বোধহয় অন্যায়। ওঁরা আমাদেরই প্রতিভূ।

ধুতি-শাড়ি, পায়জামা, ট্রাউজার, ব্লাউজ, শার্ট পরলেই কিছু সব লজ্জাস্থান ঢাকা পড়ে না। প্রত্যেক মানুষেরই আরও কিছু লজ্জাস্থান থাকে। পরম দুঃখের বিষয় এই যে আজ আমরা আর সেই সব লজ্জাস্থান সম্বন্ধে সচেতন নই। চেহারাতেই মানুষ আমরা কিন্তু নিজেদের অজানিতে মনুষ্যেতর জীবের পর্যায়েই নামিয়ে এনেছি নিজেদের।

স্বামী হওয়া

মহুয়া মিলন থেকে আসা ট্রেনটা টোরি স্টেশনে ঢুকছিল।

স্মিতা এবং আমি নীচু প্ল্যাটফর্মের ওপরে দাঁড়িয়েছিলাম। আজ হাটবার। খুব ভিড় প্ল্যাটফর্মে। নানা জায়গা থেকে হাট করতে এসেছিল ওরাওঁ-মুন্ডা, ভোগতা-কোলহোরা।

সুমন স্যুটকেসটা হাতে করে নামল। নেমেই দৌড়ে এল আমাদের দিকে।

এসে, স্মিতাকে বলল, কেমন আছ বউদি?

স্মিতা বলল, কেমন করে ভালো থাকি বলো? তুমি এত্তদিন কাছে ছিলে না।

সুমন হাসল। আমিও হাসলাম।

এর পর সুমন আমাকে বলল, রোলস রয়েসটা এনেছ তো?

এনেছি।

তবে, চলো।

স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে আমার লজ্‌ঝড় অস্টিন গাড়িটার পেছনের দরজা খুলে সুমন উঠে বসল। পাশে স্মিতা। আমি ড্রাইভিং সিটে আসীন হলাম।

বসন্তের দিন। হু-হু করে হাওয়া আসছিল। পড়ন্ত রোদ্দুর সেগুন গাছের বড়ো বড়ো হাতির কানের মতো পাতার পেছনে পড়াতে, সিঁদুরে-রাঙা দেখাচ্ছিল পাতাগুলোকে। মহুয়ার গন্ধ ভাসছিল। ঠোঁট-মুখ চড়চড় করছিল রুখু বাতাসে।

স্মিতা বলল, তারপর? মা-বাবা বিয়ের কথা কী বললেন?

সুমন বলল, ধ্যুত। সে মা-বাবাই জানেন।

আহা! লজ্জায় যেন মরে গেলে তুমি।

ওকে গালে টুশকি মেরে বলল স্মিতা।

আমি লাতেহারের দিকে মোড় নিলাম। কিন্তু লাতেহারে যাব না।

চাঁদোয়ারই এক প্রান্তে আমার কোয়ার্টার। সুমনের। পাশাপাশি। সরকারি চাকরিতে এই রকম জঙ্গুলে জায়গায় যেমন কোয়ার্টার হতে পারে, তেমনই।

কোয়ার্টারে পৌঁছে গাড়িটা খাপরার চালের একচালা গ্যারেজে ঢুকিয়ে দিলাম।

স্মিতা সুমনকে বলল, তোমার বাহন ছোটুয়াকে বলে দিয়েছি কাল ভোরে চলে আসতে। আজ সকালেও একবার এসে ঘরদোর ধুয়েমুছে গেছে। চানুকে টুল পেতে সামনে বসিয়ে রেখেছিলাম সব সময়। পাছে কিছু খোয়া যায় তোমার।

সুমন উত্তেজিত হয়ে বলল, চানু কোথায়? চানু?

ততক্ষণে সুমনের গলা পেয়ে চানু টালমাটাল পায়ে দৌড়ে এল বুধাইয়ের মায়ের হেপাজত থেকে সাড়া পেয়ে। বলল, সুমনকাকু, তোমার সঙ্গে আড়ি।

সুমন স্যুটকেসটা নামিয়ে রেখেই চানুকে এক ঝটকায় কোলে তুলে নিয়ে বলল, তা হলে আমি মরেই যাব। তোমার সঙ্গে আড়ি করে কি আমি বাঁচতে পারি? তোমার মা-বাবা পারলেও বা পারতে পারে। আমি কখনও পারব না।

চানু অত বোঝে না। চার বছর বয়স তার মোটে। সে বলল, আড়ি, আড়ি, আড়ি।

স্মিতা, সুমন এবং আমিও হেসে উঠলাম।

স্মিতা বলল সুমনকে, জামা কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে নাও। দুপুরে খেয়েছিলে কোথায়?

দুপুরে আবার কোথায় খাব? যা হতচ্ছাড়া লাইন। এ সব জঙ্গলের জায়গা তোমাদের মতো কবি-কবি লোকের পক্ষেই ভালো লাগার। সাতসকালে বাড়কাকানাতে খাওয়ার খেয়েছিলাম। পথে ম্যাকলাস্কিগঞ্জে চা, কার্নি মেমসাহেবের দোকানের আলুর চপ। কালাপাত্তি জরদা দেওয়া পান। গোটা আষ্টেক। সারা পথে।

স্মিতা বিরক্তির গলায় বলল, তাই-ই। ঠোঁট দুটোর অবস্থা দেখেছ কী হয়েছে! এখানের গরমে-ফাটা লাল মাটির মতো।

সুমন বলল, কথা না বলে, শিগগিরি খেতে দাও তো।

আমি আমার ঘরে গেলাম। আমার প্রিয় ইজিচেয়ারটাতে বসলাম। আমার সাম্রাজ্যে। আমার বই, বইয়ের আলমারি; গড়গড়া। ছুটির দিনে গেঞ্জি আর পাজামা পরে সারা দিন বই পড়েই কাটে আমার। আমি বড়ো কুঁড়ে লোক। স্মার্ট, এনার্জেটিক, সামাজিক বলতে যে সব গুণ বোঝানো হয় তার কোনো গুণই আমার নেই। আক্ষেপও নেই, না-থাকার জন্যে।

তবে চাঁদোয়া-টোরিতে সরকারি কাজে বদলি হয়ে এসে পড়ার পরই বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। স্মিতার জন্যে। আমি তো সারাদিন কাজকর্ম নিয়ে থাকব। অবসর সময় বই পড়ব। কিন্তু আমার চেয়ে দশ বছরের ছোটো, সম্বন্ধ করে বিয়ে করা স্ত্রী স্মিতা? তার সময় কী করে কাটবে? ভাগ্যিস চানু হয়েছিল। এখানে যখন আসি তখন চানুর বয়স পনেরো মাস। তবুও একটা নরম খেলনা ছিল স্মিতার। যে খেলনাকে খাইয়েদাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে, চোখ রাঙিয়ে ওর সময় কেটে যেত।

সময় তবুও কাটত কি না জানি না, যদি সুমন এখানে বদলি হলে না আসত। বয়সে সুমন আর স্মিতা সমানই হবে। পাশের কোয়ার্টারে ও একা এসে উঠল। প্রথম প্রথম হাত পুড়িয়ে খাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু অভ্যেস ছিল না রান্না করার। অচিরে স্মিতার সঙ্গে ওর একটা সখ্যতা গড়ে উঠল। যদিও বউদি বলে ডাকত সুমন স্মিতাকে কিন্তু ওরা যে কত বড়ো বন্ধু একে অন্যের তা আমার মতো কেউই জানত না। সুমনকে পেয়ে স্মিতার যত ছেলেমানুষি শখ ছিল সব মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। পলাশগাছে উঠে ফুল পাড়ত স্মিতা কোমরে শাড়ি জড়িয়ে সুমনের সঙ্গে। কুরুর পথে আমঝরিয়ার বাংলোয় মুনলাইট পিকনিক করত। লাতেহারের কাছে বহু বছর আগে পরিত্যক্ত কলিয়ারির আশেপাশে ঘুরে ঘুরে শীতের দুপুরে ছেলেমানুষি প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ চালাত।

কখনও আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেত ওরা পীড়াপীড়ি করে। আমি না-গেলে নিজেরাই যেত। আমিও নিশ্চিন্ত মনে কলকেতে ডালটনগঞ্জের সাপ্লায়ারের দেওয়া অম্বুরি তামাক সেজে গড়গড়ার নল হাতে একটা বই নিয়ে আরাম করে ইজিচেয়ারে বসতাম। ওদের সঙ্গে যেতে যে হল না, এ কথা ভেবে আশ্বস্ত হতাম।

খাওয়ার টেবিলে ডাক দিল স্মিতা। আমিও এসে বসলাম। সিঙাড়া বানিয়েছে ও। ক্ষীরের পুলি। লাতেহারের পণ্ডিতজির দোকান থেকে শেওই আর কালাজামুন আনিয়েছে।

গবগব করে খেতে খেতে সুমন বলল, আরও দাও, আরও দাও বউদি। তুমি এমন কিপটে হয়ে গেলে কী করে এক মাসের মধ্যে?

স্মিতা কপট রাগের সঙ্গে বলল, কিপটে আমি? মালখাঁনগরের বোসের ঘরের মেয়ে। ওইসব পাবে না আমার কাছে।

সুমন আমাকে বলল, দেখছ রবিদা। ওই শুরু হল। সর্বক্ষণ এমন এনিমি-ক্যাম্পে থেকে থেকে আমার হাওড়া জেলার অরিজিনালিটিটাই মাঠে মারা গেল। বাড়ি গিয়ে ভাত খেতে বসে পেঁয়াজ, কাঁচা লংকা ছাড়া খেতে পারি না দেখে মা আর দিদির তো চক্ষুস্থির। তোমাদের গল্প করতাম সব সময়। দিদিমা বললেন, সুমন, তোকে শেষে ওই রেফিউজিগুলোর আদিখ্যেতায় পেল। ছিঃ ছিঃ।

কী বললে?

স্মিতা আবার সত্যিই বোধ হয় রেগে উঠল।

সুমন বলল, আহা রাগছ কেন, কী বললাম তাই-ই শোনো। আমি বললাম, বাঙালদের মন খুব ভালো হয় দিদিমা। খোলামেলা জায়গায় থাকত তো, আকাশ-জোড়া মাঠ, আদিগন্ত নদী, কত মাছ, কত ঘি, কত কী...।

দিদিমা বললেন, থাক, থাক। সব রেফিউজিই জমিদার ছেলে। ওসব আমাকে আর শোনাসনি। বহু শুনেছি।

বলেই সুমন হাসতে লাগল।

ও ছেলেমানুষ। ওর মনে কোনও জটিলতা নেই। কিন্তু ও একথাটা না বললেই ভালো করত। সকলেরই জমিদারি বা সচ্ছল অবস্থা না-থাকলেও যাদের ছিল, এ রকম কথা শুনলে তাদের বড়োই লাগে।

এখন বোধ হয় লাগে না আর। প্রথম প্রথম লাগত। এখন ব্যথার স্থান অবশ হয়ে গেছে। ক্ষত হয়েছে পুরোনো।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম।...

...বরিশালে আমাদের দোতলা বাড়ির চওড়া বারান্দায় পূর্ণিমার রাতে বসে আছি ইজিচেয়ারে। থামের ছায়াগুলো পড়েছে বারান্দাতে কালো হয়ে। দিঘির পাড়ের সার সার নারকোলগাছের পাতায় চাঁদের আলো চকচক করছে। সেরেস্তার দরজা জানালা বন্ধ। কুন্দনলালজি তাঁর ঘরের সামনে চৌপায়ার বসে দিলরুবাতে বাহারে সুর তুলছেন। গ্রামের লক্ষ্মীরা সন্ধ্যারতি শেষ করে শাঁখ বাজাচ্ছে। বাতাসে নারকোল পাতার নড়াচড়ার শব্দ। আরও কত কী গাছ! জামরুলগাছ, আমবাগান, লিচুগাছ, জলপাইগাছ, নীচে হাসনুহানা। কাঠটগরের ঝোপ। পাশে পাশে হরক রকমের চাঁপা। আমার দোতলা ঘরের জানালা অবধি উঠে এসেছে একটা কনকচাঁপার গাছ। গাড়ি ঢোকার পথের পাশে ছিল ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরার সারি।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলাম।

স্মিতা বলল, কী হল? তোমার চা যে ঠান্ডা হয়ে গেল!

সুমন বলল, রবিদাদা রাগ করলে নাকি?

আমি হাসলাম। বললাম, না রে পাগল।

স্মিতা সুমনকে বলল, আর দুটো শিঙাড়া খাবে?

সুমন বলল, দাও। কত্তোদিন পর তোমার হাতের খাবার খাচ্ছি।

তারপর বলল, আসলে, কলকাতায় গিয়ে তোমাদের গল্প, বিশেষ করে বউদির গল্প সকলের কাছে এতই করেছি, যে তোমাদের সকলেই হিংসে করতে আরম্ভ করেছে। বউদিকে তো বেশি করে!

স্মিতা চায়ের কাপটা মুখের কাছে ধরে ছিল। দেখলাম, কাপের ওপর ওর দুটি টানাটানা কালো চোখ সুমনের ওই কথার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেই নিথর হয়ে গেল।

চা খাওয়ার পর আমি আমার ঘরে ফিরে গেলাম।

সুমন চানুকে কাঁধে করে স্মিতার সঙ্গে ওর কোয়ার্টারে গেল। স্মিতা সব গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ে আসবে। অগোছালো, একা-লোকের সংসার।

যাওয়ার সময় স্মিতা বলে গেল, বুধাই-এর মাকে যে, একটু পরে এসে যেন চানুকে নিয়ে যায়। খাওয়ার সময় হয়ে যাবে চানুর।

ওরা দুজনে যখন ফিরল সুমনের কোয়ার্টার থেকে তখন রাত গভীর। আমি এডওয়ার্ড জোস্টিং-এর লেখা হাওয়াই-এর ইতিহাস পড়ছিলাম। ইতিহাস পড়তে পড়তে হাজার

বছরের ব্যবধান এত সামান্য মনে হয় যে ঘণ্টার খবর রাখতে তখন আর ইচ্ছে করে না।

দুপুরেই রান্না সেরে রেখেছিল স্মিতা। বুধাই-এর মা গরম করে দিল খাওয়ার-দাওয়ার।

স্মিতা খাবার সাজিয়ে ও এগিয়ে দিতে দিতে বলল, দ্যাখো। সুমন কত কী এনেছে আমাদের জন্যে। এইটা আমার শাড়ি। বলেই, চেয়ারের ওপর থেকে শাড়িটা তুলে দু হাতে মেলে ধরে দেখাল। তারপর বলল, এরকম একটাও শাড়ি তুমি আমাকে দাওনি।

আমি বললাম, এ তো দারুণ দামি শাড়ি।

সুমন বলল, বউদি কি আমার কম দামি?

স্মিতা আবার আমাকে বলল, এই যে! তোমার পাঞ্জাবি ও পায়জামা। এই চানুর জামা-প্যান্ট।

আমি রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললাম, করেছ কী সুমন, এই রকম নকশাকাটা চিকনের পাঞ্জাবি কি আমাকে মানায়? এ তো ছেলেমানুষদের জন্যে।

সুমন বলল, আপনি তো প্রায় তিন বছর কলকাতায় যান না। এখন তো এই-ই ক্রেজ। ঘাটের মড়ারা পর্যন্ত পরছে আর আপনি তো কিশলয় এখনও।

স্মিতা নরম গলায় বলল, এই যে শুনছ, দ্যাখো।

আমি বললাম, কী?

অ্যাই দ্যাখো, আমার জন্যে আরও কী এনেছ?

বলেই, ছোট দুটো প্যাকেট খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিল। দেখি, একজোড়া বেদানার দানার মতো রুবির দুল আর একটা ইন্টিমেট পারফ্যুম। ছোট্ট।

আমি সুমনকে বকলাম। বললাম, তুমি একটা স্পেন্ডথ্রিপট হয়ে গেছ। দিস ইজ ভেরি ব্যাড। সারা জীবন পড়ে আছে সামনে। বিয়ে করবে দুদিন পর। এমন বেহিসাবির মতো খরচ করে কেউ?

স্মিতা বলল, দ্যাখো না, বেশি বেশি বড়োলোক হয়েছেন!

সুমন বলল, বড়োলোকদের জন্যে বড়োলোকি না করলে কি চলে?

খেতে খেতে আমি ভাবছিলাম, সুমন বেশ সুন্দর সপ্রতিভ কথা বলে, যা আমি কখনও পারিনি। পারব না। স্মিতার যে ওকে এত ভালো লাগে তার কারণ অনেক। চিঠিও নিশ্চয়ই ভালোই লেখে। আমার তো এক লাইন লিখতেই গায়ে জ্বর আসে। আমাকে অবশ্য কখনও লেখেনি ও অফিসিয়াল ব্যাপারের চিঠি ছাড়া। তবে স্মিতাকে প্রায় তিন-চারটে করে চিঠি লিখত প্রতি সপ্তাহে। যতদিন ছিল না এখানে। এখানে ডাক পিয়োন চিঠি বিলি করে না। আমার অফিসের পিয়োন ছেদিলাল মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে ডাক নিয়ে আসে রোজ। ভারী ভারী চিঠি আসত পুরু খামে। সুমনের সুন্দর হাতের লেখায় স্মিতার নাম লেখা থাকত। কোনোদিন ছেদিলাল পোস্টঅফিস যেতে দেরি করলে বুধাই-এর মাকে পাঠাত স্মিতা আমাকে মনে করিয়ে দিতে, চিঠি আনার জন্যে।

যে কটাদিন সুমন ছিল না, লক্ষ করলাম স্মিতা কেমন মনমরা হয়ে থাকত। বেলা পড়ে এলে, গা-টা ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে, শালজঙ্গল ও পাহাড়ের দিকে চেয়ে, স্মিতা বাইরের সিঁড়ির ওপর বসে থাকত। শেষ বিকেলের আলোর মতো নরম হয়ে আসত ওর মুখের ভাব সুমনের চিঠি পড়তে পড়তে। ঘর থেকে আমি ডাকতাম ওকে, ও শুনতে পেত না। কোথায়, যেন কত দূরে চলে যেত ও মনে মনে।

॥ ২ ॥

সুমন শিগগিরি কলকাতা যাবে। ওর বিয়ে ঠিক করেছেন মা-বাবা। সকালে রাঁচি গেছে ও নতুন স্কুটার ডেলিভারি নিতে।

অফিস থেকে ফিরছিলাম হেঁটেই। আমাদের অফিসটা কোয়ার্টারের কাছেই। দু ফার্লং মতো। অফিস যাতায়াতের জন্যে গাড়ি কখনও নিই না এক বর্ষাবাদলের দিন ছাড়া। আকাশে তখন আলো আছে। জঙ্গল থেকে শালফুলের গন্ধ ভেসে আসছে হাওয়ায়। তার সঙ্গে মহুয়া এবং করৌঞ্জের গন্ধ। পথের পাশে, জঙ্গলের শাড়ির পাড়ে ফুলদাওয়াই-এর লাল ঝাড়ে মিনি-লংকার মতো লাল ফুল এসেছে। মাঝে মাঝে কিশোরীর নরম স্বপ্নের মতো ফিকে ফিকে বেগনি জিরহুলের ঝোপ।

লাতেহারের দিক থেকে একটা ট্রাক জোরে চলে গেল চাঁদোয়ার দিকে। লাল ধুলো উড়ল, মেঘ হল ধুলোর; তারপর আলতো হয়ে ভাসতে ভাসতে পথের দু-পাশের পাতায় গাছে ফিশফিশ করে চেপে বসল।

মিশিরজি আসছিলেন সাইকেল নিয়ে বস্তির দিক থেকে। দেহাতি খদ্দরের নীল পাঞ্জাবি আর ধুতি পরে। হাওয়াতে তাঁর টিকি উড়ছিল। দূর থেকেই আমাকে দেখে বললেন, পরনাম বাবু।

আমি বললাম, প্রণাম।

হিন্দিটা আমি তখনও যথেষ্ট রপ্ত করতে পারিনি। সেদিকে সুমন পটু। পানের দোকানের সামনে সাইকেল ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে জরদা-পান খেতে খেতে ওর সমবয়সি স্থানীয় ছেলেদের সঙ্গে এমন ঠোঁট মিলিয়ে হিন্দিতে গল্প করে অথবা হিন্দি সিনেমার গান গায় যে, কে বলবে ও স্থানীয় লোক নয়। সব মানুষকে আপন করে নেওয়ার একটা আশঙ্কা সহজাত ক্ষমতা আছে সুমনের। ওর মধ্যে অনেক কিছু ভালো জিনিসই আছে যা আমার মধ্যে নেই।

মিশিরজি, সাইকেলের টায়ারে কিরকির শব্দ করে নামলেন।

বললেন, হালচাল সব ঠিক্কে বা?

বললাম, ঠিক্কেই হ্যায়।

সুমনবাবু কি কলকেত্তাসে শাদি করিয়ে আসলেন এবার।

আমি অবাক হয়ে বললাম, না তো!

মিশিরজি অবাক হয়ে বললেন, আভভি যাত্তে দেখা উনকা স্কুটারমে। নীচমে কই খাবসুরত আওরত থি। বাড়ি প্যায়ার সে সুম্মনবাবুকা পাক্কড়কে বেঠি হুয়ি থি।

আমি অবাক হলাম। বললাম, নেহি তো। বিয়ে তো করেনি।

তাজ্জুব কি বাত। তব সুমনবাবুকা সাতমে উও কওন থি?

আমার মুখ ফসকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, মেরা বিবি ভি হোনে শকতি। দুজনের মধ্যে খুব দোস্তি।

মিশিরজি বললেন, আজিবন আদমি হ্যায় আপ বড়োবাবু। দোস্তি অউর পেয়ার কখনও এক হয়? আর মরদ অউর আওরতের মধ্যে কি দোস্তি হয় বড়োবাবু? খালি পেয়ারই হোবে।

তারপরই হো হো করে হেসে বললেন, আপ বড়ি হিউমারাস আদমি হোঁ। নহি তো, নিজের ধরমপত্নী কি বারেমে অ্যায়সি মজাক কেউ করতে পারে কভভি?

আমার মুখ থেকে প্রায় বেরিয়ে এসেছিল যে, মজাক করিনি আমি।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল, স্মিতা সব সময় আমাকে বলে, তুমি খুব বোকা। কোথায় কী বলতে হয় জান না।

সত্যিই বড়ো বোকা আমি।

বাড়ি ফিরেই জানতে পেলাম যে, সত্যিই আমি মজাকি করিনি। রাঁচি থেকে নতুন স্কুটার ডেলিভারি নিয়ে এসেই সুমন তার বউদিকে পিছনে চড়িয়ে টোরি থেকে বাঘড়া মোড়ে যে পথটা চলে গেছে তার মাঝামাঝি জায়গায় গভীর জঙ্গলের মাঝে "দেও" এর থানে পুজো চড়াতে গেছে।

চানুটা কান্নাকাটি করছিল। আমাকে বলল, বল খেলতে। আমি এসব পারি না। তবুও, চা-টা খেয়ে বুধাই-এর মাকে বাড়ির কাজ করতে বলে আদর্শ বাবা চানুর সঙ্গে ওর লাল রবারের বল নিয়ে কোয়ার্টারের পেছনের মাঠে বল খেলতে লাগলাম।

আমার মন পড়েছিল হাওয়াই-এর রাজা কামেহামেহার রাজত্বে। অন্যমনস্ক থাকায় অচিরে বলটা লাফাতে লাফাতে কুয়োর গিয়ে পড়ল। বালতি নামিয়ে অনেক চেষ্টা করেও উঠোতে পারলাম না বলটাকে। চানু কাঁদতে কাঁদতে বলল, সুমনকাকা তুলে দিয়েছিল, তুমি পারলে না। তুমি কিচ্ছু পার না, বাবা।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বললাম, সুমনকাকা এসেই তুলে দেবে।

তারপর চানুকে আবার বুধাই-এর মার জিম্মাতে দিয়ে আমি আমার ইজিচেয়ারে শায়িত হয়ে রাজা কামেহামেহার কাছে ফিরে গেলাম।

ওদের ফিরতে বেশ রাত হল। স্মিতার শাড়ি এলোমেলো, ধুলোলাগা বিস্রস্ত চুল। খোঁপায় দলিত জংলি ফুল আর মুখে কী এক গভীর আনন্দের ছাপ।

সুমন বলল, স্কুটারটা খারাপ হয়ে গেছিল বাঘের জঙ্গলে। কী ভয় যে করছিল, কী বলব। বাঘের জন্যে নয়, পরস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এত রাত হল বলে।

আমি বললাম, ফাজিল।

চানু বলল, এক্ষুনি আমার বল তুলে দাও সুমনকাকু। বাবাটা কিচ্ছু পারে না। বল পড়ে গেছে কুয়োর মধ্যে।

সুমন ওই অন্ধকারেই টর্চ হাতে করে কুয়ো পাড়ে গিয়ে চানুর বল তুলে নিয়ে এল। তারপর রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে চলে গেল।

সে রাতে স্মিতাকে আদর করতে যেতেই ও বলল, আজ থাক লক্ষ্মীটি। আজ ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

ওর সুন্দর, ছিপছিপে, এলানো শরীর, গভীর নিশ্বাস, ওর বুকের ভাঁজে সুমনের দেওয়া ইন্টিমেট পারফ্যুমের গন্ধ সব মিলেমিশে ওকে বিয়ের রাতের স্মিতার মতো মনে হচ্ছিল।

আমি আর কিছু বলার আগেই স্মিতা ঘুমিয়ে পড়ল। চাঁদের আলোর একফালি জানালা দিয়ে বিছানায় এসে পড়েছিল। স্মিতার মুখে বড়ো প্রশান্তি দেখলাম। খুব, খুব, খুউব আদর খাওয়ার পর, আদরে পরম পরিতৃপ্ত হবার পর মেয়েদের মুখে যেমন দেখা যায়।

আমার ঘুম আসছিল না। মিশিরজির দাঁতগুলো ফাঁক-ফাঁক। পান খেয়ে খেয়ে কালো হয়ে গেছে সেগুলো। গায়ে দেহাতি ঘামের পুরুষালি গন্ধ। হঠাৎ মিশিরজির ওপর খুব রাগ হল আমার। তাই ইজিচেয়ারে শুয়ে টেবিল-লাইট জ্বালিয়ে রাতের অন্ধকারে প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে হাওয়াই-এর রাজা কামেহামেহা ও রানি কাহুমানুর কাছে ফিরে গেলাম। খুব প্রশান্তি।

ইতিহাসের মতন আনন্দের, শান্তির আর কিছুই নেই।

পরদিন চা খেতে খেতে স্মিতা বলল, সুমনের বিয়ের কথা লিখে আবার চিঠি দিয়েছেন ওর বাবা। কাল-পরশু ওর এক কাকা আসবেন রাঁচি হয়ে, ওর কাছে ওই ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করতে। আমি কিন্তু খেতে বলে দিয়েছি তাঁকে। যেদিন আসবেন, সেদিন রাতে।

আমি বললাম, বেশ করেছ। না বললেই অন্যায় করতে।

॥ ৩ ॥

সুমনের কাকার চেহারাটা আমার একটুও ভালো লাগল না। ভদ্রলোক ট্রেন থেকে নেমেই সকালের বাসে এসে নাকি এখানকার নানা লোকের সঙ্গে দেখা করেছেন। সুমনের কাছে যখন অফিসে এসে পৌঁছোন, তখন বিকেল চারটে। রাতে যখন খেতে এলেন আমাদের বাড়ি, তখনই তাঁকে দেখলাম। অশিক্ষিত বড়োলোকদের চোখেমুখে যেমন একটা উদ্ধত নোংরা ভাব থাকে, এই ভদ্রলোকের মুখেও তেমন। বালিতে থাকেন। লোহা-লক্কড়ের ব্যাবসা করেন। কালোয়ার ভদ্রলোক কেবল স্মিতাকে লক্ষ করছিলেন। বেশ অভব্যভাবে।

আমার মনে হল, উনি আসলে সুমনের বিয়ের কারণে আসেননি। এসেছেন স্মিতাকে দেখতে।

খেতে খেতে অসম্মান ও অপমানে আমার কান লাল হয়ে উঠল।

সেই রাতেই আমি প্রথম স্মিতাকে কথাটা বললাম। না বলে, পারলাম না। মিশিরজির কথা বললাম। সুমনের কাকার কথা বললাম। বললাম, ছোটো জায়গা, অশিক্ষিত অনুদার সব লোকের বাস। বাড়ির বাইরে একটু বুঝে-শুনে চলাফেরা করতে।

স্মিতা চুপ করে আমার কথা শুনল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু কিছুই বলল না।

আমি বললাম, তোমার ব্যবহারে সুমনকে যদি তোমার স্বামী বা প্রেমিক বলে ভুল করে বাইরের লোকে তা হলে আমার পক্ষে তা কি খুব সম্মানের হয়।

স্মিতা রেগে উঠল। বলল, আচ্ছা! তুমি কী? স্কুটারে বসলে যে চালায় তাকে না জড়িয়ে ধরে কেউ বসতে পারে?

তারপর বলল, মিশিরজি বা কে কী বলল, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। তুমি কী বল সেইটেই বড়ো কথা।

আমি বললাম, আমি কি কখনও কিছু বলেছি? কিন্তু নিজের সম্মানের কারণে না বলেও তো উপায় দেখছি না এখন। তোমাকে যদি লোকে খারাপ বলে, তা কি আমার ভালো লাগবে?

স্মিতা বলল, নিজের মনের কথাও যে ওই, তা তো বললেই পার। অনেকদিন আগে বললেই পারতে। নিজের কথা অন্যের মুখের বলে চালাচ্ছ কেন?

আমি স্মিতার কথায় ব্যথিত হলাম। কিছু না বলে, ইজিচেয়ারে, আমার নিরুপদ্রব রাজত্বে ফিরে গেলাম।

তার কদিন পরেই সুমনের খুব জ্বর হল। আমি বলেছিলাম ও আমাদের বাড়িতেই এসে থাকুক। ছেলেমানুষ, বিদেশে বেহুঁশ অবস্থায় একা বাড়িতে থাকবে কী করে? তা ছাড়া, কদিন পরই ওর বিয়ে। কী অসুখ থেকে কোন অসুখে গড়ায় তা কে বলতে পারে?

স্মিতা জেদ ধরে বলেছিল, না। আমাদের বাড়িতে ও মোটেই থাকবে না।

বলেছিলাম, তা হলে ওর সেবা-শুশ্রূষা করো। রাতে না-হয় আমিই গিয়ে থাকব। তুমিও থাকতে পার ইচ্ছে করলে।

স্মিতা বলল, থাক, এত ঔদার্য নাই-ই-বা দেখালে। তোমার মিশিরজিরা কি তা হলে চুপ করে থাকবে?

সারাদিন স্মিতাই দেখাশোনা করল। রাতে আমিই গেলাম সুমনের বাড়ি। ওর শোবার ঘরে ক্যাম্পখাট পেতে, থার্মোমিটার, ওষুধ, ওডিকোলন সব ঠিকঠাক করে দিয়ে গেল স্মিতা।

নতুন জায়গায় ঘুম আসছিল না আমার। অনেকক্ষণ জেগে বসে বসে সিগারেট

খেলাম। তারপর পাশের ঘরে গেলাম। সুমন তখন ঘুমোচ্ছিল। পাশের ঘরে টেবিলে একটি চিঠি পড়েছিল। ইনল্যান্ড লেটারে লেখা। সুমনের নামের। সুমনের মা-র লেখা চিঠি।

কেন জানি না, ওই নিস্তব্ধ রাতে, ঝিঁঝির ডাকের মধ্যে আমার মন বলল, এই চিঠির ভেতরে এমন কিছু আছে যা স্মিতা ও সুমনের সম্পর্ক নিয়ে লেখা। টেবিল-লাইটের সামনে চিঠির ভিতরে আঙুল দিয়ে চিঠিটা গোল করে ধরে পড়তে লাগলাম চিঠিটা। যতটুকু পড়তে পারলাম তা-ই যথেষ্ট ছিল।

সুমনের মা লিখেছেন, সুমনের কাকার চিঠিতে জানতে পেরেছেন তিনি যে, সুমন একটি ডাইনির পাল্লায় পড়েছে। এক ভেড়ুয়ার বউ সে। সুমন জানে না যে, সুমনের কত বড়ো সর্বনাশ সেই মেয়ে করছে ও করতে চলেছে। সুমন ছেলেমানুষ। মেয়েদের পক্ষে কী করা সম্ভব আর কী অসম্ভব সে সম্বন্ধে ওর কোনো ধারণাই নেই। সুমনের ভাবী শ্বশুরবাড়ির লোকেদের কোনো আত্মীয়ের কাঠের ব্যবসা আছে লাতেহারে। তাঁরাও খোঁজ নিয়ে জেনেছেন যে, সুমনের কাকা যা জানিয়েছেন, তা সত্যি। পাত্রীপক্ষ বেঁকে বসেছে যে, ওই বজ্জাত স্ত্রীলোকের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ না করলে এবং বিয়ের পরেই ওখান থেকে ট্রান্সফার নিয়ে চলে আসার চেষ্টা না করলে এ বিয়ে হবে না। এত সুন্দরী ও বড়োলোকের মেয়েও আর পাওয়া যাবে না। তাদের দেয় পণের টাকাতেই সুমনের বোন বিনুর বিয়ে হয়ে যাবে। যদি সুমনের তার বাবা, মা, বোন তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য এবং তার নিজের সম্বন্ধেও কোনো মমত্ব থাকে তা হলে ওই রেফিউজি ডাইনির সঙ্গে সব সম্পর্ক এক্ষুনি ত্যাগ করতে হবে। সুমনের ট্রান্সফারের জন্যে অথবা সেই ডাইনির ভেড়া স্বামীর ট্রান্সফারের জন্যে পাটনাতে তাঁরা মুরুব্বি লাগিয়েছেন। সুমনের সমস্ত ভবিষ্যৎ ও তার কচি মাথা ওই ডাইনি কাঁচা চিবিয়ে খাচ্ছে। অমন ছেনাল মেয়েছেলের কথা ওঁরা জন্মে শোনেননি।

বড়ো ভুল হয়ে গেছিল আমার। হাওয়াই-এর ইতিহাসটা বাড়িতে রেখে এসেছিলাম। আমার ঘুম হবে না। কামেহামেহার সঙ্গে থাকলেই ভালো করতাম।

পরে মনে হল, এ চিঠিটা স্মিতাকে দেখানো উচিত। আমার মতো স্বামী বলে কি আমার চোখের সামনে যা নয় তাই করে বেড়াবে। ওদের মধ্যে সম্পর্ক কতদূর গড়িয়েছে তা কে জানে? এই সম্পর্কে সুমনের উৎসাহই বেশি ছিল, না স্মিতার নিজের, তা ভগবানই জানেন। এ সংসারে ভালোমানুষীর শাস্তি এইভাবেই পেতে হয়। ভালোমানুষ মানেই বোকা মানুষ। যে নিজের জরু-গোরু শক্ত হাতে পাহারা দিয়ে রাখতে না পারে, তার মান-সম্মান এমনি করেই ধুলোয় লুটোয়। বড়ো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন এই পৃথিবী, এই মেয়েছেলের জাত। এরা কার ছেলে কখন কোলে করে বড়ো করে, তা আমার মতো ভেড়া স্বামীর জানার কথা নয়।

দ্য ল্যাম্ব। ভেড়া। সত্যি সত্যিই আমি একটা ভেড়া।

॥ ৪ ॥

সুমনের জ্বর যেদিন ছাড়ল সেদিনও লিকুইডের ওপর রাখল স্মিতা ওকে। পরদিন সুমন যা যা খেতে ভালোবাসে সুজির খিচুড়ি, মুচমুচে বেগুনি, কড়কড়ে করে আলুভাজা, হট-কেসে ভরে খাবার নিয়ে গিয়ে খাইয়ে এল স্মিতা।

জ্বর ভালো হতেই সুমন একদিন বলল, রোজ রোজ আমাদের বাড়ি এসে খাওয়াদাওয়া করতে ওর অসুবিধা হয়। এবার থেকে ছোটুয়াই রেঁধেবেড়ে দেবে ওকে। তা ছাড়া, সাতদিন পরে তো ও চলেই যাচ্ছে। বলল, স্মিতার কষ্ট এবার শেষ হবে।

সুমনের বিয়েতে সুমন আমাদের কাউকেই কলকাতায় যেতে বলল না। আমাদের নামে, ওদের বাড়ি থেকে কোনো কার্ডও এল না। সুমনই একটা কার্ডে কালো কালি দিয়ে আমাদের নাম লিখে পাঠিয়ে দিল ছোটুয়ার হাতে।

স্মিতা আমাকে বলল, বিয়ে করতে যাচ্ছেন, ভারী লজ্জা হয়েছে বাবুর। বিয়ে যেন আর কেউ করে না। নিজে হাতে কার্ড দিতে লজ্জা!

সুমন যেদিন যায়, রাঁচি হয়ে গেল ও। আমরা বাসস্ট্যান্ডে ওকে তুলে দিয়ে এলাম। চানু বলল, কাকিমাকে নিয়ে এসো কিন্তু সুমনকাকু। আমরা খুব বল খেলব।

স্মিতা হেসে বলল, তোমার ঘর ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখব, স্টেশনে তোমাদের আনতে যাব আমরা। সেদিন তোমার বাড়িতে রান্নাবান্নার পাট রেখো না। আমাদের বাড়িতেই খাওয়াদাওয়া করবে, থাকবে সারাদিন।

সুমন জবাব দিল না কোনো।

শুধু বলল, চলি।

বাসটা ছেড়ে দিল।

সুমন চলে যাওয়ার পরই আমাদের বাড়িতে আশ্চর্য এক বিষাদ নেমে এল। সুমন, এর আগেও অনেকবার ছুটিতে গেছে। কিন্তু এবারের যাওয়াটা অন্যরকম। যে সুমন বাসে উঠে চলে গেল সেই সুমন আর ফিরবে না এই টোরিতে। আমি সে কথা জানতাম। স্মিতাও জানত। যদিও ভিন্নভাবে।

এবারে গিয়ে অবধি একটাও চিঠি দিল না সুমন স্মিতাকে। আমাকে না জানিয়ে ছেদিলালকে পোস্টাপিসে পাঠাত স্মিতা চিঠির খোঁজে। স্মিতার মানসিক কষ্ট দেখে আমি এক পরম পরিতৃপ্তি পেতাম। যে, নিজে কাউকে আঘাত দিতে শেখেনি, দুঃখ দিতে জানেনি, তার অদেয় আঘাত ও দুঃখে যে অন্যজনকে অন্য কোণ থেকে এসে বাজছে, এই জানাটা জেনে ভারী ভালো লাগছিল আমার।

মনে মনে বললাম, শাস্তি সকলকেই পেতে হয়। তোমাকেও পেতে হবে স্মিতা।

স্মিতা আমার সঙ্গে কোনোদিনও সুমনের এই হঠাৎ পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করেনি। সুমনের সঙ্গেও করেছিল বলে জানি না। করলেও তা আমার জানার কথা নয়।

ওদের সম্পর্কটা গভীর ছিল বলেই, সুমনের হঠাৎ পরিবর্তনের আঘাতটা স্বাভাবিক কারণেই বড়ো গভীরভাবে বেজেছিল ওর বুকে।

এ কথা বুঝতাম।

স্মিতা মুখ বুজে সংসারের সব কর্তব্যই করত। আমাকে খেতে দিত। জামা-কাপড় এগিয়ে দিত। লেখাপড়ার টেবিল গুছিয়ে রাখত। শোওয়ার সময় মশারি গুঁজে দিত। তারপর নিজে বারান্দায় গিয়ে বসে থাকত।

মাঝরাতে উঠে বাথরুমে যেতে গিয়েও দেখতাম স্মিতা বারান্দায় বসে আছে অন্ধকারে।

বলতাম, শোবে না?

পরে। অস্ফুটে বলত ও।

শুধোতাম, মশা কামড়াচ্ছে না?

ও বলত, নাঃ!

আমি মনে মনে বলতাম, পোড়ো, নিজের কৃতকর্মের আগুনে পুড়ে মরো নিজে।

ব্যাটারিতে-চলা একটা রেকর্ড প্লেয়ার ছিল আমাদের বাড়িতে। বিয়ের সময় কে যেন দিয়েছিল। তাতে ওই সময় একটা গান প্রায়ই চাপাত স্মিতা। রবিঠাকুরের গান : "মোরা ভোরের বেলায় ফুল তুলেছি দুলেছি দোলায়, বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি বকুলের তলায়..." ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রথম লাইন : পুরোনো সেই দিনের কথা...

রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে আমার কোনো আসক্তি নেই। খুব বেশি শুনিওনি। কিন্তু ওই গানটার মধ্যে একটা চাপা দুঃখ ছিল। সেটা আমার অসহ্য লাগত।

একদিন স্মিতা সন্ধ্যাবেলায় পাণ্ডেসাহেবের বাড়িতে গিয়েছিল চানুকে নিয়ে তাঁর মেয়ের জন্মদিনে। সেই সময় তাক থেকে বই নামাতে গিয়ে আমার হাতের ধাক্কা লেগে রেকর্ডটা মেঝেয় পড়ে ভেঙে গেল।

আমি কি অবচেতন মনে রেকর্ডটাকে ভাঙতেই চেয়েছিলাম। জানি না।

বুধাই-এর মা শব্দ শুনে দৌড়ে এল। আমি বললাম, বই নামাতে গিয়ে পড়ে গেল। এগুলো তুলে রাখো। বউদি এলে দেখে যে কী করবে, বউদিই জানে।

স্মিতা ফিরে এসে শুনল। ও ভাঙা টুকরোগুলোকে ফেলে না-দিয়ে যত্ন করে তুলে রাখল। আমাকে কিছুই বলল না। জবাবদিহিও চাইল না।

"আরেকটি বার আয়রে সখা প্রাণের মাঝে আয়,
মোরা সুখের দুখের কথা কব প্রাণ জুড়াবে তায়"...।

খেতে দাও বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। কখনোই চ্যাঁচাই না আমি। কিন্তু সে রাতে চ্যাঁচালাম। কী জানি, কেন?

স্মিতা আমাকে খেতে দিল। চানুকে খাওয়াল।

আমি বললাম, খাবে না?

নিরুত্তাপ নৈর্ব্যক্তিক গলায় বলল, তোমরা খাও। এই-ই তো খেলাম। খিদে নেই। পরে খাব।

আমি বুঝতে পারছিলাম স্মিতা আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে।

বুধাই-এর মা বলল, তুমি বিমার পড়বে, মাইজি। কিছুই খাওয়াদাওয়া করছ না তুমি!

স্মিতা ওকে ধমকে বলল, তুমি চুপ করো তো! অনেক খাই।

আমি আঁচাতে আঁচাতে ভাবছিলাম সুমন চলে যাবার পর সত্যিই অনেক রোগা হয়ে গেছে স্মিতা। কিন্তু কী বলব, কেমন করে বলব, ভেবে পেলাম না।

শুধু বললাম, নিজের শরীরের অযত্ন করলে নিজেই ঠকবে।

স্মিতা আমার কথার কোনো জবাব দিল না। আমার হাতে লবঙ্গ দিল। রোজ যেমন দেয়। তারপর আমার সামনে থেকে নিঃশব্দে চলে গেল।

॥ ৫ ॥

কাল সুমনরা আসবে।

স্মিতা আর আমি দুজনেই গাড়ি নিয়ে রাঁচি গিয়ে ফিরায়েলালের দোকান থেকে সুমন আর সুমনের স্ত্রী অলকার জন্যে আমাদের সাধ্যাতীত প্রেজেন্ট কিনে এনেছি। ফুলের অর্ডার দিয়ে এসেছি। কাল সকালের বাসে টাটকা মাছ, ফুল, রাবড়ি, সন্দেশ সব নিয়ে আসবে বলে বাসের ড্রাইভারকে টাকা এবং বকশিশও দিয়ে এসেছি।

স্মিতার ভাই নেই। আমারও নেই। বেশ ভাইয়ের বিয়ে, ভাইয়ের বিয়ে মনে হচ্ছে আমাদের।

ভোর পাঁচটা থেকে উঠে পড়েছে স্মিতা। একদিনে, অনেক রোগা হয়ে গেছে ও সত্যিই। কিন্তু চেহারাটা যেন আরও সুন্দর হয়েছে। চোখ দুটি আরও বড়ো বড়ো, কালো, কাজল টানা। বিরহ, মানুষকে সুন্দর করে। চোখের সামনেই দেখছি।

অন্যান্য রান্না করতে না-করতেই মাছ এসে গেল। দই মাছ করেছে, কাতলা মাছের। খুব ভালোবাসে সুমন। মুড়িঘণ্ট। মাছের টক। মুরগির কারি। পোলাও। সঙ্গে তো মিষ্টি; রাবড়ি আছেই। রাতের জন্য আরও বিশেষ বিশেষ পদ। ফিশ রোল।

আমি অফিসে একবার বুড়ি-ছুঁয়েই চলে এসেছি। অফিসে সুমনের সব সহকর্মীরাও উৎসুক হয়ে কখন ওরা এসে পৌঁছোয় তার প্রতীক্ষায় ছিল। আমার এখানেই চলে আসতে বলেছি সকলকে সুমনের "বড়ে-ভাইয়া" হিসাবে। ওদের সকলের জন্যে মিষ্টি-টিষ্টিও এনে রেখেছি। বউ দেখে মিষ্টিমুখ করে যাবে বলে।

স্মিতা রান্নাবান্না এগিয়ে নিয়েই সুমনের কোয়ার্টারে গেল ফুলশয্যার ঘর সাজাতে। নিজের আলমারি খুলে নতুন ডাবল-বেডশিট, ডানলোপিলোর বালিশ, মায় আমার সাধের কোলবালিশটিকে পর্যন্ত ধোপাবাড়ির ওয়াড়-টয়াড় পরিয়ে ভদ্রস্থ করে নিয়ে চলে গেছে।

এমনই ভাব যে, সুমন নতুন বউ এর সঙ্গে শোবে না তো যেন স্মিতার সঙ্গেই শোবে। মেয়েদের ভালোবাসার রকমটাই অদ্ভুত।

যে সময়ে ওদের আসবার কথা, সে সময়ে ওরা এল না। আমি দুবার খোঁজ নিলাম অফিসে কোনো ফোন এসেছে কি না রাঁচি থেকে তা জানার জন্যে। রাঁচি এক্সপ্রেস ভোরেই পৌঁছোয়। রাঁচি থেকে আসা সব বাসও চলে গেল।

দুপুরের খাবারদাবার সব তৈরি, এমন সময় আমাদের অফিসের চৌধুরি এসে বলল যে, সুমন চিঠি লিখেছে যে, প্লেনে আসছে কলকাতা থেকে। এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা আসবে এখানে। বিকেল বিকেল পৌঁছোবে। রাঁচির মেইন রোডের "কোয়ালিটি"তে লাঞ্চ করে। ও আমাকে কিছুই জনায়নি শুনে চৌধুরিও খুব অবাক হল।

স্মিতাকে জানালাম। বললাম, চলো, তা হলে বসে থেকে আর লাভ কী হবে? আমরা খেয়েই নিই।

স্মিতা আমাকে খেতে দিল। কিন্তু নিজে খেল না। বলল, সারাদিন রান্নাঘরে ছিলাম, গা-বমিবমি লাগছে।

স্মিতা এই খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ওর আনত চোখে বড়ো ব্যথা দেখলাম।

সন্ধের মুখে মুখে সুমন আর অলকা এল ট্যাক্সিতে করে। সঙ্গে কোয়ালিটির খাবারের প্যাকেট। রাঁচির কোয়ালিটি থেকে তন্দুরি চিকেন আর নান নিয়ে এসেছে রাতের খাওয়ার জন্যে।

এ খবরটা আমি আর স্মিতাকে দিলাম না।

ওরা যেহেতু আমাদের বাড়িতে এলই না, অফিসের সকলে ওখানেই গেল।

বুধাই-এর মা এবং আমি নিজে মিষ্টি-টিষ্টি সব বয়ে নিয়ে গেলাম ওর কোয়ার্টারে। সুমনের দাদা হিসাবে সকলকে যত্নআত্তি করলাম।

সকলে বলল, বউদি কোথায়? ভাবিজি কোথায়?

আমি বললাম, আসছে।

তারপর আমি নিজেই স্মিতাকে নিতে এলাম। দেখলাম, স্মিতা চান করে সুমনের কলকাতা থেকে আনা সেই সুন্দর লাল আর কালো সিল্কের শাড়িটা পরেছে। কানে সুমনের দেওয়া বেদানার মতো রুবির দুল। গায়ে সুমনেরই ইন্টিমেট পারফ্যুমের গন্ধ।

আমি বললাম, চলো স্মিতা।

স্মিতা বলল, সুমনের স্ত্রী কেমন দেখলে?

আমি বললাম, দেখিনি এখনও।

চানু আগেই বুধাই-এর মায়ের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। আমি আর স্মিতা এগোলাম।

আমাদের দেখে সুমন উঠে দাঁড়াল। স্ত্রীকে বলল, এই যে রবিদা আর বউদি।

সুমনের স্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে আমাকে নমস্কার করল। স্মিতার দিকে ফিরেও তাকাল না।

সুমন, ঠান্ডা নৈর্ব্যক্তিক গলায় বলল, বউদি! কেমন হয়েছে আমার বউ?

স্মিতা মুখ নীচু করে বলল, ভালো, খুব ভালো।

বলেই বলল, তোমরা খেতে রাতে আমাদের ওখানে যাবে তো?

অলকা কাঠ-কাঠ গলায় সুমনের দিকে তাকিয়ে বলল, রাতের খাবার তো নিয়ে এসেছি রাঁচি থেকে। কষ্ট করার কী দরকার ওঁদের।

স্মিতা কিছুই বলতে পারল না।

আমি বললাম, তোমরা যা ভালো মনে কর, করবে।

অফিসের সহকর্মীরা হইহই করে উঠল। বলল, ইয়ার্কি নাকি? দাদা বউদি কাল রাঁচি থেকে বাজার করে আনলেন, সারা দিন ধরে রান্না করলেন বউদি, আর তোমরা খাবে না মানে? এ কেমন কথা?

অলকা আমাকে বলল, তা হলে এখানেই যদি পাঠিয়ে দ্যান। আমরা বড়ো টায়ার্ড!

চানু কিছুক্ষণ সুমনের কোলের কাছে ঘেঁষাঘেঁষি করে বুঝল যে, সুমনের ওপর তার যে নিরঙ্কুশ দাবি ছিল তা আর নেই। শাড়ি-পরা একজন নতুন মহিলা এখন তার সুমনকাকুর অনেকখানি নিয়ে নিয়েছে। সুমনকাকু বল খেলল না, তাকে কাঁধে চড়াল না, তাকে তেমন আদরও করল না দেখে, সে তার মায়ের আঁচলের কাছে সরে গেল। শিশুরা আদর যেমন বোঝে, অনাদরও।

স্মিতা সুমনকে বলল, তা হলে তাই-ই হবে। খাবার সব এখানেই পাঠিয়ে দেব। ক'টায় পাঠাব? ন'টা নাগাদ?

সুমন এই প্রথমবার চোখ তুলে তাকাল। স্মিতাকে দেখল। ওর ভালোবাসায় মোড়া শাড়িতে, ওর আদরে দেওয়া রুবির দুল-পরা স্মিতা। কিন্তু স্মিতা যে খুব রোগা হয়ে গেছে তাও নিশ্চয়ই ওর চোখে পড়ল। সুমনের চোখ দুটি এত আনন্দের মাঝেও হঠাৎ ব্যথায় যেন নিষ্প্রভ হয়ে উঠল। এক মুহূর্ত স্মিতার মুখে তাকিয়ে থেকেই চোখ নামিয়ে বলল, আচ্ছা বউদি! ন'টার সময়ই পাঠিয়ো।

সঙ্গে সঙ্গে সুমনের স্ত্রী সুমনের দিকে তাকাল।

স্মিতা চানুকে নিয়ে, পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরে গেল। আমি রয়ে গেলাম, তক্ষুনি চলে গেলে খারাপ দেখাত। চেনা-জানা এত লোক চারপাশে।

কত লোক কত কথা বলছিল, রসিকতা, হাসিঠাট্টা। ওদের শোবার ঘর ভারী সুন্দর করে সাজানো হয়েছে একথা সকলেই বলল।

অলকা কোনো মহিলাকে জিজ্ঞেস করল, কে সাজালেন শোওয়ার ঘর?

তিনি বললেন, রবিদাদার স্ত্রী, স্মিতা বউদি।

অলকা বলল, তাই-ই বুঝি?

অতিথিরা একে একে প্রায় সকলেই চলে গেলেন। বুধাই-এর মা আর ছোটুয়া যতক্ষণ না ওদের খাবার নিয়ে এল ততক্ষণ আমাকে থাকতেই হল। বুধাই-এর মা এসে বলল

বউদির শরীর খারাপ। সারাদিন রান্নাঘরে ধকল গেছে। বাড়ি গিয়েই শুয়ে পড়েছিল। এই খাবারদাবার কোনোরকমে বেড়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়েছে।

তারপর বুধাই-এর মা সুমনের দিকে তাকিয়ে বললে, বউদি আসতে পারল না।

সুমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল কথাটা শুনে।

অলকা আমাকে বলল, আপনি তা হলে যান ওঁর কাছে। শরীর খারাপ যখন।

আমি বললাম, আপনারা একা একা খাবেন?

চৌধুরি বলল, আরে দাদা ওরা তো এখন একাই থাকতে চাইছে। দেখছেন না, আমাদের সকলকে কীভাবে তাড়িয়ে দিচ্ছে!

আমি হাসলাম। হাসতে হয় বলে। তারপর বললাম, আচ্ছা! তোমরা ভালো করে খেয়ো।

দু-একজন কৌতূহলী, অত্যুৎসাহী মহিলা বাসরে বর-বউকে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য রয়ে গেলেন।

সুমন দরজা অবধি এল একা একা। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমাকে কী যেন বলবে বলবে করল, তারপর বলল না। শুধু বলল, আচ্ছা রবিদা।

আমি যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন রাত দশটা বাজে। চানু ঘুমিয়ে পড়েছে। বুধাই-এর মা একা বসে আছে খাওয়ার ঘরে, মোড়া পেতে, দেওয়ালে মাথা দিয়ে।

বুধাই-এর মা বলল, দাদাবাবু আপনি খাবেন না?

বউদি খেয়েছেন?

বউদির শরীর ভালো না। শুয়ে রয়েছেন।

আমি বললাম, আমাকে এক গ্লাস জল দাও বুধাই-এর মা। আমিও খাব না। শরীর ভালো নেই।

বুধাই-এর মা জল এনে দিয়ে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা।

আমি চমকে উঠে তাকালাম তার দিকে। তার চোখেও দেখলাম বড়ো ব্যথা।

বললাম, তুমি খেয়ে, শুয়ে পড়ো বুধাই-এর মা।

বুধাই-এর মা বলল, আমারও খিদে নেই একদম।

শোওয়ার ঘরে গিয়ে দেখি স্মিতা সেখানে নেই। পাশের ঘরে ঢুকলাম। দেখি চানুর পাশে স্মিতা উপুড় হয়ে সন্ধেবেলার সেই লাল-কালো সিল্কের শাড়িটা পরেই শুয়ে আছে। ওর হালকা ছিপছিপে সুন্দর গড়নে চানুর পাশে অল্পবয়সি ওকে, চানুর মা বলে মনেই হচ্ছিল না।

আমি কাঠখোট্টা লোক। বুঝি কম। ভাবি কম। কিন্তু কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে-পড়া আমার চেয়ে দশ বছরের ছোটো আমার ছেলেমানুষ স্ত্রীর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম দরজায় দাঁড়িয়ে।

তারপর ঘরে ফিরে গিয়ে জামাকাপড় পায়জামা-গেঞ্জি পরে আমি ইজিচেয়ারে শুলাম।

অন্ধকার রাতে তারারা সমুজ্জ্বল। জঙ্গলের দিক থেকে মিশ্র গন্ধ আসছে হাওয়ায় ভেসে। শিয়াল ডাকছে লাতেহারের দিকের রাস্তা থেকে। গোঁ গোঁ করে মাঝে-মধ্যে দুটি একটি মার্সিডিজ ডিজেল ট্রাক যাচ্ছে দূরের পথে বেয়ে। আজ বাইরেও রাত বড়ো বিধুর। রাতের পাখিরা একে অন্যের সঙ্গে কথা বলছে। ঝিঁঝির একটানা ঝিনঝিনি রবের ঘুমপাড়ানি সুর ভেসে আসছে জঙ্গলের দিক থেকে।

ইজিচেয়ারে শুয়ে আমি কত কী ভাবছিলাম। এমন সময় ঘরে একটা মৃদু খসখস শব্দ হল। পারফ্যুমের গন্ধে ঘরটা ভরে গেল। স্মিতা কথা না-বলে সোজা এসে আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আমার মধ্যে যে খারাপ মানুষটা বাস করে সে বলল, আঘাত দাও ওকে। এমন শিক্ষা দাও যে, জীবনে যেন এমন আর না করে। ওর প্রতি এক তীব্র ঘৃণা ও অনীহাতে আমার মন ভরে উঠল। ভীষণ নিষ্ঠুর হয়ে উঠল আমার মধ্যের সেই আমিত্বময় সাধারণ স্বামী।

কান্নার বেগ কমলে, আমি বললাম, কী হল।

ও বলল, আমার জন্যে আজ তোমার এত লোকের সামনে...; আমার জন্যেই। আমি জানি।

আমি চুপ করে রইলাম।

আমাকে তুমি শাস্তি দাও।

কীসের শাস্তি?

ভুলের শাস্তি।

আমি বললাম, ব্যঙ্গাত্মক স্বরে, ভালোবেসেছিলে বলে অনুতাপ হচ্ছে?

স্মিতা এবার মুখ তুলল। আমার পায়ের কাছে হাঁটু-গেড়ে বসে বলল, আমার যে বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসা...

আমি বললাম, আমিই কি বললাম? বললাম, আমার কী এমন রূপ-গুণ আছে যাতে তোমার শরীর ও মনে চিরদিন একা আমি সর্বেসর্বা হয়ে থাকতে পারি? বিশ্বসংসারে একজন স্বামীরও কী আছে?

তারপর একটু চুপ করে থেকে ওর মাথায় হাত রেখে বললাম, আমার ভাগে যা পড়েছিল তাই-ই তো যথেষ্ট ছিল। সেই ভাগের ঘরে কোনো শূন্যতা তো কখনও অনুভব করিনি স্মিতা! সত্যিই করিনি।

স্মিতা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তার বোকা, অগোছালো ভুলোমনের স্বামীর দিকে।

দূরের ঝাঁটি জঙ্গল ভরা মহুয়াটাঁড় চমকে চমকে রাতচরা টি-টি পাখিরা ডেকে ফিরছিল। হাওয়া দিয়েছিল বনে বনে। কারা যেন ফিশফিশ করছিল বাইরে! ভাবছিলাম, এই মুহূর্তে আর একজন মানুষ সুমন, তার নব-পরিণীতা স্ত্রীকে বুকে নিয়ে শুয়ে আছে। স্মিতারই ভালোবাসার হাতে-পাতা বিছানাতে।

সুমন এখন কী ভাবছে কে জানে? কিন্তু যদি স্মিতার কথা সুমন একবারও ভাবে তা হলে আমার মতো সুখী এ মুহূর্তে আর কেউই হবে না।

অনেক বছর আগে, বিয়ের রাতে যজ্ঞের ধোঁয়ার মধ্যে বসে যেসব সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলাম তার বেশিরই মানে বুঝিনি। সেদিন, আমি আমার নিজস্ব কোনো যোগ্যতা ব্যতিরেকেই স্বামী হয়েছিলাম স্মিতার, শুধুমাত্র বিয়ে করেই।

স্মিতা কাঁদছিল নিঃশব্দে। আমার বুক ভিজে যাচ্ছিল ওর চোখের জলে। কিন্তু ভীষণ ভালোও লাগছিল।

স্মৃতিতে হঠাৎই বউভাতের রাতটা ফিরে এল। তখন মা বেঁচে ছিলেন। জ্যাঠামণি, রতনমামা। স্মিতার বাবাও। আরও কেউ কেউ। আজ যাঁরা নেই।

আমার পুরোনো বন্ধুরা, কত আনন্দ, কল্পনা সে-রাতে; সুগন্ধ, সানাই...।

স্মিতার মাথায় হাত রেখে বসে থাকতে থাকতে আমার হঠাৎ মনে হল যে, যে-আমি টোপর মাথায় দিয়ে সমারোহে গিয়ে স্মিতাকে একদিন তার পরিবারের শিকড়সুদ্ধু উপড়ে এনেছিলম, তার সঙ্গে যে-মানুষটা তার স্ত্রীর সুখে-দুঃখে জড়াজড়ি করে অনেক অবিশ্বাস ও সন্দেহ পায়ে মাড়িয়ে বিবাহিত জীবনের কোনো বিলম্বিত মুহূর্তে সত্যিই স্বামী হয়ে উঠলাম, তাদের দুজনের মধ্যে বিস্তরই ব্যবধান।

"বর হওয়া" আর "স্বামী হওয়া" বোধহয় এক নয়।

ছানি

আজ মহাষ্টমী। এবারে রবিবার পড়ে গিয়ে সপ্তমীর ছুটিটাই মারা গেল।

কাল রাতে মা বললেন, বড়ো মাসিমা মেসোমশায়রা দিল্লি থেকে এসেছেন।

আমার মাসতুতো ভাই স্টেট ব্যাংকের বড়ো অফিসার। মাসিমার একই ছেলে। ওঁর কাছেই উঠেছেন ওঁরা। ওঁদের ফোন থাকলেও আমাদের নেই বলে যোগাযোগ করা হয়ে ওঠেনি। একবার যেন যাই, খোঁজ নিয়ে আসি।

বাড়ি থেকে যখন বেরুচ্ছি ঠিক তখনই, আমার ছ'বছরের মেয়ে শ্রী বলল, বাবা! আমিও যাব।

বললাম, পুজোর দিন বাসে-ট্রামে ওঠা যাবে না, ভিড় ভীষণ। তুমি কি অতদূরে হেঁটে যেতে পারবে?

মেয়ে বলল, বাঃ রে! সেই তোমার সঙ্গে সেবারে তারা দেখতে গেছিলাম না, সেখান থেকে ট্রাম-বাস কিছুই না পেয়ে সেদিন হেঁটে আসিনি বুঝি?

আমার মনে পড়ল, সত্যিই তো! প্ল্যানেটোরিয়াম থেকে একবার হাঁটতে-হাঁটতে ল্যান্সডাউন রোড অবধি এসেছিলই তো শ্রী।

বললাম, বেশ, চলো তা হলে।

রুণা বলল, রোদ উঠেছে কড়া, পুজোর দিন রোদে হেঁটে অসুখে-বিসুখে পড়বে। না, তুমি যাবে না শ্রী।

মেয়ের মুখ করুণ হয়ে এল।

তবু বললাম, চলুকই না। পথে অনেক ঠাকুরও দেখা হবে! আর তেমন মনে করলে, রিকশা করে চলে আসবে।

রুণা বিরক্ত গলায় বলল, বিকেলে আমি বাপের বাড়ি যাব। দাদারা গাড়ি পাঠাবে। তখন যদি পড়ে পড়ে ঘুমোও তা হলে পিটুনি খাবে আমার কাছে।

নিস্পৃহ গলায় বললাম, ঘুমোলে ঘুমোবে। আমি তো যাব না। না-হয়, আমার সঙ্গেই অন্য কোথাও যাবে ও। হেঁটে হেঁটে, কাছাকাছিই যাব।

রুণা বলল, যা ভালো মনে কর, করো।

আর দেরি না করাই ভালো মনে করে মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে পড়লাম।

এদিকে মেয়ে হাঁটতেই পারছে না। কী একটা জগঝম্প পরেছে। দু-হাতে দুদিক উঁচু করে ধরে নতুন জুতো পায়ে আমার পাশে পাশে হাঁটছিল শ্রী।

বললাম, এটা কী পরেছ তুমি?

শ্রী তার বোকা বাবার চোখে তাকিয়ে বলল, তুমি তাও জান না? এটাকে ম্যাক্সি বলে।

বললাম, যে-জামা পরে হাঁটা যায় না সেটা পরার দরকার কী?

দ্যাখো না। শ্রী অনুযোগের সুরে বলল, মা এমন বড়ো করে বানাল, যাতে সারা শীতে পরতে পারি, ছোটো না হয়ে যায়।

বললাম, ক-টা জামা হল এবারে পুজোয়?

শ্রী চোখ নাচিয়ে বলল, তা, অনেক। তারপর বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও, গুনে বলি। মা বানিয়েছে একটা! চার মামা চারটে। দুটো মাসি দুটো। মামা-দাদুও একটা দিয়েছে।

ক'টা হল সবসুদ্ধু?

ছ'টা। গুনেটুনে শ্রী বলল।

আমি বললাম, ভুল হল। আটটা।

শ্রী যোগের ভুলের পাপ স্খলন করে বলল, কী মজা। না?

আমি ভাবছিলাম, এতগুলো জামার কি দরকার ছিল কোনো? একজন শিশুর, পুজোর আনন্দের পরিপ্রেক্ষিতেও? এতগুলো জামা কি বাড়াবাড়ি নয়? বিশেষ করে এ-বছরের প্রলয়কারী বন্যা,ও বৃষ্টির পর? বড়োলোক মামাবাড়ির ব্যাপার! গরিব জামাই-এর চুপ করে থাকাই শোভন! মেয়ের ভালোমন্দ ঠিক করার আমি কে?

শ্রী হঠাৎ আমার হাত ধরে টানল।

ওর দিকে চাইতেই স্টেশনারি দোকানের দিকে চোখ দিয়ে ইশারা করল।

শুধোলাম, কী?

আহা! তুমি যেন জান না।

শ্রী পাকামি করে বলল।

যা শোনে, তাই শেখে ও। বলল, বড়োমামা সবসময় কিনে দেয়!

আমি একটা বড়ো চকোলেটের বার কিনে দিলাম। বাবা হিসেবে কোনো কর্তব্যই প্রায় করি না মেয়ের প্রতি। সামর্থ্যের অভাবও যে নেই এমনও নয়। আমার মাধ্যমে

আনন্দ, ভালো লাগা, কিছুরই স্বাদ পায় না মেয়েটা। পুজোর দিনে ওকে নিজে হাতে ওর অনুরোধে একটা চকোলেট কিনে দিয়ে ভারী খুশি হলাম। বাবা হওয়ার যেমন ঝক্কি অনেক, তেমন আনন্দও অনেক। যে বাবা না হয়েছে, সে বুঝবে না এর দুঃখ। এবং আনন্দও। আমার সঙ্গে একা থাকলে মেয়েও বেশ স্বাধীনতার স্বাদ পায়। মায়ের কড়া শাসনের হাত থেকে-তখন ওর ছুটি।

বড়ো প্যান্ডেলে পুজো হচ্ছে সামনে। দামড়া দামড়া বয়স্ক ছেলেগুলো হিন্দি ছবির নায়কদের মতো দামি ও অন্য গ্রহের পোশাক পরে প্যান্ডেলের সামনে দাঁড়িয়ে মেয়ে দেখছে। পুজোর আসল মজাই তো ওটাই। এ বছরও এদের সাজসজ্জা আমাকে আশ্চর্য করছে। এদের দেখে কে বলবে যে, কলকাতায় ও বাংলায় অল্প ক'দিন আগেও এত বড়ো বিপর্যয় ঘটে গেছে। পুরুষরাও কি এমন মেয়েদের মতো পোশাক সচেতন হতে পারে? অন্তঃসারশূন্য শরীর ও ষাঁড়ের গোবরময় মস্তিষ্কের জন্যে পুরুষদেরও বাহারি জামাকাপড় এবং হাই-হিল জুতোর দরকার হয় এ ভিখিরিদের শহরে, তা ভাবলেও অবাক লাগে। এই হচ্ছে কলকাতার প্রাণকেন্দ্র। এর নাম সাউথ ক্যালকাটা। তার মধ্যে এ পাড়া হচ্ছে জাত পাড়া। এইসব পাড়ার পুজো দেখতে দূর দূর জায়গা থেকে মানুষ আসে। রাত জেগে পায়ে হেঁটে পুজো দেখে। "হাঁ" করে বড়োলোকি দেখে। বড়োলোকের সুন্দরী মেয়েদের কৃত্রিম মুখ দেখে। ছেলেদের চুল আর পোশাক দেখার পর গ্রাম গঞ্জে গিয়ে সেখানের নির্মল ও সুস্থ পরিবেশকে বিকৃত ও দূষিত করে তোলে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে পটল দৌড়ে এল। এসেই আমাকে বলল, তোমার ভাই ডুবিয়ে দিলে এক্কেবারে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কী?

আমাদের পুজো কমিটির চাঁদা থেকে পাঁচশো সাঁইত্রিশ টাকা যে বন্যাত্রাণে দিলাম হাবুদা সে খবরটা একটু কাগজে ছাপিয়েও দিতে পারলে না। নিউজ আইটেম হিসেবে! এত বড়ো একটা দান!

পটলের বাবা, অর্থাৎ আমার প্রতিবেশীর সরষের তেলের কল আছে। কীসের সঙ্গে কী মিশিয়ে তাঁর কলের ঘানি চলে তা ভগবানই জানেন। কিন্তু অর্থের অভাব নেই কোনো। এও আমার জানা যে, কোনো অপ্রাকৃত কৌশলে এ পর্যন্ত জীবনে তিনি ঠেকাননি সরকারকে একটি পয়সাও। পটলের নিজের সিগারেটের খরচই মাসে চারশো। পুজো কমিটির পাঁচশো সাঁইত্রিশ টাকা! পটল এবং পটলের সমগোত্রীয়রা কলকাতার এই বড়োলোকতম পাড়ার পুজো কমিটির মোট তহবিল থেকে ওই টাকা দিয়েছে এবং সে জন্যেই কাগজে সেটা ফলাও করে প্রচার করতে হবে এই দাবিতে আমার রক্ত চড়ে গেল। সীমাহীন লজ্জাহীনতা।

হাবু আমার ভাই। একটা খবরের কাগজের একজন সামান্য কর্মচারী সে। কাগজটা তার বাবার নয় যে, পটলের মতো দাতাকর্ণদের অকিঞ্চিৎকর দানের খবর নিউজ আইটেম হিসেবে ছাপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা হাবু রাখে।

যাই হোক, পটল বড়োলোকের ছেলে। বড়ো বড়ো ব্যাপার। বড়ো বড়ো বন্ধুবান্ধব। ওকে চটিয়ে আমার মতো চুনোপুঁটির ক্ষতি ছাড়া ভালো হবার নয়।

তাই, কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম, হাবু চেষ্টা করছিল, পারেনি।

পটল বলল, বুলশিট।

এমন সময় রমেন, আমাদের পাড়ার সবচেয়ে অবস্থাপন্ন মানুষ হরেন ঘোষের ছেলের সঙ্গে দেখা। শুধোলাম, মা-বাবা কি এখানে?

রমেন পকেট থেকে ইন্ডিয়া কিংসের প্যাকেট বের করে ধরিয়ে, কায়দা করে বলল, দূর! মা-বাবা কখনও এখানে থাকে না পুজোয়। গতবার ফরেন টুরে গেছিল, এবার কাশ্মীরে।

আমি মুখ ফসকে বলে ফেললাম, এ বছরেও?

তারপর বললাম, কাশ্মীরে আগে একবার গেছিলেন না?

রমেন বলল, আগে চারবার গেছে। এই নিয়ে, ফিফ্‌তবার।

বললাম, বাঃ!

রমেন বলল, তুমি গেছ নাকি কালুদা, কাশ্মীরে?

আমি বললাম, নাঃ, আমি কোথায়ই বা গেছি? মধুপুর গেছিলাম একবার অনেকদিন আগে।

রমেন সিগারেটটা বিলিতি লাইটারের উপর ঠুকে বলল, যাও ঘুরে এসো। লাইফটা এনজয় করো। তুমি কেমন ম্যাদামারা হয়ে যাচ্ছ।

আমি পা বাড়ালাম। ভাবলাম, বলি, এনজয়মেন্টের সংজ্ঞা সকলের কাছে সমান নয়। আর্থিক সামর্থ্য আমার নেই বলেই শুধু নয়, ছুটিতে বাড়ি বসে বই পড়েই আমি সবেচেয়ে বেশি এনজয় করি। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতদের "এনজয়মেন্টের" মধ্যে তফাত আছে। রমেনের নিজের বা তার মা-বাবার বিবেক-রুচি আমার ওপর জোর করে রমেন চাপাতে চাইছে কেন, জানি না। আমি এগোলাম।

পটল পেছন থেকে বলল, হাবুদাকে বোলো যে, হাবুদা নিজেকে যত ইমপর্টান্ট মনে করে ততটা সে নয়। আমরা অন্য লোক ধরে অন্য কাগজে খবরটা ছেপেছি। আমাদের নিজেদেরও সোর্স কিছু আছে।

আমি হাবুর জন্যে দুঃখিত হলাম। খবরের কাগজে কাজ করা বা তার সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত থাকা যে কত বড়ো বিড়ম্বনার ব্যাপার তা হাবুর দাদা হয়েই আমি হাড়ে হাড়ে বুঝি। বেচারা হাবু!

গড়িয়াহাটের মোড়ে পৌঁছে, এক খিলি জরদা পন খেলাম।

শ্রীকে বললাম, তুমি চকোলেটটা খেলে না শ্রী?

ও বলল, দু-হাতে ম্যাঙ্গি ধরে আছি দেখছ না? পরে খাব!

গড়িয়াহাটার মোড় ছাড়িয়ে বালিগঞ্জ নিউ মার্কেট পেরিয়ে বাঁদিকের ফুটপাথ ধরে ফাঁড়ির দিকে হাঁটছি। একটা মাল্টিস্টোরিড বাড়ি। তারপরেই রাস্তা এবং তারপরই একটা তেকোনা পার্ক। পার্কটার সামনের স্টপেজে একটা সিমেন্টের শেড। দেখা যচ্ছে দূর থেকে।

কত গাড়ি, কত শাড়ি, কত আনন্দ, কত অপচয় চারিদিকে। এমনকি আমার মতো সাধারণ অবস্থার মানুষের মেয়েও সব মিলিয়ে আটটা জামা পায় এবং পরেও পুজোতে। ভাবতে ভাবতেই চোখ পড়ল সেই শেডের নীচে। তখন পৌঁছেই গেছি সেখানে।

একটি লোক, পরনে শতচ্ছিন্ন খাটো ধুতি। মালকোঁচা মারা। শুয়ে, অঘোরে ঘুমোচ্ছে সকাল এগারোটায়, মহাষ্টমীর দিনে। গড়িয়াহাট মোড়ের দুশো গজের মধ্যে। তার পাশে তার স্ত্রী। ভীষণ নোংরা ও ছেঁড়া একটা শায়াবিহীন লালপেড়ে মোটা শাড়ি তার পরনে। হাঁটু অবধি ওঠা। গায়ে একটা জামা আছে বটে কিন্তু বুকের বোতাম নেই। মেয়েটির একটি স্তন আঢাকা। স্তনের বৃন্তটি ফুটপাথের ধুলোয় মাখা। আর সেই বৃন্ত থেকে এক চুল দূরে একটি ক্ষুধার্ত, বড়ো ক্লান্ত; ঘুমন্ত শিশুর হাঁ-করা মুখ।

কেন জানি না, আমার পা আটকে গেল সেখানে। মেয়েটির উন্মুক্ত বুকের জন্যে নয়। আমি একজন সাধারণ মানুষ বলে। মানুষকে মানুষ হিসেবে সম্মান করি বলে। পুজোর সব আনন্দ, এই সুন্দর শরৎ সকালে হঠাৎই লোডশেডিং-এর মতো নিভে গেল।

শ্রী হাত ধরে ঝাঁকি দিল। বলল, বাবা, ঠাকুর দেখাবে বললে, কী হল? মোটে তো চারটে দেখলাম।

আমার সম্বিৎ ফিরে এল। ম্যাক্সি-পরা চকচকে-চামড়ার নতুন জুতো পরা আমার ছোট্ট অবোধ মেয়েকে বললাম, ঠাকুর দেখাব মা। তোমায় ঠাকুর দেখাব।

ভাবছিলাম, এই পরিবারটি কি বন্যাপীড়িত? এরা কোত্থেকে এসেছে? গোসাবা, মেদিনীপুর? না ডুয়ার্স? এরা কি অনেকই দূর থেকে হেঁটে এসেছে? কতখানি ক্লান্ত ও কতখানি ক্ষুধার্ত এরা যে, মহাষ্টমীর দিনের রবরবাময় গড়িয়াহাট মোড়ের দুশো গজের মধে থেকেও এরা সমস্ত পরিবার এমন মরণ ঘুম ঘুমোচ্ছে? এমন সকালে!

শ্রী বলল, কী দেখছ বাবা?

আমি বললাম, দেখেছ?

কী? শ্রী বলল, অবাক হয়ে।

শ্রী দেখার মতো কিছুই দেখেনি। ওর দেখার কথাও নয়।

যে লক্ষ-লক্ষ লোক গাড়ি চড়ে, বাসে-ট্রামে-মিনিবাসে, পায়ে হেঁটে ওদের পাশ দিয়ে আজ ভোর থেকে হেঁটে গেছে, তারা কেউই ওদের দেখেনি। শ্রীর দোষ কী? ও তো একটা ছোটো মেয়ে।

হঠাৎ একটা কালো অ্যাম্বাসডার এসে দাঁড়াল শেডটার সামনে। কে যেন বলল, কী রে কালু? কোথায় যাবি? চল নামিয়ে দিচ্ছি।

তাকিয়ে দেখলাম, আমার কলেজের বন্ধু রাজীব। অ্যালয় স্টিলের কারবার করে খুব বড়োলোক হয়েছে। নিউ আলিপুরে বিরাট বাড়ি করেছে। ফার্স্ট ইয়ারেই বোকামি করে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিল। এই দেশে পড়াশুনা করে এই রাজীবদেরই চাকর হতে হয়।

আমি বললাম, থ্যাংক উ্য। দরকার নেই। কাছেই যাব।

রাজীব বলল, চল না আমার সঙ্গে। মহাষ্টমীর ভোগ খাবি আমাদের পাড়ায়। বিয়ার সেশান চলেছে সকাল থেকে। জমবে ভালো। চল।

ওকে বললাম, না রে। তুই যা। আমি তো কাছেই যাব এক আত্মীয়ের বাড়ি।

হঠাৎ রাজীবের চোখ গেল ওই পরিবারটির দিকে।

চোখ বড়ো বড়ো করে আমাকে বলল, তুই কি দেশের কাজ করছিস না কি? আরে! ক'টা লোককে দেখবি তুই এ পোড়াদেশে? এসব সরকারের ডিউটি। আমি নিজে যা ট্যাক্স দিই, তাতে বন্যাত্রাণে নিজেই একটা লঙ্গরখানা খুলতে পারতাম। কিন্তু করব কেন বল? সরকার কী দেয় বদলে? হার্ড-আর্নড মানির ট্যাক্সের বদলে?

তারপর ভালোবেসে বলল, পুজোর দিনে, একটু আনন্দ কর। এই তো তিনটি দিন বছরে। নিজেকে রাস্তার লোকের সঙ্গে ইনভলভ করিস না। কতজনের দুঃখ নিজের করবি? এর শেষ নেই। বোকার মতো বিহেভ করিস না। ফালতু!

এত কথা জোরে জোরে বলে রাজীব চলে গেল।

আশ্চর্য! পরিবারটি তবুও অসাড়ে ঘমোচ্ছিল। কী মরণ ঘুমই না ঘুমোচ্ছে!

রাজীব না হয় অনেক ট্যাক্স দেয় কিন্তু পটলের বাবা? আমার মামা শ্বশুর? তিনি তো এক পয়সাও দেন না। তাঁরও কি কোনো কর্তব্য নেই? ছিল না? আজ অথবা গতকাল? অথবা থাকবে না আগামী কালও। দেশের প্রতি, এদের প্রতি?

এতক্ষণে শ্রী কথা বলল।

বলল, বাবা, বাচ্চাটার খুব খিদে পেয়েছে, না? আমি আমার চকোলেটটা একে দিয়ে দিই?

আম শ্রীর মুখের দিকে তাকালাম। আমার বুকের মধ্যেটা যেন কীরকম করে উঠল। বললাম, তুমি খাবে না?

শ্রী বলল, আমি তো খাই; প্রায়ই খাই; কত্ত খাই। ও যে কিছুই খেতে পায় না।

বললাম, দাও।

কী নোংরা জায়গাটা, কী নোংরা ওদের কাপড়চোপড়, শরীর। রুশা থাকলে মুখে আঁচল দিত, শ্রীকে কিছুতেই কাছে যেতে দিত না। কিন্তু শ্রী যখন এগিয়ে গিয়ে বাচ্চাটাকে হাত দিয়ে ওঠাল তখন আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বাচ্চাটা চোখ খুলেই অবাক হল। শ্রী চকোলেটটা ওর হাতে দিল। বাচ্চাটা জীবনে ক্যাডবারি দেখেনি। ও ওটা নিয়ে কী করতে হয় বুঝতে পারল না। ভাবল, খেলনা বুঝি।

আমি ডাকলাম মানুষটাকে, এই যে শুনছ! শুনছ গো।

আমার ডাকেও উঠল না মানুষটা। বাচ্চাটা তার মায়ের বুকে আঁচড়াতে মেয়েটি চোখ খুলল। চোখ খুলে আমাকে দেখেও বুক ঢাকার চেষ্টা করল না। আমার মনে হল, ওদের খিদেরই মতো লজ্জাও অপেক্ষা করে করে মরে গেছে বহুদিন আগে। এসব লজ্জাটজ্জার বাবুয়ানি ওদের জন্যে নয়।

মেয়েটি কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল আমার আর শ্রীর দিকে। তারপর কনুই দিয়ে ঠেলা মারল প্রায় মৃত মানুষটাকে।

মানুষটা উঠে বসল। মুখে একটা আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল।

বলল, বাবু কিছু বলছেন?

তারপরই বলল, আমরা একটু পরই এখান থেকে সরে যাব, আপনাদের দাঁড়াতে অসুবিধা হবে না। দোষ করেছি বাবু?

মনে মনে বললাম, দোষ তো করেইছ। অনেক দোষ। অনেকরকম দোষ।

মুখে বললাম, বন্যায় কি সবই ভেসে গেছে তোমাদের?

লোকটা অবাক চোখে চেয়ে বলল, বন্যা?

মেয়েটি বলল, না তো!

শুধোলাম তোমার বাড়ি কোথায়?

লোকটা বলল, নক্‌কিকান্তপুর।

অবাক হলাম। লক্ষ্মীকান্তপুর? সে তো কাছেই। সেখানে আবার বন্যা কীসের?

লোকটা আরও ঘাবড়ে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বলল, আমি তো বন্যার কথা বলিনি বাবু।

আমি আবার শুধোলাম, তুমি কলকাতায় কতদিন?

তা বছরখানেক।

বছরখানেক? কী করো তুমি?

কাগজ কুড়োই।

কোথায় থাকো?

এখানেই, রাতে বৃষ্টি বাদলের জন্যে এখানে শুই। দিনে কাগজ কুড়োই।

খাও দাও কোথায়?

মানুষটা বলল, ওই পার্কের মধ্যেই সন্ধের পর মাটির হাঁড়িতে কিছু ফুটিয়ে নিয়ে খাই।

এক বেলাই খাও?

এক বেলা জুটলেই কত।

মাসিমা মেসোমশায়ের জন্যে একটু মিষ্টি কিনে নিয়ে যাব বলে দশটা টাকা বেশি এনেছিলাম। ওদের দিয়ে বললাম, তোমরা আজ ভালো করে খাও। আজ পুজোর দিন।

আমার অবস্থানুযায়ী এই বড়োলোকি বেমানান হল, বুঝলাম। কিন্তু না ভেবেই, টাকাটা দিয়ে দিলাম।

মেয়েটাও উঠে বসল। এমনকি বাচ্চাটাও। ওরা তিনজনে এমন করে আমার ও শ্রীর মুখের দিকে চেয়ে রইল যে, কী বলব। লজ্জায়, দুঃখে হতাশায় আমার মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করল।

শ্রী উত্তেজিত গলায় বলল, তোমরা আমার বাবাকে কী দেখছ? অমন করে?

মানুষটা আমাকে বলল, তোমার মুখটা দেকতিচি বাবু। আজ পুজোর দিনে ভগমানের দর্শন পেনু। মুখটা চিনে রাকতিচি। যদি পারি তো কোনোদিন এই ঋণ শুধব। ঠাকুর তোমার মঙ্গল...।

লজ্জায় দাঁড়ালাম না।

কী বলব, ভেবে না পেয়ে বললাম, চলি।

শ্রী বলল, আমার দেখাদেখি চলি।

মানুষটার কথা শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এ তবে বন্যার্ত নয়? বন্যার্তরা আসেনি এখনও কেউ? পৌঁছোতে পারেনি? এ যে কলকাতারই বাসিন্দা। এরই এই দশা। এ তো মাত্র একজন। কত আছে এ রকম! ফুটপাথের মানুষ এ। এইই এর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। বড়োলোক কলকাতার গর্ব গড়িয়াহাটের মোড়ের দুশো গজের মধ্যে এমন করেই ওরা বেঁচে থাকে। ভিক্ষা চায় না, দয়া চায় না কারও। পটল, পটলের বাবা অথবা রাজীবদের, এমনকী আমার মতো নগণ্য জনেরও করুণা চায় না। ওরা শুধু বেঁচে থাকতে চায়, পরিশ্রমের বিনিময়ে।

চলতে চলতে ভাবছিলাম, এই দারুণ শহরে আটাত্তরের বন্যাপীড়িত, ঘরবাড়ি ভেসে যাওয়া আপনজন হারানো মানুষগুলো এসে পড়লে তাদের অবস্থাটা কী হবে?

বড়ো মাসিমা আমাকে আর শ্রীকে দেখে খুব খুশি হলেন। দিল্লি থেকে অনেকদিন পর এবারে এসেছেন আমার মাসতুতো দাদার ওখানে।

বড়ো মেসোমশাই বললেন, ও কে রে কালু?

রানির মেয়ে?

আমি বললাম, না। ও আমার মেয়ে!

ওঃ। তোর মেয়ে? কী যেন নাম? শ্রী না?

তারপর বললেন, চোখে কিছু দেখি না আজকাল। ক্যাটারাক্ট ফর্ম করছে।

বড়োমাসিমা বললেন, এ পাড়াতে খুব জাঁকজমকের পুজো। সুন্দর ঠাকুর। দেখে যা।

নাঃ থাক। পথেই দেখলাম ঠাকুর।

মাসিমা মিষ্টি খাওয়ালেন জোর করে। বললেন, তোর মাকে বলিস, নবমীর দিন সারাদিন তোদের ওখানে গিয়ে থাকব।

খুব ভালো হবে। মা সবসময়ই আপনাদের কথা বলছেন।

মাসিমা বললেন, অনুকে বলিস যে, বড়ো বড়ো কই আনাতে। তেলকই খাব।

বললাম, আচ্ছা।

ভাবলাম, বড়ো কই কতদিন আমরা নিজেরাই চোখে দেখিনি। তবে মায়ের আনন্দের জন্যে যে করে হোক মাসিমা মেসোমশায়ের জন্যে অন্তত জোগাড় করতে হবেই।

একটু পর উঠলাম শ্রীকে নিয়ে। বেলা বাড়ছে। রোদ কড়া হচ্ছে ক্রমশ।

পথে নেমেই শ্রী বলল, ক্যাটারাক্ট মানে কী বাবা?

ছানি।

ছানি কী বাবা?

বললাম, চোখের উপরে সরের মতো পর্দা পড়ে যায়, চোখে আর দেখা যায় না।

শ্রী বলল, কই? মেসো-দাদুর চোখ তো ঠিকই আছে দেখলাম।

আমি একটু চুপ করে রইলাম।

তারপর বললাম, বাইরে থেকে দেখে তাই-ই মনে হয়।

কম্পাস

কুকু-র সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল সেদিন আমার সাহিত্যিক বন্ধুর বাড়িতে। কুকু এসেছিল, পরিচালক এবং প্রয়োজকের সঙ্গে একটি উপন্যাস নিয়ে ছবি করার বিষয়ে আলোচনা করতে।

কুকুকে শেষ দেখেছিলাম আজ থেকে তিরিশ বছর আগে। তখন আমি সবে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে কলেজে ঢুকেছি। আর কুকু তখন বোধহয় সিক্স-সেভেনে পড়ে। খুব ফরসা, একটু মেয়েলি। এবং খুবই সুন্দর দেখতে। অবস্থাপন্ন বাবা-মায়ের চোখের মণি। আদরে, যত্নে, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল; চোখ কাড়া। একমাত্র সন্তান।

কুকুরা পুজোর ছুটিতে এসেছিল উত্তপ্রদেশের বিন্ধ্যাচলের কাছে শিউপুরা নামে একটি ছোট্ট গ্রামে। আমি গেছিলাম আমার বাবা-মা-ভাই-বোনেদের সঙ্গে। সকলে একত্রিত হয়ে মাছিন্দার পথে চড়ুভাতি, গঙ্গার ঘাটে 'ড্যাম-চিপ' নানারকম মাছ কেনা এবং পরিশেষে বিজয়া সম্মিলনীও।

পথের এবং প্রবাসের আলাপ সাধারণত পথে প্রবাসেই হারিয়ে যায়। যাঁরা ব্যস্ত মানুষ, তাঁদের কারও পক্ষেই কলকাতার কর্মব্যস্ততার ঘুর্ণির মধ্যে ফিরে এসে আর সেই অবসরের সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় না।

কুকু-র বাবা-মা কাকা-কাকি আমার মা-বাবাকে বলতেন, কলকাতা ফিরে যেন এই সম্পর্ক বজায় থাকে। বাবা বলতেন, দেখা যাবে। কলকাতায় ফিরেই প্রমাণ হবে হৃদয়ের টান খাঁটি না ঠুনকো।

কুকু-র বাবা ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের ব্যস্ত উকিল। কাকা সলিসিটর। ওঁদের নিবাস ছিল উত্তর কলকাতায়। শ্যামবাজারে।

আশ্চর্য! সেবার ছুটির পর কলকাতায় ফিরে প্রবাসের সম্পর্ক আরও গাঢ় হয়ে

উঠেছিল মুখ্যত কুকুদের পরিবারের আন্তরিকতাতেই। এমন একটি শিক্ষিত, রুচিসম্পন্ন পরিবার আমি খুব কমই দেখেছি। বাড়ির প্রত্যেক মহিলাই সুন্দরী। বিভিন্নরঙা তাঁদের ডুরেশাড়ি পরা তাঁদের সুন্দর চেহারা এখনও আমার চোখে ভাসে। রান্নাবান্না সেলাইফোঁড়াই, গানবাজনা সব কিছুতেই সমান উৎসাহ ছিল দত্ত পরিবারের। সেই পুজোর পরও অনেক বছর কুকুদের ও আমাদের পরিবারের মধ্যে যোগাযোগ আশ্চর্য ভাবে বজায় ছিল।

কুকু বড়ো হবে, এই নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা করতেন তখন থেকেই ওর অভিভাবকেরা। কারও ইচ্ছা ছিল কুকু ডাক্তার হোক। কেউ চাইতেন কুকু বড়ো হয়ে তার বাবার ওকালতির পসারকে আরও বাড়িয়ে তুলুক। মেসোমশাইয়ের চেম্বার খুবই ভালো জায়গায়। অনেক মক্কেল। ওঁদের কারওই সন্দেহ ছিল না যে, পড়াশোনাতে ভালো ছাত্র কুকু তার সুন্দর সপ্রতিভ ব্যবহারে এবং চোখ কাড়া চেহারাতে একদিন তার বাবার চেয়েও বেশি সুনাম করবে হাইকোর্টে। সচ্ছল পরিবারের সাচ্ছল্য আরও বাড়াবে। বনেদি, কোনো পড়তি-অবস্থার পরিবার থেকে কুকুর জন্যে সুন্দরী শান্তস্বভাবা বিনয়ী পাত্রী পছন্দ করে আনবেন তাঁরা, যাতে তাঁদের পারিবারিক সুখ এবং ঐতিহ্য সাচ্ছল্যর হাতে হাত রেখে আরও উজ্জ্বল হয়।

আমার ইচ্ছে ছিল সাহিত্যিক হবার। কিন্তু আমার প্রাকটিক্যাল, কৃতী বাবা বলতেন, বাঙালি সাহিত্যিকেরা না-খেয়েই থাকেন। যাঁরা সাহিত্যর সঙ্গে প্রকাশনের ব্যাবসাতেও জড়িয়েছেন সফলভাবে নিজেদের, সেই মুষ্টিমেয় দু-একজন ছাড়া, সচ্ছলতার মুখ কেউই দেখেননি। বাবার আদেশ ছিল যে, তাঁরই মতো ডাক্তার হতে হবে।

সাহিত্য নিয়ে পড়া পর্যন্ত হল না বলেই আমার যে বাল্যবন্ধু আজ যশস্বী সাহিত্যিক, তাকে মনে মনে খুবই ঈর্ষা করতাম। সেই কারণেই আমার বন্ধুর মধ্যে আমি যা হতে চেয়েছিলাম, সেই না হওয়া সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশকে প্রত্যক্ষ করে প্রতি ছুটির দিনে চেম্বার এবং এমনকি কল-এ যাওয়াও যথাসাধ্য স্থগিত রেখে তার বাড়িতেই সাহিত্য আলোচনা করে কাটাতাম। তার মাধ্যমেই নামি-দামি সব সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপও হত। যাদের সম্বন্ধে অগণিত পাঠকমহলে অতীব কৌতূহল, তাঁদের খুব কাছ থেকে দেখতাম।

বাঙালি মানসিকতায় যাদের 'সফলতম' বলে, আমি এখন সেই শ্রেণির লোক। বাবা ছিলেন এম. বি ডাক্তার। আমি এম. বি. বি. এস করার পর এম. এসও করেছিলাম। সপ্তাহে বারো থেকে কুড়িটি পর্যন্ত অপারেশন করতাম বড়ো বড়ো নার্সিংহোমে। টাকার আভব ছিল না আমার। নিউ আলিপুরে বাড়ি করেছি। শোফার-ড্রিভন গাড়ি আছে। কলকাতার একাধিক নামি ক্লাবের মেম্বার হয়েছি। এক কথায় অন্য মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত যে কোনো বাঙালি যে সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যর স্বপ্ন দেখেন ছোটোবেলা থেকে বাবার বাধ্য ও যোগ্য সন্তান হয়ে সেই সমস্ত প্রাপ্তিই ঘটেছে আমার।

কিন্তু তারই সঙ্গে বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড়ো যে পাস্ট-টাইম, সেই ঈর্ষা ও

পরশ্রীকাতরতার নিত্য শিকার আজ আমি। কোন বাঙালি কত বড়, তা প্রমাণিত হয় তাঁর প্রতি ঈর্ষাকাতর বাঙালিদের সংখ্য কত, তার উপর। এই পরীক্ষাতে আমি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। ছেলে মেয়ে, নিউ আলিপুরের বাড়ি, স্ত্রী, সল্টলেকের শ্বশুরবাড়ি, আমার মধ্যমগ্রারেম ছোট্ট সুন্দর বাগানবাড়ি ও আমার পেশার খ্যাতি নিয়ে আমি একজন আদর্শ বাঙালি। আত্মীয়স্বজনরা বলে থাকেন মানুষের মতন মানুষ হয়েছি আমি। এমন মানুষ নাকি আমাদের তিনকুলে কেউ কখনও হয়নি। আমাকে এক নামে সকলে চেনে। পেটের অপারেশন? ড. মুতসুদ্দির কাছে যাও। ধন্বন্তরি! অপারেশান থিয়েটারে আমি গাউন পরে গ্লাভস হাতে নিলে নতুন অল্পবয়সি নার্সরা রীতিমতো নার্ভাস হয়ে পড়ে। পরম বিস্ময়ে এবং শ্রদ্ধাতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কুকু সম্বন্ধে ওদের অনেক আত্মীয়স্বজনের কাছেই শুনতাম যে, ছেলেটা মানুষ হল না। বয়েই গেল একেবারে। কিছুই হল না। ফিল্ম লাইনে ভিড়ে গেছে। নেশাভাং করে। ড্রাগ খায়। রোজগারপাতি নেই। বিয়ে করল না। করবেই বা কী করে? বউকে খাওয়াবে কী? মা বাবাকেও দেখে না। দেখবে কী করে? মানি শূন্য মানিব্যাগ পকেটে নিয়ে বাবা মায়ের পায়ে হাত বুলোলেই কি ছেলের কর্তব্য করা হয়? টাকাই হচ্ছে সার কথা। কিছুই করল না জীবনে।

এতদিন পরে দেখে, কুকুকে আমি চিনতেই পারিনি। সাহেবের মতো ফরসা রঙে একেবারে কালি ঢেলে দিয়েছে। কুচকুচে কালো হয়ে গেছে ও। কোঁকড়া নরম কালো চুলের জায়গায় মাথা ভর্তি টাক। মুখে একগাল দাড়ি। আধময়লা একটা ট্রাউজার এবং হাওয়াই শার্ট পরনে।

ওই আমাকে বলল, নিশ্চয়ই আমাকে চিনতে পারছ না টুটুদাদা?

অবাক হয়ে বলেছিলাম, না তো!

আমি কুকু।

কুকু!

হ্যাঁ, মনে পড়ে না? শিউপুরার কুকু। বিন্ধ্যাচল, মাছিন্দা?

কুকু! বিস্ময়ে, হতাশায় আমি বলেছিলাম। মাই গুডনেস!

ওদের কাজ শেষ হতে হতে বেলা হল অনেক। ফিল্ম লাইনের লোকেরা বড়ো বেশি কথা বলেন। যে কাজ পাঁচ মিনিটে হয়, সে কাজ ওঁরা তিন ঘণ্টা করতে ভালোবাসেন। এক কাপ চা-খাওয়া শুট করতে যাঁদের দেড়ঘণ্টা লেগে যায় তাঁদের অভ্যেসটাই বোধহয় খারাপ হয়ে যায়।

কুকু বলল, উঠবে নাকি টুটুদাদা? বাড়ি যাবে না?

বাড়িতে না গেলেও হত। কারণ, আমার সম্বন্ধীদের সঙ্গে আমার স্ত্রী ও পুত্র বাগানবাড়িতে গেছে। এ রবিবার সকালে একজন ধনী ব্যাবসাদারের স্ত্রীর অপারেশন ছিল। প্রথমে 'না'করে দিয়েছিলাম। কিন্তু এমন একটা টাকার অঙ্ক বলে বসল যে, লোভ আর

সামলাতে পারলাম না। ভগবানেরও একটা দাম ধার্য করেছে ওরা। টাকা দিয়েও কেনা যায় না এমন মানুষ সংসারে বোধহয় আর বেশি নেই।

ভাবলাম, যে ছোকরার কিছুই হল না জীবনে, তাকে নিয়ে একটু ক্লাবে যাই। ওকে বোঝাই যে, এ ওর পরম দুর্ভাগ্য যে চেখের সামনে ওর চেয়ে সামান্যই কয়েক বছরের বড়ো আমি মানুষটা জলজ্যান্ত থাকা সত্ত্বেও ও সে দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হতে পারল না। নিঃশেষে নষ্ট করল এমন করে নিজেকে। নিজের সব সম্ভাবনা।

বললাম, চলো, ক্লাবে যাই। বিয়ারটিয়ার খাও তো!

কুকু বলল, সবই খাই।

তা হলে চলো।

বাইরে আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। সাদা সিট কভার লাগানো এয়ারকন্ডিশান্ড কালো ঝকঝকে গাড়ি। টুপি পরা ড্রাইভার।

আশ্চর্য! কুকু ইম্‌প্রেসড হল না। একটুও।

বোধহয় বম্বেটম্বে যায় প্রায়ই। ফিল্ম আর্টিস্টদের দেখেছে নিশ্চয়ই। ও পিছনের সিটে আমার পাশে এসে বসল।

রবিবারের দিন। ক্লাবে লোক গিসগিস করছে। সামনেই ইলেকশান। কে কে কমিটিতে ইলেকটেড হবেন আর কে কে হবেন না তাই নিয়ে জোর ফিশফিশানি চলছে। আমাকে ক্লাবের অনেকে চেনে। চেনে বলেই তো কুকুকে নিয়ে আসা! ও দেখুক, জানুক আমি কী হয়েছি আর ও কী .... কলকাতার সব গণ্যমান্য মানুষই এই ক্লাবের মেম্বার।

বিয়ারের অর্ডার দিলাম। ছুটির দিনে আমি এক বোতল করে বিয়ার খাই। জাস্ট এক বোতলই। কুকুকে সে কথা বললামও।

কুকু বলল, মেজার গ্লাসে করে ঢাকার সাধনা ঔষধালয়ের সারিবাদি-সালসা খেলেই পার। শরীর এবং চরিত্র দুইই ভালো থাকবে। মদ এবং জীবন যারা মেপে মেপে খায় এবং খরচ করে তার মানুষ ভালো কখনও হয় না।

আমি কিছু বললাম না।

ও বলল, মদ মানুষের ইনহিবিশান কাটিয়ে দেয়। কিছু মানুষ আছে, যাদের ইনহিবিশান কেটে গেলে সবই কাটাকুটি হয়ে যাবে। বাকি থাকে না কিছুই। সেই মানুষগুলোই মদ খেয়ে মাতাল হতে ভয় পায়।

মাতাল হলে, এই ক্লাব থেকে বের করে দেবে।

বিরক্তস্বরে আমি অন্য দিকে মুখ করে বললাম।

মাতাল হওয়া আর মত্ত হওয়াটা এক নয়। মত্ত হওয়ার কথা বলিনি আমি। যাকগে। বললেও, হয়তো তুমি বুঝবে না। তার চেয়ে বলো টুটুদাদা! লেখাটেখা কি ছেড়েই দিলে একেবারে? কী সুন্দর লিখতে তুমি—

আমি চাপা গর্বের সঙ্গে বললাম, সময় পেলাম কোথায়? প্রফেশানেই তো ...

কুকু বলল, খুবই ব্যস্ত থাক বুঝি? তারপরই চারিদিকে তাকিয়ে বলল, এই সব মানুষেরা কারা?

ক্লাবের মেম্বার, মেম্বারদের গেস্টস আর কারা।

কী করেন এঁরা?

কেউ অ্যাকাউট্যান্ট, কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার। কত্ত প্রফেশান। ইন্টিরিয়র ডেকরেটর, ম্যানেজমেন্ট কন্সালট্যান্ট, আর্কিটেক্স, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বিজনেস এগজিকিউটিভস। আজেবাজে লোক তো এ ক্লাবের মেম্বার হতে পারে না।

কুকু বিয়ারে চুমুক দিয়ে চশমার আড়ালের গভীরে কালো চোখে প্রচ্ছন্ন হাসির ঝিলিক তুলে বলল, স্বাভাবিক। এখানে যাঁরা আসেন তাঁরা সকলেই তোমারই মতো কৃতী পুরুষ জীবনে। তবে টুটুদা ব্যাপারটা কী জান? এঁদের বেশির ভাগেরই কোনো গন্তব্য নেই মনে হয়। শ্যালো, মেগালোম্যানিয়াক মানুষ এঁরা। আমি একেবারেই স্ট্যান্ড করতে পারি না।

কুকু-র ধৃষ্টতা আমাকে মর্মাহত করল। আমার সঙ্গে না এলে এখানে কোনোদিন ও ঢুকতেই হয়তো পারত না। আনগ্রেটফুল সিলি চ্যাপ। এমনিতেই, ওই পোশাকের অদ্ভুত জীবটির দিকে সকলেই তাকাচ্ছে। আমারই পয়সায় বিয়ার খেতে খেতেআমাকেই ঘুরিয়ে যা-তা বলছে। একেবারেই অমানুষ হয়ে গেছে ছোকরা।

গন্তব্য নেই মানে কী? সকলেই কি হরিদ্বারে গিয়ে সাধু হতে হবে নাকি?

আমি শ্লেষের দিকে বললাম।

কুকু হাসল। বলল, তা নয়! আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, এঁদের সাকসেস এবং টাকাকে বিযুক্ত করে ফেললে মানুষগুলির জীবনে বাঁচার মতো কিছু কি বাকি থাকবে? লোকে কি কেবল বাড়ি, গাড়ি, টাকা, নামি-ক্লাবের মেম্বার হওয়ার জন্যেই বেঁচে থাকে? ওঁরা নিজেরা যা করেন, তা কি এনজয় করেন? ওঁরা কি বেঁচে আছেন? ওঁদের মধ্যে কজন সত্যিই বেঁচে আছেন?

এত সব কথার উত্তর আমার কাছে নেই।

কুকু এবার হাসল। বলল, আছে নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তুমি জবাব দিতে চাও না। নিজেকে কখনও এ সব প্রশ্ন ভুলেও করতে চাও না। কারণ তুমি ভালো করেই জান যে, আমি কী বলছি। যা করে, মানুষ আনন্দ পায় না, তা মানুষ করবে কেন? তোমার জীবনের উদ্দেশ্যটা কী? কখনও ভেবেছ এ নিয়ে টুটুদা?

শ্লেষের সঙ্গে আমি বললাম, তোমার জীবনের উদ্দেশ্যটাই বা কী?

আমার উদ্দেশ্য, আমি যা করে আনন্দ পাই, তাই-ই করা। শুনলেই তো। ফিল্মের স্ক্রিপ্ট লিখি। ছবি ডাইরেক্ট করারও ইচ্ছা আছে।

পড়াশোনাই তো শেষ করলে না। ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি থাকলে কত্ত সুবিধা হত বলো তো।

কুকু আবার হাসল। বলল, বিদ্যার সঙ্গে ডিগ্রির সম্পর্ক কী? 'দা পারপাস অফ অ্যান

ইউনিভার্সিটি ইজ টু টেক দি হর্স নিয়ার দা ওয়াটার অ্যান্ড টু মেক ইট থার্সটি।' জিগীষার উন্মেষ ঘটানোই ইউনির্ভাসিটির কাজ। ডিগ্রি তো একটা পাকানো কাগজ। এক কাপ চায়ের জলও করা যায় না তা পুড়িয়ে।

অনেক বড়ো বড়ো কথা শিখেছ যা হোক কুকু। নাও, বিয়ার খাও। সঙ্গে কিছু খাবে?

নাঃ।

কোন কোন ছবির স্ক্রিপ্ট করেছ তুমি? কোনো নাম করা ছবির?

একটা খুব নাম করা উপন্যাসের স্ক্রিপ্ট করেছিলাম। কিন্তু প্রডিউসার তাঁর স্ত্রীর নামেই চালিয়ে দিলেন। যাক, আনন্দটা আমারই আছে। আমার একার। নামটা অন্যর। আর একটা ছবির স্ক্রিপ্ট এখন করছি। মানে, গত পনেরো বছর ধরেই করছি। কবে শেষ হবে জানি না। আদৌ শেষ হবে কি না তাও জানি না। কখনও ভালো প্রডিউসার পেলে কিন্তু দেখিয়ে দেব। একটাই ছবি করব জীবনে। ছবির মতো ছবি।

সত্যজিৎ রায় হয়ে যাবে বলছ? রাতারাতি!

আমি বললাম। ঠাট্টার গলায়।

তা, কে বলতে পারে? মানিকদা যখন কফি হাউসে বসে লাঞ্চের সময় কাপের পর কাপ কফি নিয়ে দূরে তাকিয়ে একটার পর একটা সিগারেট খেতেন তখন অত লোকের মধ্যে থেকেও তিনি নিশ্চিন্দিপুরেই থাকতেন। 'পথের পাঁচালী' তো একদিনে হয় না টুটুদা। জীবনে দামি কিছু পেতে হলে যোগ্য দাম দিয়েই তো পেতে হয়।

বললাম, সে কথা আমাকে না বললেও চলবে। কারণ, আমিও যা পেয়েছি, তা যোগ্য দাম দিয়েই পেয়েছি। কিন্তু তুমি যদি নাম না করতে পার, তা হলে কি তুমি স্বীকার করবে যে, জীবনটাকে নিয়ে তুমি ছিনিমিনি খেললে!

কুকু এবার খুব জোরে হাসল।

বলল, জীবনের মতো, ছিনিমিনি খেলার দারুণ জিনিস তো আর একটিও দেখলাম না। একমাত্র তোমার নিজের জীবনটাই তোমার হাতে। তুমি জীবনে যা দামি বলে মনে করেছ, হয়তো তার পিছনেই ছুটছ। আমি ছুটছি আমি যা দামি বলে মনে করি, তারই পিছনে। নিজের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার নিশ্চয়ই সকলেরই আছে। একটা কথা আমার মনে হয় প্রায়ই জান টুটুদা। জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে আমরা খুব ভয় পাই বলেই আমাদের কিসসু হল না। ছিনিমিনি খেলার মধ্যেই ক্রিয়েটিভিটি নিহিত থাকে।

আমি বললাম, প্রতিভা থাকলেই হয় না। প্রতিভারও গৃহিণীপনার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলছি।

তুমি হাসালে। রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথই। তুমি কি বলতে চাও প্রতিভার গৃহিণীপনা না থাকলে 'রবীন্দ্রনাথ' রবীন্দ্রনাথ হতেন না? আর প্রতিভার গৃহিণীপনা থাকলেই তোমার বন্ধুর মতো আজকালকার ঢক্কা-নিনাদিত পোষা-পাখি সাহিত্যিকরা সব রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠতেন?

তোমার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই।

হ্যাঁ। লাভ নেই। কারণ, তোমার যুক্তি নেই টুটুদা। তুমি যখন কলেজ জীবনে লিখতে, তখন একটা ভালো গল্প লিখে তুমি যে আনন্দ পেতে, আজ তুমি জীবনে যা কিছুই পেয়েছ তার যোগফল কি সেই আনন্দের সমান? একটি ভালো গল্প লেখার আনন্দই কি এই সাফল্যর চেয়ে দামি মনে হয় না তোমার কাছে, সত্যি করে বলো তো?

ভাবিনি কখনও। তবে, কমই বা কি পেয়েছি? এত লোকের জীবন বাঁচাই। এতে আনন্দ নেই? এত স্তুতি, এত যশ, এত টাকা, খাতির প্রতিপত্তি। কম কী?

আনন্দ আছে কি? আসলে, তেমন করে ভাবোনি তুমি। তা ছাড়া তুলনাও চলে না অসম জিনিসে। আনন্দ হয়তো থাকত, যদি স্বার্থহীনভাবে অন্যর জীবনটা বাঁচাবার জন্যেই তা করতে। তুমি ম্যাড্রাসের ড. বদ্রীনাথের নাম শুনেছ? ভেলোরে গেছ কখনও? ওঁরাও ডাক্তার। কিন্তু ওঁরা জানেন, আনন্দ কী জিনিস। তোমার অধীত-বিদ্যা সব তো নিজের কারণে, নিজের হিতেই প্রয়োগ করলে সারাজীবন। তোমার মতো পেশাদার লোকমাত্রই তো পয়সাওয়ালা লোকেদের চাকর। সবাই চাকর। ওরা তোমাদের 'স্যারই' বলুক আর যা-ই বলুক। তুমিও যেমন চাকর, তোমার সাহিত্যিক বন্ধুও চাকর। পশ্চিমবঙ্গে আজ যে কারণে ডাক্তারের মতো ডাক্তার বিরল, ঠিক সেই কারণেই সাহিত্যিকের মতো সাহিত্যিকও বিরল। আমার মনে হয়, পেশার মধ্যে; একমাত্র বেশ্যাবৃত্তিই বোধহয় সবচেয়ে স্বাধীন পেশা এখন। এবং সৎ।

আমি চুপ করে রইলাম। একজন পরিচিত মেম্বার কানের কাছে এসে বললেন, মুতসুদ্দি, আমাদের টাই-আপের কথাটা মনে আছে তো? ওরা কিন্তু ওদিকে সব কিছুই করছে। ঢালাও ড্রিংকস— গার্ডেন পার্টি ... বুঝেছ! ইলেকশন কিন্তু এসে গেছে!

কুকু চারদিকে চেয়ে বলল, তোমাদের ক্লাবে আজ এত উত্তেজনা কীসের?

উত্তেজনা? ইলেকশানের জন্যে। ক্লাবের অফিস-বেয়ারাদের ইলেকশান আছে সামনে।

এই ইলেকশনে কেউ জিতলে কী হবে? তাঁর নতুন হাত-পা গজাবে?

কী আবার হবে? ম্যান অফ ইম্পর্ট্যান্স হবে। আল্টিমেটলি প্রেসিডেন্ট হতে পারলে ক্লাবের কমিটি রুমের দেওয়ালে ছবিও ঝুলবে।

কুকু আবার হাসল। এবারে শ্লেষের হাসি।

বলল সত্যি টুটুদা। তুমি আমাকে ঝুলিয়ে দিলে। আরও বিয়ার আনাও। তোমাদের এই ক্লাবে না এলে অনেক কিছুই অজানা থাকত তোমাদের জগৎ সম্বন্ধে। এই তোমাদের অ্যামবিশান? ব্যস্...স্-স্? এইটুকুই? ক্লাবের দেওয়ালে ছবি ঝোলানোই গন্তব্য তোমাদের জীবনের? এত সামান্য অ্যামবিশান সমাজের শিরোমণিদের? তোমাদের এমন এলিটিস্ট ইলেকটোরেটের যদি এই স্ট্যান্ডার্ড, তবে দেশের গরিব, অশিক্ষিত, অনাহারী ভোটারদের দোষ দিয়ে লাভ কী?

আমি বললাম, আস্তে আস্তে। কেউ শুনতে পাবে।

কুকু হাসল।

বলল, তুমি কেন একবোতলের বেশি বিয়ার খাও না এবারে বুঝলাম। পাছে, সত্যি কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। পাছে, তুমি এই সমাজে, এই ভিড়ে, অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়। তাই না?

বললাম, অন্য কথা বলো কুকু। অন্য কথা বলো।

আহা টুটুদা। তুমি তো অনেকই টাকা রোজগার করলে। বাকি জীবনটা বিনা পয়সায় অপারেশন করো না? গন্তব্য মানে, শুধু হরিদ্বারে গিয়ে সাধু হওয়াই নয়। আমি এই গন্তব্যর কথাই বলছিলাম! নয়তো সব ছেড়ে দিয়ে এবার লেখো। যা কিছু লিখতে চেয়েছিলে, নিজেকে উজাড় করে লেখো। বেটার লেট, দ্যান নেভার!

স্বগতোক্তির মতো বললাম আমি, তুমি তো বলেই খালাস কুকু! ছেলেটার পায়ে দাঁড়াতে এখনও অনেক দেরি।

হাঃ! জোক অফ দ্যা ইয়ার। পুয়োর ফাদার! আমার বাবার কথাই মনে পড়ে গেল! আমার বাবাও ঠিক এই কথাই বলতেন। আর দেখছ তো আমাকে! এখনও ল্যাংচাচ্ছি। পায়ে আর দাঁড়ানো হল না। টুটুদা, তোমার ছেলেটাকে মুক্তি দাও না। ও যা হতে চায় ভালোবেসে, যা করে ও আনন্দ পায়; তাই-ই করুক না হয়। একটাই তো জীবন। বাপের কথামতো নাই-ই বা বাঁচল! ওকে নিজর মতোই বাঁচতে দাও। জীবন মানে কি শুধুই ভালো থাকা, ভালো খাওয়া? জীবনের মানেটাই তো এক-একজনের কাছে এক-একরকম। তাই না?

দেড়টা তো বাজে। এখানেই লাঞ্চ খেয়ে যাও কুকু। ওহো ভুলেই গেছিলাম। তোমাকে তো ডাইনিংরুমে ঢুকতেই দেবে না।

আমি বললাম।

কেন? কুকু মুখ লাল করে বলল, দেবে না কেন?

তুমি যে স্যুট পরে নেই।

স্যুট পরে নেই মানে? আমার তো স্যুট একটিও নেইও। কিন্তু ব্যাপারটা কী?

না। ব্যাপার কিছু নয়। শীতকালে স্যুট ছাড়া এই ক্লাবের ডাইনিং হলে ঢোকা বারণ।

কুকু, হোঃ হোঃ হোঃ করে ফুলে ফুলে হাসতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর হাসি থামিয়ে বলল, আমাদের বাবারা সব অসহযোগ করে, খদ্দর পরে আর চরকা কেটে ইংরেজ তাড়াল পঁয়ত্রিশ বছর আগে দেশ থেকে। আর আজকেও স্যুট ছাড়া দিশি লোকদেরও তোমরা খাওয়ার ঘরে ঢুকতে দাও না? জয়। ভারতের জয়! তোমাদের জয়। এই ভারতবর্ষ স্বাধীন করার জন্যেই আমার ন'কাকা পুলিশের গুলি খেয়ে মরেছিল। সত্যই সেলুকাস! বিচিত্র এই দেশ।

অনেকেই আমাদের টেবিলের দিকে দেখছিল। পরে জিজ্ঞেস করবে নিশ্চয়ই, কাকে নিয়ে এসেছিলাম আমি? ইজ্জত একেবারে গলিয়ে দিল কুকুটা। আসলে, দোষ আমারই।

এ সব লোককে নিয়ে পার্ক স্ট্রিটের বার-টারেই যাওয়া উচিত ছিল।

কুকু বটমস-আপ করে বলল, এবার উঠব। আমার দমবন্ধ দমবন্ধ লাগছে এখানে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। নট সো মাচ ফর দ্য বিয়ার। বাট, আমাকে এক নতুন জগতের সঙ্গে আলাপিত করালে বলে। এখানে আজ না এলে, আমি হয়তো বোকার মতো পুরোনো বিশ্বাসই পোষণ করতাম যে, পৃথিবীতে ডাইনোসররা আর বেঁচে নেই।

বাইরে বেরিয়ে কুকু আর গাড়িতে উঠল না।

বলল, আমি বাসেই চলে যাব। তুমি তো যাবে উলটোদিকে। কেন ঘুরবে মিছিমিছি আমার জন্যে?

খাবে না? চলো, অন্য কোথাও গিয়ে খাই।

খেয়ে নেব কোথাও। খাওয়াটা তো এমন কিছু ব্যাপার নয়। কিছু জুটলেই হল খিদের সময়। চলি, টুটুদা।

কুকু আমার সঙ্গে এলেই ভালো হত। বাড়িতেই খিচুড়ি বা ভাতে ভাত খেতাম। একবার ভাবলাম, কুকুকে জোর করে বাড়িতে ধরে নিয়ে যাই। গিয়ে, অনেকগুলি বিয়ার খাই, খেয়ে; যে সব কথা আজকে অনেক বছর আমার বুকের মধ্যে পাথরের মতো চেপে বসে আছে, যে সব কথা আমার স্ত্রী, আমার পরিচিত মানুষেরা, আমার সমাজে যাদের যাতায়াত তারা কেউই কখনও শুনতে চায়নি এবং বলতেও দেয়নি আমাকে, যে সব কথা শুনলেও কানে আঙুল দিয়ে আমাকে বলেছে, 'সাইকোলজিকাল কেস', 'কনফিউজড', বলেছে 'ইডিয়ট', সেই সব কথা কুকু-র হাতে হাত রেখে চোখের জলে বলতাম ...

কিন্তু কুকু ততক্ষণে মোড়ের ভিড়ে মিলিয়ে গেছে বড়ো বড়ো পা ফেলে।

কী সুন্দর ওর হাঁটার ভঙ্গি! ইসস! কত্ত দিন আমি ভিড়ের মধ্যে, আমার এই ফালতু, মেকি সত্তাকে হারিয়ে দিয়ে, দশজনের একজন হয়ে হাঁটি না। কত্ত দিন ছোটবেলার মতো ফুচকা খাই না। আলুকাবলি। রাধুর দোকানের চিকেন-রোস্ট, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। বসন্ত কেবিনের মোগলাই পরোটা!

ড্রাইভার বলল, কাঁহা চলেগা সাব?

আমি দরজা খুলে নেমে পড়ে বললাম, তুমি বাড়ি চলে যাও। আমি চলে আসব।

ও একটুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

তারপর কিছু না বলে চলে গেল।

ভিড়ের মধ্যে শীতের মিষ্টি রোদে হাঁটতে খুব ভালো লাগছিল আমার। হাঁটতে হাঁটতে নিজের কাছ থেকে নিজে দূরে এসে আমার কাচের ঘরের জীবনটাকে স্বচ্ছভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম আমি। যে সমাজে আমার মেলামেশা, চলাফেরা, সেখানে ড্রাইভারেরা রোবোট। নিজে থেকে কথা বলা বারণ তাদের। তারা মানুষ নয়।

হয়তো সেখানে প্রত্যেকটা মানুষই রোবোট। সেখানে নিজের মস্তিষ্ক দিয়ে কেউই ভাবে

না। নিজের চোখ দিয়ে দেখে না। নিজের ইচ্ছেতে কেউই চলে না। সারাজীবন, সেখানে প্রত্যেকটি মানুষ, অন্য কোনো মানুষের ভূমিকাতে রং মেখে, স্যুট-পরে, উদ্দেশ্যহীন, উৎকট অভিনয় করে চলে। প্রতিদিন। আমৃত্য!

কুকু গড্ডালিকায় গা ভাসানো, পথ হারানো আমাকে এইমাত্র সঠিক পথের হদিস দিয়ে গেল।

ব্যাঙডাকির মেয়ে

কী হল অরোরা? আমার রেসিডেন্সের ফোনের লাইন পাওয়া গেল না এখনও? একটু উষ্মার সঙ্গেই বলল শ্রাবণ।

অরোরা ঘাবড়ে গিয়ে টেলিফোন অপারেটর মিস মালপানিকে রাগের গলায় বলল, সংগীতা, রায় সাহাবকো রেসিডেন্সকা লাইনে কি ক্যা হুয়া?

আই অ্যাম ট্রাইং সার।

হোয়াট ট্রাইং? গেট ইট বাই ওল মিনস গেট ইট অন ডিম্যান্ড অর লাইটনিং।

তুমহারা দেল্লি, কলকাত্তাকি বরাবর হো গায়ি। টেলিফোনকি বারেমে।

শ্রাবণ বলল।

নেহি সাব। মিল তো যাতা লাইন। ইয়ে সংগীতাকি বদনসিবি।

এবারে ফোনটা বাজল।

অরোরা রিসিভার তুলেই বলল, লিজিয়ে সাব। মিলা।

হ্যালো। কে?

আমি। ভাতি।

বাড়িতে আর কেউ নেই?

বাড়িতে আর কেউই নাই!

শ্যাম কোথায়?

শ্যাম কাল চইল্যা গেছে গিয়া। বউদি চইল্যা যাইতে কইছিল।

কেন?

আমার সাথে খুবই ঝগড়া করতাছিল। জলের বোতল নিয়া মারতে আইছিল আমারে। ডাকাইত একডা! বুড়া, তায়, আবার কলপ কইর‍্যা হিরো বনবার চায়!

থাক ও সব কথা। বউদি কোথায়?

বউদি বাইরাইছে। কইতাছিল বুনের বাড়ি যাইব।

বুনটা কে?

আঃ। বুইন।

কী যে বলিস তুই!

আরে! চাঁপাদিদি। বুন না?

ও চাঁপা। বোন বলবি তো। কী বুন-বুইন করছিস! বউদি এলে বলিস যে, ফোন করেছিলাম।

তুমি আসবা কবে দিল্লি থিক্যা?

শনিবার। বলে দিস। ছোটো দাদাবাবু আর বউদি কোথায়?

ও মা। অফিসে আর স্কুলে। জান না য্যান তুমি?

জানি।

আর কি কইবা, কও।

তোরা সকলে ভালো আছিস তো?

হেঁ।

বউদিকে বলিস। ওদেরও।

শনিবার কখন আসবা?

দুপুরে।

কী মাছ খাবা কও। বউদিরে কম্যু। ভালো কইর‍্যা রাঁইধ্যা রাখুম।

যা খুশি।

কও না। না জাইন্যা নিলে বউদি আবার রাগ করব। বাড়িতে তো খাওনা কত্তদিন।

ঠিক আছে। ছাড়ছি। বলে দিস। ফোন করেছিলাম।

বলেই, শ্রাবণ ফোনটা ছেড়ে দিল।

ইজ ইট ওভার স্যার?

মিস মালপানি শুধোলেন।

ইয়েস। থ্যাংক উ্য ভেরি মাচ।

ফোন ছেড়ে দিয়েই ওর চিন্তা হচ্ছিল। ভাতি, ওদের বাড়ির রান্নার মেয়েটি ন-তলার মালহোত্রার ফ্ল্যাটের চাকর পাঁচুর সঙ্গে প্রেম করছে। উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে। সুযোগ পেলেই সারভেন্টস কোয়ার্টারে চলে যায়। কখন যে কী ঘটে যাবে!

যূথী বলেছিল আজকাল অল্পবয়সি কাজের মেয়ে ফ্ল্যাটবাড়িতে রাখার অনেকই নাকি বিপদ। তা ছাড়া, একদল নাকি বাবুদের ব্ল্যাকমেইল করতেই আসে। নিজের প্রেমিকের বা স্বামীর সঙ্গে শুয়ে, প্রেগন্যান্ট হয়ে, বাবুদের ন্যামে দোষ চাপিয়ে টাকা আদায় করে; স্ক্যান্ডাল রটানোর ভয় দেখিয়ে।

বন্ধ জানালার কাচ দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখল শ্রাবণ। আঁধি বইছে দুপুরের দিল্লির বুকে। ঘোড়দৌড়ের দলবদ্ধ মেটে লালরঙা ঘোড়াদের মতো হুহু করে দৌড়ে যাচ্ছে মেটেরঙা ধুলো তাড়িয়ে নিয়ে হাওয়াটা তারপর আকাশ, গাছপালা সব লাল ধুলোর মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে।

ভাতি বাড়িতে একলা আছে এ কথাটা ভেবেই আতঙ্ক উপস্থিত হল শ্রাবণের। শ্যামটা অনেকই পুরোনো লোক ছিল। কিন্তু যতই পুরোনো হচ্ছে ততই ছিঁচকে চোর আর লোভী হচ্ছে। তা ছাড়া প্রচণ্ড চিৎকার চ্যাঁচামেচিও করে। চরম উত্ত্যক্ত হয়েই হয়তো ছাড়িয়ে দিয়েছে যূথী।

কিন্তু ...

॥ ২ ॥

দিল্লি থেকে কলকাতায় আসার সকালের ফ্লাইটটা দশটা দশ-এ। কিন্তু ছাড়ল এক ঘণ্টা দেরিতে। দমদমে নামল সাড়ে বারোটা নাগাদ।

লিফটে উঠে ফ্ল্যাটের দরজাতে পৌঁছেই কলিংবেল টিপে টিপে হাত ব্যথা হয়ে গেল কিন্তু কেউই খুলল না। বিরক্ত, ক্রুদ্ধ এবং অবাক হয়ে পাশের ফ্ল্যাটে খোঁজ নেবে কি না ভাবছে এমন সময় একমুখ হেসে দরজা খুলল ভাতি।

রাগের গলায় শ্রাবণ বলল, ছিলি কোথায়?

আর কন ক্যান দাদা? একটা পাগল কোকিল কাল রাত থিক্যা এমনই ডাকতাছে যে কী কম্ম্য।

কোকিল?

আকাশ থেকে পড়ে বলল শ্রাবণ? এগারোতলার ফ্ল্যাটে কোকিল!

হ্যাঁ। কোকিলের ডাক, গাছে গাছে নতুন চিকন পাতা। রোদ পইড়্যা কী দারুণ চমকাইতেছে তারা। বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলাম আর ওই বাঁদিকের ভাঙা বাড়িটায় একটা কাঞ্চনগাছ আছে, দ্যাখছ দাদাবাবু? কী ফুলই না ফুটছে! আইস্যো আইস্যো, দেইখ্যা যাও একবার!

হাতের ওভারনাইটারটা নামিয়ে রেখে শ্রাবণ ওর কথাতে ওর সঙ্গে হেঁটে গিয়ে বারান্দাতে দাঁড়াল ওরই ঘরের বারান্দাতে। কলকাতায় এগারোতলা ফ্ল্যাটবাড়িতে থেকে, সারাদিন কী কলকাতা, কী দিল্লি, কী বম্বে সবসময়েই এয়ারকন্ডিশন্ড অফিসে কাজ করে, কোকিল, গাছেদের নতুন কচি-কলাপাতা রঙা পাতা, আর কাঞ্চন ফুলের জগৎ যে এখনও আছে তা সে ভুলেই বসেছিল। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে ভাতিকে বকতেই ভুলে গেল। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দুপুর একটার সময় আবহাওয়া বদলে যাওয়া পৃথিবীর এক কোণে এগারোতলার বারান্দাতে দাঁড়িয়ে ভাতির চোখ দিয়ে কলকাতার এই অঞ্চলকে সে একেবারে নতুন চোখে দেখল।

বারান্দায় এসে দাঁড়ালে সত্যিই তো ভিতরের কোনো শব্দই কানে আসে না। মনের বারান্দাতে দাঁড়ানোরই মতো। কলিংবেল-এর আওয়াজ না শোনাতে ভাতির কোনো দোষ নিল না সে কথাও বুঝল।

ওই দ্যাখো। দ্যাখছ? কী ফুলই না আইছে কাঞ্চন গাছটায়!

হুঁ।

বলল, শ্রাবণ।

তারপরই ভাবল, ফুলের গাছ নিয়ে ভাতির সঙ্গে কাব্য করেছে জানলে যূথী ভীষণ রেগে যাবে। পুরুষ হয়ে জন্মেছে। ষোলো বছরের বেশি বয়সি নারীমাত্রকেই লোডেড রিভলবারের মতো হ্যান্ডল করতে হয় যে, তা ও শিখেছে। বড়ো বিপদ!

চান করবা না?

করব। বউদি কোথায়?

নি মার্কেটে।

নিউ মার্কেট। বুঝল শ্রাবণ।

কখন আসবে?

আইস্যা যাইবোনে। খাবার কি গরম করুম?

না। বউদি আসুক। আমি চান করতে যাচ্ছি বউদি বেল দিলে খুলিস যেন, আমি তো দশ মিনিট দাঁড়িয়েছিলাম।

খুলুম। খুলুম। বসন্তকাল আইলো তো! সেই লাগ্যে তো! মনটা হুড়দুম্-দুরগুম করে।

চান করতে করতে শ্রাবণ ভাবছিল ভাতি যে চোখ দিয়ে এই পৃথিবীকে দেখে বা শোনে সেই চোখ দিয়ে ও কেন দেখতে পারে না। শহরে শহরে ঘুরে, জীবিকার ঘানিতে নিরুপায়ভাবে জুড়ে গিয়ে ওর মনের মধ্যের অনেক ভালো জিনিই মরে গেছে। নষ্ট হয়েছে কিছু অঙ্কুর; কিছু বীজ। যেসব বীজ আর কোনোদিনও অঙ্কুরিত হবে না।

ভাতিদের বাড়ি কুচবিহারে। শহরে নয়। গ্রামে ওর নাকি মা-বাবা কেউই নেই। দাদারা আছে। কিন্তু বউদিরা একদিন খারাপ ব্যবহার করতে ও বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসে। শ্রাবণের বেকার খুড়তুতো ভাই কমলের শ্বশুরবাড়ি কুচবিহারে। কাজের লোকজনের বড়ো অসুবিধা একথা যূথীর কাছে শুনেছিল কমল। শ্বশুরবাড়ি থেকে আসার সময় সোজা স্টেশন থেকে নেমে ভাতিকে এক রবিবারের দুপুরে শ্রাবণদের বাড়িতে তুলে দিয়ে চলে যায়। তারপরই কমল চাকরি পেয়ে চলে যায় পারাদ্বীপে।

শ্রাবণ খুব রাগ করেছিল, কমলের কাছ থেকে যূথী ভাতির দেশের বাড়ির ঠিকানটাও রাখেনি বলে। কমলকে চিঠি লেখা হয়েছে পারাদ্বীপে। কিন্তু উত্তর আসেনি। কমলের বউ, ধানি বলেছে, তেমন কিছু হলে ওকে জানালেই হবে। কুচবিহারে ভাতিকে পৌঁছে দেবার লোকের অভাব হবে না। কিন্তু শ্রাবণ চিন্তায় মরে যায়। যদি কিছু ঘটে যায়।

যূথীর সঙ্গে মনোমালিন্য হলে, টিভি দেখতে না দিলে ভাতি এমন জংলি পশুর মতো

রেগে ওঠে যে, ভয় হয় কোনোদিন না দশতলার বারান্দা থেকে লাফিয়েই পড়ে। পাঁচুর সঙ্গে প্রেমটাও ওর পাশবিক। তোরসা নদীর গন্ধ এখনও ভাতির গায়ে লেগে আছে। তোরসারই মতো ওর চালচলন। ব্যাঙডাকি জঙ্গলের কটুগন্ধী ফুলেরা ওর মস্তিষ্ক প্রভাবিত করে রেখেছে। পুরোপুরিই জংলি মেয়ে এই ভাতি। এই মালটিস্টোরিড বাড়ির ছোটো ফ্ল্যাটের সীমার মধ্যে ওর দম বন্ধ হয়ে আসে। বুঝতে পারে শ্রাবণ। গ্রাম বাংলার ছেলে ও। ওরও প্রথম প্রথম দম বন্ধ হয়ে আসত। শ্রাবণ কি আছে ছোট্ট ফ্ল্যাটে! কিন্তু যূথী কলকাতর মেয়ে। এসব কথা ও বোঝে না। যারা গ্রাম দেখেনি, গ্রামে থাকেনি তাদের এসব কথা বলাও মিছিমিছি। দিগন্তমেলা আকাশ, তোরসার বান, বাঙডাকি জঙ্গলের আলোছায়ার, গাছপালার গভীর রহস্য ভাতির চোখের মণিতে যেন মালটি-কালারড বৈদ্যুতিক বাল্‌ব-এর মতো খেলা করে। বুঝতে পারে শ্রাবণ। কিন্তু ও একা। ওই প্রবল-যৌবন বাড়ন্ত গড়নের জংলি মেয়েকে তার চাপল্য ও দুঃখকে বোঝে এমন আর কেউ এই ফ্ল্যাটে ছিল না।

তাই, ভারী ভয় করে ভাতির জন্যে।

যূথী অনেকদিন বুঝিয়েছে ওকে। ফ্ল্যাটবাড়িতে পঞ্চাশটি ফ্ল্যাট। কতরকম লোক বাস করে এই ফ্ল্যাটে। তোর মতো অল্পবয়সি মেয়েদের পক্ষে নষ্ট হয়ে যাওয়াটা কোনো ব্যাপারই নয়। তারপর কোনো নরকে নিয়ে গিয়ে তুলবে তোকে। তখন আমাদের দোষ দিস না।

ভাতি রাগে বেড়ালনির মতো ফুলে ওঠে এসব কথা শুনলে। বলে, ইসস। অত্ত সোজা। চুল ছিঁইড়া দিম্যু না। নাক কামড়াইয়া দিম্যু।

যূথী হতাশ হয়ে দু হাতের পাতা উপরে তুলে, মেলে, কিছু বলতে চায় ওকে। এই মহানগরীর ভয়াবহতা সম্বন্ধে বোঝাতে চায়; কিন্তু নিরুপায়ে চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে।

চান সেরে উঠে শ্রাবণ বলল, খাবার লাগা ভাতি। দিতে দিতে বউদি এসে যাবে।

ওমা! দাঁড়াও। আমি চান কইর‍্যা লই। এক মিনিট।

এই চান করা নিয়েও অনেকই সমস্যা।

সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের যে বাথরুম, তার দরজাতে অনেক ফুটো। নীচটাও ফাঁকা। বিহারি, উত্তরপ্রদেশীয় হিন্দু, কাজের লোকেরা ও দক্ষিণ বাংলার কিছু নানা-পেশার মুসলমানের বাস এই সব সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে। অনেকের আত্মীয়স্বজনও এসে থাকে। প্রতি তলার মেজানিন ফ্লেরে ওদের কোয়ার্টার। প্রথমদিন ভাতি চান করতে গিয়ে কেঁদে ফেরে এসে বলেছিল, মেলা চোখ। দরজার ফুটার মধ্যে দিয়া চক্ষুগুলান আমারে গিইল্যা ফ্যালাইতে চায়। বান্দর কতগুলান্।

তারপর থেকে যূথী বলেছিল, রান্নাঘরের লাগোয়া কভারড বারান্দাতে চান করতে।

প্রথমদিনই ভাতি রান্নাঘরের লাগোয়া বারান্দা ভেতর থেকে বন্ধ করে চান করে এসে

বলল, সামনের আর পাশের বাড়ির দারোয়ানগুলো আমারে হাতছানি দিয়ে ডাকতেছিল বউদি। আমিও লাথথি দেখাইয়া দিছি?

করিস কী ভাতি?

যূথী বলেছিল। আতঙ্কিত গলায়।

তা, এতদূর থিক্যা আর কী করুম? কাছে পাইলে তো কান কামড়াইয়া ছিঁড়্যা থুইতামানে।

যূথী বারান্দাটা এখন কাচ দিয়ে পুরো ঢেকে দিয়েছে ওর চানের জন্যে। যাতে আবরু রক্ষা হয়।

কিছুক্ষণ পর ভাতি চান করে এল। শ্রাবণ 'দেশ'-এর পাতা উলটোচ্ছিল বসবার ঘরে বসে বসে।

একটা কচি-কলাপাতারঙা সস্তা, পুরোনো, তাঁতের শাড়ি পরেছে ভাতি। তেল দিয়েছে মাথায়। যত্ন করে চুল আঁচড়েছে। মুগ্ধ চোখে তাকাল শ্রাবণ। এ মুগ্ধতা প্রেমের মুগ্ধতা নয়, কামের মুগ্ধতাও নয়। মুগ্ধতার অনেক রকম হায়!

ভাতি বলল, শ্রাবণের চোখ পড়ে বলল, কী? বলবা কিছু বুঝি আমারে?

নাঃ।

তবে? তাকাইয়া আছো ক্যান?

শ্রাবণ হেসে বলল, এমনিই!

এই হীন, কুচক্রী, নীচ, কংক্রিটের জঙ্গলের মধ্যে ভাতি, শ্রাবণদের জন্যে এক দারুণ পৃথিবী নিয়ে এসে এই এগারোতলার ছোট্ট ফ্ল্যাটে ছেড়ে দিয়েছে। ফ্ল্যাটের মধ্যে দিয়ে তোরসা বয়ে যাচ্ছে। দূরের রায়ডাক আর তিস্তার গন্ধ আসছে নাকে। কাঞ্চন ফুলের নরম বেগুনি আলো আর কোকিলের ডাক, ব্যাঙডাকি জঙ্গলের অপার সব রং-বেরঙা-রহস্য বন্দি হয়েছে এখানে ভাতিরই কল্যাণে। শ্রাবণ একথা জেনে খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করে। তাই...

দিম্যু খাবার?

দাঁড়া।

তাইলে আমি বারান্দায় যাই? কোকিলের ডাক শুনি গিয়া?

যা।

দরজাটা খুইল্যা দিয়ো বউদি আইলে, নইলে আমি বকা খামু।

দেব।

ভাতি বসবার ঘরে কচি-কলাপাতা রং ছড়িয়ে ওর চুলের তেলের গন্ধ উড়িয়ে বারান্দায় চলে গেল।

যূথী এবং শ্রাবণের ছোটো ভাই ভাদ্রের স্ত্রী জিনি, মাথায় কখনোই কোনো তেল দেয় না। শ্যাম্পু করার দিন ছাড়া। সিঁদুর পরে না সিঁথিতে। ভাতি এই ফ্ল্যাটের জীবনে

এক অন্য জীবনকে মিশিয়ে দিয়েছে। সেই মিশ্রণ ক্রমশই ঘন হচ্ছে। শ্রাবণ বুঝতে পারে। শ্রাবণ ভাবে, কোনোদিন একটা কাঞ্চন ফুলের গাছের জন্য, কাঞ্চন ফুলের জন্যে, ওদের এই মেকি অভ্যেসের জীবনে, ক্লান্তিকর জীবনে, ভাঙন না ধরে যায়! আস্ত ব্যাঙডাকি জঙ্গলটাই উঠে এসে বসতে পারে ফ্ল্যাটের মধ্যে কোনোদিন। তোরসা নদীর জলও বয়ে যেতে পারে।

শ্রাবণ এ কথাটা মনে করেই ভীত হয়ে ওঠে।

যূথী আর জিনি ভাতিকে 'বাঙাল' বলে খ্যাপায়।

ভাতিকে ওরা আন্ডার এস্টিমেট করছে। ভাতিকে এখান থেকে তাড়াতে হবে এমন কথা যূথী আর জিনি প্রায়ই বলে।

মেয়েরা তাদের ঘরের মধ্যে তাদের মনোনীত গন্ধ ছাড়া অন্য কোনো গন্ধই পছন্দ করে না। তাদের যুক্তি মানে না শ্রাবণ। কিন্তু তা নিয়ে কিছু বলেও না। আর সত্যিই হয়তো চলে যাবে কোনোদিন। যূথী আর জিনিই ছাড়িয়ে দেবে। তাড়িয়ে দেবে। তখন এই ফ্ল্যাটে কোকিলের ডাক, কাঞ্চন ফুলের শোভা, তোরসার জলের গন্ধ আর ব্যাঙডাকি জঙ্গলের মিশ্র শব্দ; বনজ্যোৎস্নার আর সবুজ অন্ধকারের আভাস কিছুই আর থাকবে না।

শ্রাবণ জানে, ভাতিকে ওরা শিগগিরি ছাড়িয়ে দেবে। পঞ্চুর সঙ্গে প্রেম করছে বলে নয়। সম্পূর্ণ অন্য এক মেয়েলি কারণে।

ভাতি বলল; খাবা, আইস্যো।

শ্রাবণ বলল, হুঁ।

লিখন

এখনও রওনাই হওয়া গেল না। কখন যে কী হবে তা ভগবানই জানেন।

অপা স্বভাবজাত প্রাণপ্রাচুর্যর সঙ্গে স্বগতোক্তি করল নয়নের দিকে তাকিয়ে।

সুস্মিতার সবে বিয়ে হয়েছে। একেবারে ছেলেমানুষ। স্বামী নয়নের উপর কতখানি জোর আছে ওর এখনও তা পুরোপুরি পরখ করা হয়নি। তা ছাড়া স্বভাবটাই ওর চাপা। সহজে উত্তেজিত হয় না, চুপচাপ ভাবতে ভালোবাসে।

নয়ন বলল নিয়োগী সাহেব, কর সাহেব, চট্টখণ্ডী সাহেব সকলে বোস সাহেবকে সঙ্গে করে যখন এগিয়ে গেছেনই তখন সবই ঠিকমতো হবে। আরও তো অনেকে গেছেন। তুমি এত চিন্তা কোরো না তো অপাবউদি।

বলেই বলল, আমি এগিয়ে যাচ্ছি।

অপা বলল, সাবধানে যেয়ো তুমি নয়ন। জঙ্গলের রাস্তা। তারপর চট্টখণ্ডী সাহেবের বাংলোর বাগানের কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে সমবেত মহিলাদের উদ্দেশে বলল, চিন্তা না করেও পারা যায়? বলো তোমরা? পিকনিক করবে সারান্ডার জঙ্গলে। তাও আবার মুনলাইট পিকনিক। কখন হাতি, বাইসন, বাঘ বেরুবে তার ঠিক নেই।

মুন তো উঠে গেছে অনেকক্ষণ, মুনলাইটেরও অভাব নেই কিন্তু মুনলাইটে তো আর পেট ভরবে না। সেদিকে রান্নাবান্না করছেন কি আমাদের কর্তারা?

মিসেস সান্যাল বললেন।

মনীষা বলল, যত গণ্ডগোলের মূলে ওই লোকটি। ওই বোস সাহেব। উনি আসার পর থেকেই যত গণ্ডগোল শুরু হয়েছে এখানে। 'উঠল বাই তো কটক যাই'।

মিসেস ব্যানার্জি বললেন, যা বলেছ ভাই। আমার স্বামীর জন্মই তো বড়বিলে। তোমার কর্তাও তোমার শ্বশুরমশাই'র আমল থেকে আছেন এখানে, কিন্তু আজ অবধি

বড়বিল-বড়জামদার লোকেদের মুখে মুনলাইট পিকনিকের কথা কখনও শুনেছ? বিশ্বকর্মা পুজোয়, সরস্বতী পুজোয় দুপুরের খাওয়াদাওয়া, ঠিক আছে। বিজয়া সম্মিলনী, কারও বাড়ির লনে, তাও ঠিক আছে। কিন্তু এ কী ব্যাপার!

কোনো সন্দেহই নেই তাতে। যা হই-হুল্লোড় চলেছে তাতে মিত্র এস কে আর ব্রিগস কোম্পানি তো দূরের কথা, দুর্গাপুর স্টিলস, হিন্দুস্থান স্টিলসও না উঠিয়ে দিয়ে যায় এই লোকটা। আমাদের এখানের জীবনযাত্রা বেশ শান্ত, নিরিবিলি, সময়-মাপা ছিল। নির্ঝঞ্ঝাট। সমস্ত উলটোপালটা করে দিল মানুষটা এসে।

মিসেস সেন বললেন।

মিসেস গুহ বললেন, আরও একটা কথা, মিস্টার বোস এসে এদের প্রত্যেকেরই চরিত্র নষ্ট করে দিলেন।

চরিত্র?

মেয়েরা সমস্বরে গুঞ্জন তুললেন। এই লোহা আর ম্যাঙ্গানিজ খনির এলাকাতে যৌবন চলকে-চলা খিলখিল হাসি সুশ্রী আদিবাসী রেজাদের বাস হাজারে হাজারে। ওরা এদেশীয় শহুরে, শিক্ষিত মেয়েদের মতো সমাজ-ভীতিতে জড়সড়ো নয়। ন্যাকাও নয়। হাঁড়িয়াও এখানে 'কারো' নদীর জলের মতোই ফেনা ছিটিয়ে বয় জলেরই মতো। অতএব চরিত্র এখানে একবার বৃন্তচ্যুত হলে চৈত্র শেষের ঝরা শালপাতারই মতো মত্ত হাওয়াতে গড়াতে গড়াতে গিয়ে কোন গিরিখাত বা নরম উপত্যকায় গিয়ে প্রস্তরীজ্ঞ হবে যে তা বলা মুশকিল। স্থানীয় প্রত্যেক মহিলাই তাই তাঁদের স্বামীদের চরিত্র সম্বন্ধে সব সময়ই কানখাড়া, সজাগ।

চরিত্রের প্রশ্ন ওঠাতে মিতভাষী, ব্যক্তিত্বসম্পন্না, এবং নিঃসন্দেহে সুন্দরী অপা যুগল ভুরু তুলে মিসেস গুহর দিকে চেয়ে বলল, চরিত্র বলতে তুমি কী বলতে চাইছ?

রুনা বলল, বেলাদি, বোস সাহেবের চরিত্র দোষের আপনি নিজে কি কিছু প্রমাণ পেয়েছেন?

মহিলা মহলে হাসির রোল উঠল।

মিসেস গুহ লাল-গাল করে বললেন, এমন বোকা বোকা কথা বোলো না তুমি। তারপর বললেন, দ্যাখো রুনা, আমি কমার্সের ছাত্রী! তোমাকে বলতে পারি, চরিত্র হচ্ছে একরকমের ইনট্যানজিবল অ্যাসেট। থাকলেও প্রমাণ করা যায় না যে আছে। হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না। না থাকলেও প্রমাণ করা যায় না যে, নেই। বলেই, অপার দিকে চেয়ে বললেন, তোমার বরকে জিজ্ঞেস করো অপা উনিও তো অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাজই করেন।

অপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সকলের অলক্ষ্যে। ভাবল তার স্বামী প্রাণেশ অ্যাকাউন্ট্যান্ট হতে পারে, কিন্তু সে যে নিজেই একটা ইনট্যানজিবল অ্যাসেট। আছে কি নেই তা বোঝা পর্যন্ত যায় না। মুখে অবশ্য কিছুই বলল না।

মনীষা বলল, একশোবার বোঝা যায় চরিত্র আছে কি নেই। গ্যাঁদাল পোকাকে টিপে মারলে তার দুর্গন্ধ চাপা থাকে না। তুমি কিন্তু প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলে বেলা।

মিসেস গুহ বললেন, আমি বলতে চাইছিলুম মদের কথা। লোকটা আসার পর থেকে এখানের সকলেরই বড়ো মদ মদ বাতিক হয়েছে। আগে আমার উনি বাড়ি ফিরেই বলতেন কই গো! নেবু থাকলে একটু নুন দিয়ে ফ্রিজ থেকে একটুকরো বরফ বের করে দাও দিকিনি এক গ্লাস। এই বোস সাহেবের সঙ্গে মিশে বলতে শুরু করেছেন বিয়ার না খেলে এইরকম রুখু পরিবেশে নাকি শরীর ট্যাকানোই দায়। ডি-হাইড্রেশন হয়।

সকলেই হেসে উঠলেন মিসেস গুহর চোখ নাচিয়ে বলার ভঙ্গি দেখে।

যা বলেছ! দুষ্টের ছলের অভাব হয় না। চুমকি বলল। আমার ও-ও আজকাল বলতে শুরু করেছে, দারু পিয়া তো কেয়া বাফা? দিল খুশ অউর পেট সাফা! হুইস্কি খেলে নাকি পরদিন ...। এখানের জলে যে মারাত্মক রকমের আয়রন আর আয়রনে কনস্টিপেশান করায় তা নাকি এত বছর পরে বোস সাহেবের কাছ থেকেই জানল। ঢং দ্যাখো এদের।

অপা হেসে বলল, বোস সাহেব লোকটা তোমাদের সকলের বরদের এমন ভেড়া বানিয়ে দিল। বাহাদুরি আছে বলতে হবে!

ঊর্ণা বলল, তুমিও যেমন অপাদি। সবই সমান। কার ঘাড়ে দোষ চাপাবে বুঝতে পারছিল না এরা। এতদিনে শক্ত কাঁধের স্কেপগোট জোগাড় হয়েছে একজন। মহাদেবের গায়ে তো কলঙ্ক লাগে না, সকলে মিলে বেদম কালি ছিটোচ্ছে। তোমাদের সকলের বরই যেন ...।

অপা বলল, এবার তোরা থাম তো! একটা লোকে নিয়ে এত আলোচনা আর ভালো লাগছে না। সে কে এমন কেওকেটা যে, তোরা আলোচনার অন্য কিছু খুঁজেই পাচ্ছিস না?

ঊর্ণা বলল, যাইই বলো আর তাইই বলো, আপদ গেলে বাঁচি।

— যাবে কবে?

— শুনছি তো শিগগিরই যাবে। জিয়োলজিস্ট মানুষ। কী সব প্রসপেকটিং-টেকটিং করতে এসেছে।

সুস্মিতা সশব্দে একটা মশাকে নিজের বাঁ গালের উপরে মেরে, মিনমিন করে বলল, সত্যি! সাড়ে সাতটা বেজে গেল এখানেই, ওরা সব কখন আসবে, কখন যাওয়া হবে? আর আমরা ফিরবই বা কখন?

তা ফিরতে ফিরতে দুটো আড়াইটা হবে রাত? মনীষা বলল।

কী বললে? রাত আড়াইটে। ভাগ্যিস শাশুড়ি কাল টাটাতে ননদের বাড়ি চলে গেলেন। নইলে হত দুমপিট্টি।

মিসেস সেন বললেন। কিন্তু যাওয়া হবে কোনদিকে?

— কথা ছিল কিরিবুরুর দিকে। কিন্তু কালই কিরিবুরুর কাছে রাস্তার উপরে কাজের শেষে একজন রেজা তার বাচ্চাকে নিয়ে বসে জিরোচ্ছিল। একটা একরা হাতি এসে বাচ্চাটাকে আলতো করে তুলে পাশের ঝুড়িতে বসিয়ে দিয়ে রেজাটিকে শুঁড়ে নিয়ে পাশের কারি-কেন্দু গাছের মোটা ডালে ধোপা যেমন পাট দেয় কাপড়কে, তেমন করে পাট দিয়ে শেষ করে দিয়েছে।

— ও মাগো! বোলো না। ইস্ শুনেই গা কীরকম করছে।

উর্ণা বলল, তা হলে আমরা জামদা থেকে বিষ্টুমামাকে তুলে নিয়ে যাই। পাহারা দেবার জন্য।

— বিষ্টু দত্ত মশায়ের সঙ্গে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ঝগড়া। ওঁকে গেটে হয়তো আটকেই দেবে।

— দ্বারী দাঁড়িয়ে থাকে দ্বারে, আর উনি যান আড়ে আড়ে। আসলে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে ওঁর গভীর প্রেম। পরকীয়া তো। তাই একটু লুকিয়ে চুরিয়ে নাহলে কি জমে?

— তিনি থাকলে না হয় বড়ো জানোয়ার সামলাতেন। কিন্তু চিতি সাপ? কাঁকড়াবিছে?

অপা ব্যাগ থেকে টর্চটা বের করে বিজলি বাতি থাকা সত্ত্বেও জ্বেলে বলল, এই রানু, রাতের বেলা সাপের কথা বলতে নেই। বলেই, এদিক-ওদিক এর ওর পায়ের দিকে টর্চটা ফোকাস করে দেখল।

ওরা হাসল। বলল, কী যে করে না অপাটা।

নাঃ বাবাঃ। আমার ভীষণ ভয় করে।

ঠিক এমন সময় তিনটে জিপ এবং দুটো গাড়ি এসে পৌঁছোল। কেউ আর বাকি নেই। আই.টি.সি কোম্পানির এ রায়, কান্তিবাবু। এস লাল-এর ঠাকুরাল আর শর্মা সাহেব। ব্রিগস-এর ভট্টাচায্যি সাহেব। এইচ এস এল-এর কে জি ঘোষ। মিলনী লাইব্রেরির কবিরাজ। আর মিত্রদের প্রণববাবু, বিপ্লববাবু, হাজরাবাবু। সিসকোর দাড়িওয়ালা মাইতি। সকলেই বউ নিয়ে। যাদের বউ নেই তারাও কোথা থেকে জোগাড় করে আনলে এই বউ-এর হাটে মিলে যেত, চাঁদনি রাতে চেনা যেত না।

মেয়েরা অ্যাম্বাসাডরে উঠলেন। স্ত্রী পুরুষ নিয়ে প্রায় জনাপঞ্চাশেক লোক। বড়বিল বড়ো জামদার বঙ্গসন্তানদের নেতৃত্বে এত বড়ো দুঃসাহসী, মিশ্র এবং নৈশ অভিযান ইদানীং বোধহয় হয়নি।

অপা পেছনের অ্যামবাসাডরে সামনের সিটে বাঁদিকে জানালার পাশে বসেছিল। চুপ করে ভাবছিল। হু-হু করে গাড়ি যাচ্ছে। অলক উড়ছে। ক্বচিৎ মহুয়ার গন্ধ ভেসে আসছে চৈতি হাওয়ায়। আগে জামদা ও বড়বিলের মধ্যেও বেশ ভালো জঙ্গল ছিল। সভ্যতা (?) ক্রমশ এবং দ্রুত গ্রাস করে ফেলছে জঙ্গলকে, সবুজকে; যা কিছু প্রাণবন্ত সব

কিছুকে। হঠাৎ কি মনে হওয়ায় হ্যান্ডব্যাগ থেকে টর্চটা বার করে গাড়ির মধ্যেই পায়ের কাছে আলো ফেলে দেখল অপা।

ঊর্ণা ডানপাশে বসেছিল। হেসে বলল, বাতিকগ্রস্ত হলে দেখছি তুমি। তোমার এমন সুন্দর পায়ে কামড় দেবে এমন সৌন্দর্যজ্ঞানহীন সাপ এদেশে নেই।

রানু বলল, যাইই বলিস। চিতি সাপকে ভয় করেই। জোডার ধনঞ্জয়বাবুকে কামড়েছিল না গত বছর।

অপা ভাবছিল, চন্দ্রালোকিত জঙ্গল আর প্রান্তরের দিকে চেয়ে যে, যে মানুষটিকে নিয়ে এতক্ষণ এত আলোচনা হল সে মানুষটিকে সে দেখেইনি আজ পর্যন্ত। তার স্বামী প্রাণেশের কাজ অ্যাকাউন্টস নিয়ে। টেকনিক্যাল ফিল্ডের লোকদের সঙ্গে তার যোগাযোগ কম। ও শুনেছে ভদ্রলোক অবিবাহিত। তাই তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ হওয়ার সুযোগ হয়নি। ভালো বা মন্দ যাইই শোনা যাক না কেন কোনো মানুষ সম্বন্ধে তা যদি বাড়াবাড়ি রকমের হয়ে তা হলে তার সম্বন্ধে মনে একটা তীব্র কৌতূহল জন্মায়ই। একটা বিষয়ে শুধু ও সুনিশ্চিত। ওর স্বামী তার সঙ্গে এক খাটে শুয়ে থেকেও যেমন অনুপস্থিত, ওই অদেখা লোকটা শুধু তার কাছেই নয়, এই সমস্ত অঞ্চলেই প্রচণ্ডভাবে উপস্থিত। চরিত্রে পজিটিভ হলে পুরুষমানুষদের সত্যিই পুরুষ পুরুষ লাগে। লোকে যে কারণে অদেখা সাধুসন্ত এবং চিত্র-পরিচালকদের মতোই অদেখা মার্ডারার বা রেপিস্টকেও দেখতে ভিড় করে, ঠিক সে কারণেই লোকটাকে দেখতে চায় অপা। মানুষটা কেমন হবে তা নিয়ে কল্পনার জাল বোনা শুরু করেছে ও মনে মনে। কলেজ জীবনের পর ঠিক এমন একটা বোধ ওর জীবনে আর আসেনি। মনের মধ্যে একটা তীব্র চাপা উত্তেজনা বোধ করছে ও।

একটা জিপ পেছিয়ে পড়ল। ড্রাইভার বলল, দত্তবাবুর দোকান থেকে সাহেবরা শরাব আর ছোটুয়ার দোকান থেকে পান সিগারেট কিনছেন।

আরও শরাব?

মিসেস ব্যানার্জি বিরক্ত গলায় বললেন।

রুনা বলল, জরদার একটা একশো-বিশের টিন আনিয়েছিলাম রাউরকেলা থেকে, জামাইবাবু আসবেন বলে। সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। আমিও খাব আর বোস সাহেবকেও দেব। ভদ্রলোক পান খান।

জিভে চিকচিক শব্দ করে মনীষা বলল, কোনো ভদ্রলোক পান খান নাকি এ যুগে? আবার জরদা?

ঊর্ণা বলল, শুধু জরদা? কী খান না তাইই বলো? তা প্রেমে-টেমে পড়ল না তো রুনা। দেখিস আবার। চারশো বিশ লোকের জন্য একশো-বিশ জরদা।

আবার হাসির রোল উঠল।

সুস্মিতা প্রতিবাদ করে উঠল অতর্কিতে। ও অপাদের গাড়ির পেছনে ডানদিকে বসেছিল। বলল, বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে। প্রথমত, কারও পেছনে কন্টিনিউয়াসলি এরকম নিন্দা করা অন্যায়। তা ছাড়া, আমি ভদ্রলোককে দেখিনি। কিন্তু না দেখেও বলতে পারি, মন্দই হোন কী ভালোই হোন কী ডাজনট ডিজার্ভ সো মাচ অফ অ্যাটেনশান। তোমাদের আলোচনার কি আর কিছুই নেই রুনাদি?

অপা বলল, সুস্মিতা ঠিকই বলেছে।

ঊর্ণা বলল, ও! তোমার বুঝি বোস সাহেবকে ভালো লাগে? কী অপা? এতক্ষণ সে কথা বললে আমরা ...

— আমি ...?

— ওঃ। তুমি তো দেখোইনি ...। রুনা বলল।

— পুরো নামটা পর্যন্ত জানি না।

— এন বোস।

— এনটা কী?

রুনা বলল, জানি না। 'নালিফায়িং' বোস হলে মানাত।

অপা বলল, তোর স্বামীর ইনিশিয়াল তো 'ভি'— তা হলে তাঁকে 'ভিলিফায়িং' বাগচি বলে ডাকবি?

— বয়স কত?

— বেশি না। তোর আমার বরেদেরই মতো।

— তা হলে তো ইয়াংই।

— 'আ ম্যান ইজ অ্যাজ ইয়াং অ্যাজ হি ফিলস অ্যান্ড ... আ উম্যান ইজ অ্যাজ ইয়াং অ্যাজ শি লুকস।'

পেছনের সিট থেকে কে যেন বলে উঠল।

॥ ২ ॥

কিবিবুরুর রাস্তায় যেখানে পথগুলো সব ভাগ হয়ে কুমডি, থলকোবাদ, সালাই মনোহরপুর এবং কিরিবুরুর দিকে চলে গেছে সেইখানের ফরেস্ট গেটে গাড়ি দাঁড়াল। কী যেন জায়গাটার নাম? বরাইবুরু? মনে থাকে না অপার। সকলে একসঙ্গে হলে তারপর রওনা হবে। বার বার গেট খুলবে না গার্ড। অ্যাডভান্স পার্টি পাস দিয়ে অন্যান্য গাড়ির নাম্বার-টাম্বার লিখিয়ে দিয়ে গেছে আগেই।

সবাই এসে গেলে গেট খুলিয়ে সব গাড়ি একসঙ্গে থলকোবাদের রাস্তায় চলল — কুমডির দিকে। লাল, ভারী আকরিক ধুলোয় গা-মাথা-গাড়ি সব লাল হয়ে উঠল। গাড়ির কাচ তুলে দিল ওরা। যারা জিপে আছে তাদের প্রত্যেকেরই কালকে আধখানা করে সাবান আর আধ বোতল করে শ্যাম্পু লাগবে ওরিজিনাল চেহারাতে ফিরে আসতে।

ঘন জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে পাহাড় আর নদীর মাঝের আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে দশ কিলোমিটার মতো যাওয়া হয়েছে। সামনে হেডলাইটের আলোতে দেখা যাচ্ছে একটা অব্যবহৃত শুকনো শাল পাতায় ছাওয়া রাস্তা বাঁয়ে উঠে গেছে খাড়া পাহাড়ে। আর কী একটা নদী বয়ে চলেছে সামনে পথের পাশে পাশে। ড্রাইভার রাস্তাটা দেখিয়ে বলল, শিকার রোড। আর নদীর নাম বলল, কোইনা।

হঠাৎ কী হল, গাড়ি ও জিপগুলো একের পর এক ব্রেক কষে প্রায় এ ওর বাম্পারে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সামনের গাড়ি থেকে কে যেন বলে উঠল, হাতি! ওরে বাবা হাতি!

সঙ্গে সঙ্গে রুনা পিছন ফিরে জিপের দিকে তাকিয়ে কেঁদে উঠল, ও কোন গাড়িতে?

ঊর্ণা বলল, আমার হাজব্যান্ড কোথায় গেল? হাতি! হাতি! বলে চিৎকার করে উঠল ঊর্ণা।

রুনা বলল, লোকটা সত্যিই শয়তান! আমাদের মারবার ফন্দি করে এখানে নিয়ে এসেছে। কী দরকার ছিল? বাড়িতে বেশ ছোটো পোনা আর এঁচড়ের তরকারি রেধেঁ রেখে এলাম! এখানে খিচুড়ির লোভে!

ইতিমধ্যে ছেলেরা জিপ থেকে নামছে দেখা গেল এবং লাল ধুলোর মেঘ পরিষ্কার হলে এ কথা প্রাঞ্জল হল যে, হাতি উট কিছুই নয়, বোস সাহেব রাস্তার মধ্যে দু হাত তুলে দাঁড়িয়ে সব গাড়িকে রুখে দিয়েছেন। তাতেই সকলে ভেবেছিলেন যে, সামনে বিপদ।

মেয়েরা সাহস করে গাড়ি থেকে নামছিলেন না। অতজন স্ত্রী-পুরুষের চ্যাঁচামেচিতে এবং অতগুলো গাড়ি ও জিপের ইঞ্জিনের আওয়াজে জায়গাটাকে একটা বাজারের মতো মনে হচ্ছিল। মেয়েরাও এবারে নামলেন। অপা একবার টর্চ জ্বেলে দেখে নিল চিতি সাপটাপ আছে কি নেই। সকলে জমায়েত হলে জানা গেল যে, বোস সাহেব সকলকে পায়ে হেঁটে বাকি পথটি যেতে অনুরোধ করছেন। চাঁদের আলো উপভোগ করার জন্যে। গাড়ি জিপ সব পরে আসবে পিছন পিছন।

অপা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দরজা দড়াম করে বন্ধ করে উঠে পড়ে বলল, উন্মাদ।

সকলেরই তীব্র আপত্তি। গরমের রাত। চিতি সাপ, কিং-কোবরা, শঙ্খচূড়, কাঁকড়াবিছে, হাতি, বাইসন, মাথা-চিবিয়ে-খাওয়া বড়ো বাঘ, হাড়-চিবোনো ছোটো বাঘ, নাক-খামচে- নেওয়া ভাল্লুক, পেছনে টুঁ মারা শুয়োর, পেটে শিং-ফুটোনো শম্বর, থাকতে পারে না এমন জানোয়ার নেই যেখানে, সেখানে হেঁটে যাবে কোন খ্যাপা।

বোঝা গেল যে অ্যাডভান্স পার্টি অনেক আগেই পৌঁছেছেন। শুভেনবাবু ও নিয়োগীসাহেব খিচুড়ির বন্দোবস্ত এগিয়ে নিয়েছেন। মিস্টার বোস হেঁটে হেঁটে চলে এসেছেন এতদূর। ওঁদের রিসিভ করতে সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি আর পায়ে হাওয়াই চপ্পল পরে।

যখন কেউই রাজি হল না ওঁর এই পাগলামির প্রস্তাবে তখন সকলে মিলে ওঁকে পাঁজাকোলা করে জিপে তোলার প্রস্তাব করা হল। উনি একেবারেই গররাজি। বললেন, আমি একাই যখন এসেছি, একাই ফিরে যাব। বেশিক্ষণ লাগবে না। খিচুড়ি হতে হতেই পৌঁছে যাব। তোমরা গিয়ে গানটান গাও। খিদে হবে।

যখন সকলেই জিপে ও গাড়িতে উঠে পড়লেন, তখন বোস সাহেব রাস্তার এক পাশে সরে গিয়ে সকলকে টা-টা করলেন হাত তুলে ব্যাসাল্ট পাথরের একটা বড়ো চাঙড়ের ওপরে বসে।

অপা গাড়িতে বসেই শিউরে উঠল। কী জানি কত চিতিসাপ কিলবিল করছে ওই পাথরটার উপর। লোকটা কি মানুষ না পিশাচ। কিন্তু লোকটা একেবারে লোকটারই মতো। অন্য কারও মতোই নয়।

সবগুলো জিপ ও গাড়ি পরপর বোস সাহেবের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। তার সাদা পায়জামা আর পাঞ্জাবি লৌহ-আকরের লাল ধুলোতে একেবারে লাল করে দিয়ে। সবশেষ গাড়িটা অপাদের। বোস সাহেব ওদের দেখেও হাত নাড়লেন। এমন সময় রুনা বলল, ড্রাইভার, গাড়ি রোকো। সকলে চমকে উঠলেন। রুনা দরজা খুলে নেমে গিয়ে বলল, এই যে মশাই, আপনার জন্যে পান আর একশো-বিশ জরদা এনেছি। খেতে খেতে আসুন কথা যখন শুনলেনই না কারও।

বোস সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, থ্যাংক ইউ।

অপা লক্ষ করল, ভদ্রতাটদ্রতা জানে। মেয়েদের সঙ্গে মিশেছে বোধহয়।

রুনা হঠাৎ দেখল অপা ওর একেবারে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। রুনা কেমন অপ্রতিভ হয়ে বলল, চলি বোস সাহেব। তাড়াতাড়ি আসবেন। বলে ঘুরে বলল, চলো, অপা?

অপা বলল, তোমরা যাও। আমি ওঁর সঙ্গে হেঁটেই যাচ্ছি।

— সে কী?

গাড়ি থেকে সমস্বরে অন্য মহিলারা বলে উঠলেন, সে কী? মাথা খারাপ হল তোমার?

ঊর্ণা বলল, প্রাণেশবাবুকে না বলে ...। তুমি কি তাঁকে বলেছ?

অপা বলল, দৃঢ় গলায়, আমি তো স্কুলের ছাত্রী নই। নাবালিকাও নই। আমি ওঁর সঙ্গে আসছি। তোমরা সব এগোও।

কয়েক মুহূর্ত গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। তারপরেই গিয়ারে দিল ড্রাইভার গাড়িকে। গাড়িটা এগোতেই আবার ধুলো উঠল। প্রথম কিছুক্ষণ চোখ গভীর অন্ধকার দেখল অপা। ও শহরের মেয়ে। কখনও বড়বিল — বড়জামদার মতো জায়গাই দেখেনি আগে — এরকম জায়গা তো নয়ই। অনেকক্ষণ পরে ওর হুঁশ হল।

বোস সাহেব বললেন আসুন। এইখানে। এই পাথরটাতে বসুন। চোখ দুটো জোরে

বন্ধ করে রাখুন মিনিটখানেক, তারপর খুললেই চাঁদের আলোয় সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাবেন। এই নিন, পান খান একটা। জরদা খাবেন?

অপা কোনো কথা না বলে হাত বাড়িয়ে পানটা নিল। হাতে হাতে লাগতে ওর শরীরে হঠাৎ কেমন যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ওর সাত বছরের বিবাহিত জীবনে ঠিক কখনও হয়নি এমন আগে। বিয়ে বাড়ি ছাড়া কখনও পান খায় না ও। জরদার তো কথাই ওঠে না। চোখ বন্ধ করে পান চিবোতে লাগল বত্রিশ বছরের খুকি অপা। পুরো এক মিনিট পরে যখন চোখ খুলল, তখন তার নিজের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারল না।

একবার অনেকদিন আগে বসন্তোৎসবে শান্তিনিকেতন গিয়েছিল। সেখানেও শালবন, আম্রকুঞ্জ পূর্ণিমাতে দেখেছিল। কিন্তু এমন রাত! দূরে পাহাড়ে আগুন লেগেছে। গরম হাওয়া ঝরঝর করে শুকনো শালপাতা উড়িয়ে গড়িয়ে নানান পাথরে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না।

বোস সাহেব বললেন, উঠুন। এবার এগোনে যাক। জঙ্গলের রাত। দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। একার দায়িত্ব নেওয়া ভারী সহজ। তাতে কোনো বাহাদুরি নেই।

অপা বলল, আমার নাম অপা। আমি প্রাণেশবাবুর স্ত্রী। এখানে আছি দু বছর।

— ওঃ। তাই বুঝি।

অপা আবার বলল, আসলে কেউই আপনাকে কোম্পানি দেওয়ার জন্যে রইলেন না তাই আমার খারাপ লাগল। গাড়িতে যখন আর কেউই থাকে না, তখন যিনি ড্রাইভ করেন তাঁর পাশে এসে অপরিচিতাও বসেন, ব্যাকসিটে বসে না থেকে। এটাই ভদ্রতা। আপনাকে এভাবে একা ছেড়ে দেওয়াটা নিছকই অভদ্রতা হত।

বলেই ভাবল, কথা কটি বলার দরকার ছিল কি আদৌ?

বোস সাহেব হাসলেন। বললেন, ব্যাপারটা কি জানেন? বিয়ারটিয়ার সব ঠান্ডা করা আছে। ফ্লাস্কে করে বরফও নেওয়া হয়েছে। সকলেই জানেন যে, দেরি হলেই ফাঁকিতে পড়বেন। এত এত সুন্দরী বউদের নিয়ে এমন জঙ্গলে পায়ে হেঁটে আমি যেতে বললেই বা ওঁরা যাবেন কেন? শুধু আপনার ব্যাপারটাই কোনো হিসেবে মিলল না। একেবারেই মিলল না। বড়ো অবাক লাগছে আমার। সত্যিই অভাবনীয়।

ব্যাগ থেকে বার করে অপা একবার টর্চটা জ্বালল। অভ্যেসবশে।

— আলো জ্বালবেন না। সাপ যদি কামড়ায়, তা হলে কামড়াবেই। কথায় বলে না, সাপের লেখা আর বাঘের দেখা। সাপেরটা লেখাই। ভয় জঙ্গলে নেই। ভয়টা, আমাদের মনে।

একটা মোড় নিল ওরা। কী সুন্দর যে লাগছে! জীবনে এত ভালো কখনও লাগেনি। অপা বিভূতিবাবুর আরণ্যকে পড়েছিল, 'চাঁদের আলোর বুটিকাটা গালচে'। কাকে বলে, আজ তা নিজের চোখে দেখল। বিভূতিভূষণের লেখাতে তো এইসব জায়গার কথা কতই পড়েছে। এখনই এমন জঙ্গল, তা ওঁর সময়ে অত বছর আগে না জানি কেমন ছিল।

ভাবছিল, অপা। ওর অ্যাকাউন্ট্যান্ট স্বামী, হিসেব ছাড়া কিছুই বোঝে না। রসকষ, সাহস বলতে কিছুই নেই মানুষটির। পোষা বিড়ালের মতো ভালো। আটারলি আনইন্টারেস্টিং।

আপনার পুরো নামটা কী? এন বোস মানে?

অপা হঠাৎই প্রশ্ন করল।

— আমার নাম নিরূপ। কিন্তু থাক এ সব প্রসঙ্গ। এমন রাতে কথাই বলতে নেই। বাদবাকি পথ আমরা আর একটাও কথা বলব না। আপনিও ভাববেন। আমিও ভাবব। আর দেখব। শুনব। নাক ভরে গন্ধ নেব আমার বউয়ের গায়ের। আজ সন্ধেতে কোন সাবান দিয়ে গা-ধুয়ে উঠল সে কোন ভালোলাগার জলপ্রপাতে, কে জানে? প্রতি প্রহরেই তার নতুন শাড়ি, প্রতি প্রহরে নতুন আতর, নতুন মুখ, প্রতি ঋতুতে নতুন করে ঋতুমতী এমন বউ আর কার আছে বলুন?

অপা কথা না বলে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে থাকল।

পথটা এবার চড়াই উঠেছে। বড়ো বড়ো শালগাছের বন। আরও কত গাছ। কিছুরই যে নাম জানে না অপা। পাশ দিয়ে নদীটা কত কী বলতে বলতে ছুটে চলেছে — কলকল খলখল করে। কী একটা পাখি ডাকছে থেকে থেকে। কী পাখি? কে জানে? এর ডাক শোনেনি তো কখনও। বাঁদিকের উপত্যকা পেরিয়ে উঁচু উঠে গেছে পাহাড়। সাতশো পাহাড়ের দেশে। এই সারান্ডার জঙ্গল। কতরকম পাথর আছে এই সব পাহাড়ে। কতরকম ধাতু। কত ফুল, কত লতা, কত পাখি, পোকা, সাপ, কতরকম জানোয়ার এই সব বনে বনে। যে মেয়ে চিতিসাপের ভয়ে বিজলির আলো-জ্বলা ঘর থেকে উঠোনে যেতেও টর্চ জ্বালে সেইই চাঁদের আলোয় এই পাহাড়ে জঙ্গলে শাড়ি লুটিয়ে চটি পায়ে আপনমনে চলেছে নির্ভয়ে।

মানুষটার উপর নির্ভর করা যায়, নিশ্চিন্তে।

হাওয়ার কী শব্দ! এক একটা শুকনো শালের পাতা জঙ্গলের নীচে খসে পড়ছে উড়ে উড়ে, নেচে নেচে, ঘুরে ঘুরে, তাতেই কি এত শব্দ হচ্ছে। একটা শুকনো পাতা পড়ার এত শব্দ। পৃথিবীতে এতও স্তব্ধতা আছে? অবাক হয়ে যায় অপা। আকাশ, চাঁদ, জঙ্গল, দিগন্ত সবকিছুর সঙ্গে এক নিবিড় একাত্মতা বোধ করতে লাগল ও। ওর মনে হচ্ছিল যে, ও এক শ্যাওলা-পড়া কূপমন্ডূক সংস্কারবদ্ধতা থেকে হঠাৎই জিন-পরি হয়ে উঠে এসে এই খারাপ নিরূপ মানুষটার হাত ধরে আজ চাঁদের আলোর মন্ত্রে দীক্ষিত হল। প্রকৃতিকে শুরু করল। মুক্তি পেল সব বন্ধন থেকে। তেমন কোনওই কথা হয়নি মানুষটার সঙ্গে। কিন্তু অপা ওর জীবনে এই প্রথমবার জানল যে, চিৎকার অথবা লক্ষ লক্ষ বাক্যর সঙ্গে বক্তব্যর কোনো সম্পর্ক নেই। তার স্বামী প্রাণেশ বিয়ের পর থেকেই সাত বছর হল আজ প্রতি রাতে তার নগ্ন শরীরে হাত রেখে অনর্গল কথা বলে গেছে। আসলে সেগুলো অর্থহীন শব্দমাত্র। এই মানুষটার কিছু বলবার আছে। জীবন সম্বন্ধে, নিজের

সম্বন্ধে। অথচ কিছু না বলেই সব কথা বলতে জানে। এই সব ভাবতে ভাবতে, চৈত্র শেষের সুগন্ধি চাঁদনি রাতের কথা শুনতে শুনতে মোহাবিষ্টের মতো হাঁটছিল অপা।

কিছুক্ষণ পরই সামনের দিক থেকে একটা জিপের গোঙানি আসতে লাগল। নিশ্চয়ই যূথভ্রষ্টা তাকে কেউ নিতে আসছে। কিন্তু কেন? অপাও তো একজন আলাদা মানুষ।

আওয়াজটা জোর হচ্ছে। জিপটা এগিয়ে আসছে। কাকে পাঠাতে পারে তার স্বামী!

সময় যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে। আনন্দের সময়, মুক্তির সময়; জিপটা দ্রুত আসছে। অপা বলল, এমন করে যে জঙ্গলে নিরস্ত্রভাবে ঘুরে বেড়ান, কখনও বিপদ হলে?

—আমি ভাগ্যলিপিতে বিশ্বাস করি। আপনি করেন না?

বোস সাহেব বললেন অপার দিকে মুখ ফিরিয়ে।

অপা একটু ভাবল। বলল, জানি না। কখনও ভাবিনি এ নিয়ে।

বিপদ হলে, হবে। নিরাপদেই তো কাটল অনেকদিনই। পৃথিবীতে এমন বিপদ নেই, যন্ত্রণা নেই, দুঃখ নেই, এমন কোনও ভয়াবহ মৃত্যু নেই, যা আমার আগে অন্য কোনো না কোনো মানুষের জীবনে আসেনি। তারা যখন তার সম্মুখীন হয়েছে, আমিই বা পারব না কেন? সবই প্রি-কন্ডিশান্ড। যা হবার, যখন হবার, তা হবেই।

জিপটা এসে গেল।

প্রাণেশ একাই এসেছে অন্য লোকের জিপ নিয়ে। তার নিজের ড্রাইভারকে আনেনি। অন্য কাউকেও আনেনি। যদি সিন-ক্রিয়েটেড হয়। যদি স্ক্যান্ডাল হয়। ভদ্রলোকেরা স্ক্যান্ডালকে বড়োই ভয় পান।

জিপ থেকে প্রাণেশ নামল। মুখ দিয়ে ভুরভুর করে হুইস্কির গন্ধ বেরুচ্ছে।

এখানে রাস্তাটা খুব সরু। একপাশে খাদ, ড্রাইভার এগিয়ে গেল জিপটা নিয়ে, ঘোরাবার জন্য।

অপার চোখের উপর টর্চ ফেলে, যাতে চাঁদের আলো ওর চোখের সেসব ভাষা লুকিয়ে না-রাখতে পারে সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যেই। কেটে কেটে বলল, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

—না তো।

অপা বলল, স্থির গলায়। আলো সরাও চোখ থেকে।

—তোমার কিছু বলার নেই আমাকে? আলোটা সরিয়ে নিয়ে প্রাণেশ বলল।

—আমার? নাঃ। কিছু বলার নেই। কী থাকবে বলার?

—কুমডি বাংলোর কম্পাউন্ডে একরা হাতি এসেছে। সকলে বলছে, কিরিবুরুর হাতিটা। তাড়াতাড়ি জিপে উঠে এসো।

—তুমি ওকে যেতে বলছ না? বিপদ কি আমার একার হবে, হলে? হাতি তো দুজনকেই মারতে পারে।

প্রাণেশ ঘৃণামিশ্রিত উষ্মার সঙ্গে বলল, অত সহজে মরবার লোক উনি নন। তা ছাড়া,

শিশু তো আর নন? ওঁকে আমি কী বলব? তুমি আমার বিয়ে করা বউ, দাবি, দায়িত্ব, সবই আমার, তাইই দৌড়ে আসতে হল। ওঁর মরা বাঁচা, ওঁরই ব্যাপার।

—নিজেকে ছোটো কোরো না এমনভাবে।

চাপা গলায় অপা বলল প্রাণেশকে। তারপর গলা আরও নামিযে বলল, লজ্জা করে আমার। তোমার ব্যবহারে লজ্জা করে।

—লজ্জা? প্রাণেশ গলা চড়িয়ে বলল, তোমারও লজ্জা আছে নাকি? তা ছাড়া, আমি কখনোই বড়ো ছোটো হই না। আমি সানফোরাইজড। চলো অপা, আমার সময় নেই নষ্ট করবার।

—আমি যাব না।

হঠাৎ শক্ত গলায় বলল, অপা।

কথাটা বন্দুকের নল থেকে বুলেটের মতো ওর মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

—যাবে না? যাবে না মানে?

—মানে, তোমার সঙ্গে জিপে যাব না। নিরূপবাবুর সঙ্গে হেঁটে যাব।

—নিরূপ সুরূপ কারও সঙ্গেই তুমি হেঁটে যাবে না। উঠে এসো। রীতিমতো উত্তেজিত গলায় বলল, প্রাণেশ।

—না।

—যাবে না কেন?

—আমাদের অনেক কথা আছে।

—কথা? কী এমন কথা যা স্বামীর সামনেও বলা যায় না?

—স্বামী কোনো ফ্যাক্টরই নয়। এমন অনেক কথাই সব মেয়ের জীবনে থাকে, যা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের বাইরে।

—স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের বাইরে বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে আবার কিছু থাকে নাকি? তাজ্জব কী বাত।

—হ্যাঁ। একেবারেই বাইরের। তোমার বোঝাবুঝিরও বাইরের। অবশ্যই থাকে। ড্রাইভার জিপটা নিয়ে এসে পাশে দাঁড় করাল।

প্রাণেশ বলল, আমি নিতে আসার পরও আমার সঙ্গে না যাওয়ার মানে তুমি বোঝো?

—তুমি কি দ্বিরাগমনে এলে?

ঠাট্টার গলায় বলল অপা।

প্রাণেশ দাঁত কড়মড় করে মনে মনে বলল, এই জন্যেই মজিলপুরের জ্যাঠাইমা কনভেন্টে-পড়া ফিরিঙ্গি-মার্কা মেয়ে বিয়ে করতে বারণ করেছিলেন। গুরুজনের বাক্যি। বৃথা যায় না।

—যাবে কি যাবে না তুমি?

—বলেছি তো। যাব না।

বোস সাহেব স্থাণুর মতো চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন এতক্ষণ। বললেন, উঠুন অপা। উঠে পড়ুন। আপনি বড়ো বোকা। ছিঃ। যে মানুষ ভালোবাসা বুঝতে না পারে, সে সত্যিই বড়ো বোকা।

অপা কী ভেবে উঠে এল, জিপে বসল।

বলল, আপনিও আসুন। হাতিটা যদি সত্যিই এদিকে চলে আসে?

—আসবে না, আসবে না। এক জানোয়ার অন্য জানোয়ারদের এড়িয়ে চলে। প্রাণেশ বলল, আমার হাসি পেল না। একটুও হাসি পেল না আপনার রসিকতায়।

বোস সাহেব বললেন, কথা থাক। এখন আপনারা এগোন।

বোস সাহেবের বাঁ হাতটা কবজির কাছে জোরে চেপে ধরে অপা বলল, ধমকের স্বরে, আসুন, উঠে আসুন বলছি! ভালো হবে না কিন্তু না-এলে।

অবাক হলেন মানুষটা খুব। তাঁকে আজ অবধি এমন ভালোবাসা-মিশ্রিত আদেশের স্বরে কোনো নারী এমন করে কখনও ডাকেনি। তাও এত স্বল্প পরিচিত কেউ। রূপহীন রুখু মানুষটা অবাক চোখে চেয়ে রইলেন অপার দিকে।

প্রাণেশ বলল, চলো ড্রাইভার দের হো রহা হ্যায়।

চাঁদের আলোয় জিপের মধ্যে বসা অপার চোখ দুটিকে যতটুকু ভালো করে দেখা যায় ততটুকু একঝলক দেখে নিয়ে নিরূপ বললেন, আমিও আসছি। পথ তো সামান্যই বাকি আছে। আমি এখুনি আসছি।

জিপটা ধুলো উড়িয়ে গেল।

অপার ধরা হাতের টানে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছিলেন বোস সাহেব। টাল সামলে নিলেন। জিপের টেইল লাইটের লাল আলো দুটি মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে লাল ধুলোর মেঘে ঢেকে গেল জায়গাটা। লালচে অন্ধকার যেন মুহূর্তের মধ্যে চাঁদটাকে শুষে নিল। বোস সাহেবের শরীর, মস্তিষ্ক, সমস্তই কেমন ভারশূন্য, হালকা লাগতে লাগল। চলন্ত জিপের মধ্যে থেকে প্রাণেশের মুখনিঃসৃত দুটি শব্দ। 'আনসিভিলাইজড ব্রুট'। তাঁর কানের মধ্যে বাজছিল।

বাঁ হাতে তখনও অপার হাতের উষ্ণতা মাখা ছিল। এক মুহূর্ত। তারপরই অপার হাতের গন্ধ শালফুলের মঞ্জরীর গন্ধে, দূরাগত বায়ুবাহী মহুয়ার গন্ধে একীভূত হয়ে গেল। আবার তাঁর কানে তাঁর বউয়ের চুল ঝাড়ার আওয়াজ পাচ্ছেন বোস সাহেব। শালগাছের পাতায় পাতায় হাওয়াটা ঝরনা তুলছে। মুক্তি। আঃ। চারধারে কী দারুণ অনাবিল বাধাবন্ধনহীন মুক্তি। খুব বেঁচে গেছেন। জীবনে এই প্রথমবার কোনো রক্তমাংসের নারীকে মানসিক এবং শারীরিকভাবেও ভালোবাসার মতো ভুল করে ফেলছিলেন আর একটু হলে। মানুষ ভালোবাসার খুব কাছাকাছি চলে গেছিলেন। খুউবই।

রাত-চরা পাখির ক্বচিৎ ডাকে শিহরিত, চাঁদের আলোর বুটি-কাটা-গালচের উপর পা ফেলে ফেলে, অরণ্যমর্মরের মর্মস্থলে চোখ ও কানকে বাঁধা রেখে বোস সাহেব হাঁটতে লাগলেন চন্দ্রাহত, প্রেমাহত হয়ে। আর অশরীরী অপা চাঁদের আলো আর ছায়ার বুটি কাটা গালচেতে তাঁর আগে আগে নীরব পা ফেলে চলতে লাগল। জীবনে এই প্রথমবার মনে হল যে, জঙ্গলে তিনি বোধহয় পথ হারালেন। জিন পরিরা বোধহয় তাঁকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে আজ কোথাও।

॥ ৩ ॥

ওঁদের মুনলাইট পিকনিক খুব জমে উঠেছে।

পৃথ্বীরাজের মতো অপাকে ছিনিয়ে এনে হিসেবরক্ষক প্রাণেশ তার জীবনের ট্রায়াল ব্যালান্স খুব টাইমলি মিলিয়ে দিয়েছে। কাস্টিং বা পোস্টিং-এর একটি সামান্যতম ভুলও যে ট্রায়াল ব্যালান্স মেলাতে কী যন্ত্রণা দেয় তা ভালো করেই জানে। রিলিভড হয়ে, নিজের প্রায় বেহাত হওয়া স্ত্রীকে মুঠোয় ফিরিয়ে আনার আনন্দে ও হুইস্কি খেয়ে চুর হয়ে উঠেছে।

ওঁরা সকলেই বললেন, ইমোশানালি আপসেট হয়ে গেলে সহজেই মানুষ ড্রাংক হয়। তাতে, দোষ নেই।

হিসেবি মানুষদের কখনও দোষ হয় না। দোষের ভাগী সবসময়ই বেহিসেবিরা। মার্কা-মারা মাতাল যে, সে তো হেঁটেই আসছে। সে মানুষটা এ তল্লাটে থাকতে, মাতাল হওয়ার কলঙ্ক অন্য কারও গায়েই লাগার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই।

সকলেই দারুণ এনজয় করছেন। বড়বিল-বড়জামদার কাছে যে এত সুন্দর একটি জায়গা আছে এবং মেয়েদের নিয়ে এসেও যে, মুনলাইট পিকনিকে এমন মজা করা যায় তা সকলেরই ধারণার বাইরে ছিল। মেয়েরা, 'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে' দিয়ে শুরু করে এবং 'ও চাঁদ চোখের জলে লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে' দিয়ে শেষ করে যাবতীয় চাঁদ সংক্রান্ত রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে ফেলেছেন।

এখন ছেলেরা কোরাসে 'মন যে আমার কেমন কেমন করে, ঘরেতে রয় না সখী, নাগর গেছে পরের ঘরে' গাইলেন দুলে দুলে। যে একরা হাতিটা আজ রাতে কিছুক্ষণ আগে ওই দিকে ভুল করে এসেছিল, যদি সে কাছাকাছি কোথাও থেকেও থাকত তো ছেলেদের এই কোরাসগান শুনে বড়োই ভয় পেত এবং নিঃসন্দেহে লেজ তুলে দৌড় লাগাত। বিষ্টু দত্তর ফোর-সেভেনটি ডাবল-ব্যারেল রাইফেলের গুলিকেও বোধহয় বেচারি এর চেয়ে অনেক কম ভয় পায়!

এদিকে খিচুড়িও হয়ে গেছিল।

মুগের ডালের খিচুড়ি। সঙ্গে পেঁয়াজি, বেগুনভাজা, পাঁপড়ভাজা। চন্দ্রভান দারুণ রেঁধেছে খিচুড়িটা। গাঙ্গুলি, যাদব এবং ধর্মন্দর তাকে হেল্প করেছিল। বাসমতী আর পানউকেও নিয়ে আসা হয়েছিল বড়বিল থেকে। ব্যানার্জি সাহেব ও ঘোষ সাহেবের বন্দোবস্তের কোনো ত্রুটি নেই। যেমন রাত, তেমনি কোম্পানি, আর তেমনই চাঁদ।

মারমার, কাটকাট। বিয়ার-হুইস্কির মুখে চন্দ্রভানের খিচুড়িতে পিকনিক একেবারে বরফির মতো জমে উঠেছে।

মেয়েদের দলের মধ্যে বসে থেকেও যেন অনুপস্থিত ছিল অপা।

কী একটা পাখি ডাকছে থেকে থেকে, জঙ্গলের গভীরে উড়ে উড়ে। পাখিটা এসে বসল একটা বড়ো গাছে।

সুস্মিতা জিজ্ঞেস করল, ঘোষদা, এটা কী পাখি?

—ব্রেইনফিভার।

আশ্চর্য হয়ে নামটা শুনল অপা।

চাঁদের আলোয় আলোকিত ঝাপসা-গাছে পাখিটাকে দেখবার চেষ্টা করল মুখ ঘুরিয়ে। দেখতে পেল না। বুঝতে পারল না ও চাঁদের আলোই ঝাপসা, না ওর চোখ।

খেতে বসার পর সবচেয়ে প্রথমে ঘোষ সাহেবেরই খেয়াল হল, বোস সাহেবের কথা।

আরে। মানুষটা গেল কোথায়? প্রাণেশরা তো ফিরে এসেছে প্রায় দেড়-ঘন্টার উপর। দেখেছ। একজনেরও মনে হয়নি। তোমরা কী হে। সত্যি।

ব্যানার্জি সাহেব আর ঘোষ সাহেব দুজনেই উদ্‌যোগী হয়ে আই.টি.সি অভিজিৎ রায়ের জিপে জামদার কবিরাজ, দাশ আর বড়বিলের মাইতি এবং হাজরা, এই চার ইয়াংম্যানকে পাঠালেন বোস সাহেবকে পাকড়াও করে আনতে।

আচ্ছা লোক যা হোক। সেন সাহেব বললেন। নিজে হুজুগ তুলে নিজেই হাপিস।

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই ওরা সকলে হুড়মুড় করে জিপ নিয়ে ফিরে এল।

কী হল? হাতি? সকলে সমস্বরে শুধোলেন।

দাশ লাফিয়ে পড়ে বলল, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

—কী? কী? নিয়েগীসাহেব খিচুড়ি মুখে উত্তেজিত হয়ে বললেন।

—বোস সাহেবকে সাপে কামড়েছে। চিতি সাপ।

—চিতি সাপ? কী করে জানলে?

—পায়ের কাছেই উলটে পড়ে ছিল সাপটা। আমাদের দেখেই পালিয়ে গেল।

—কোথায়? কতদুরে?

নারী ও পুরুষের মিলিত কণ্ঠের ভয়ার্ত শিহরন উঠল।

নিয়োগী সাহেব আবার বললেন, লোকটা একেবারে কমপ্লিট ক্যায়োস করে দিলে। কেলেঙ্কারি কাণ্ড। হেড অফিসে এখন একসপ্লানেশান দিতে জীবন যাবে আমার।

দাশ বলল, বাংলোতে উনি প্রায় এসেই পড়েছিলেন। এই তো, একেবারে কাছেই। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, এই ঢালটা পেরোলেই দেখা যাবে। নালার পাশে পথের উপরেই পড়ে আছেন।

—বাঁধন দাও। বাঁধন।

জোডার ধনঞ্জয়বাবু খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়ে বললেন। আমাকেও কামড়েছিল। আমি তো বেঁচে আছি রে বাবা। এখনও। আশা ছাড়লে চলবে কী করে? চলো চলো, কে যাবে?

—দড়ি। এই চৌকিদার! গাঙ্গুলি, যাদব, এই সুগান। দড়ি, দড়ি।

কে যেন চিৎকার করে উঠল।

ঘোষ সাহেব বললেন, আমি যাচ্ছি। ব্যানার্জি সাহেব, আপনিও আসুন। নোয়ামুন্ডির হাসপাতালে নিয়ে যাব। ওখানকার ডাক্তাররা তো চেনেন আপনাকে। আমাকেও চেনেন।

—তবু যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ সেন সাহেব বললেন। মেয়েদের মধ্যে কে যেন বললেন, বাড়াবাড়ির সীমা আছে। তার পরে সকলেই বললেন, চলে আসুন, চলে আসুন...।

—নিশ্বাস পড়ছে তো? কী দাশ?

হিরো হিরো চেহারার বড়ো বড়ো চুলওয়ালা বড়জামদার দাশ বলল, তা পড়ছে। কিন্তু একেবারে ভোরের বাতাসের মতো। বাঁচবে কি না বলা যায় না।

অপা দাঁড়িয়ে উঠল।

অপার মনে পড়ল যে, মানুষটা বলেছিল: পথ সামান্যই বাকি। বলেছিল, এখুনি আসবে। শুধু পথের কথাটাই বলেছিল! গন্তব্যর কথাটা অব্যক্ত রেখেছিল। পুরোপুরিই। এতই কম কথা হয়েছিল মানুষটার সঙ্গে। অথচ! অথচ! একবার বলেছিল, যে ভালোবাসা না বোঝে সে বড়ো বোকা। চারদিকের গোলমাল, চিৎকার, উত্তেজিত চ্যাঁচামেচির মধ্যে দাঁড়িয়ে অপা ভাবছিল, বেশ তো কাটছিল জীবন, ঘেরাটোপে জীবনের মানে-না-বুঝে। কেন যে দেখা হল মানুষটার সঙ্গে।

ঘোষ সাহেবের সঙ্গে অন্য যাঁরা যাবেন, দৌড়ে গিয়ে জিপে বসলেন। ঠিক এমন সময় অপা যূথবদ্ধা মহিলাদের মধ্যে থেমে দলছুট হয়ে উঠে দাঁড়াল। প্রাণেশ যেখানে শতরঞ্জিতে চিত হয়ে শুয়েছিল, সেখানে গিয়ে প্রাণেশকে উদ্দেশ করে বলল, আমি যাচ্ছি বুঝলে। তারপর স্থির পায়ে এসে ঘোষ সাহেবের পাশে সামনের সিটে বসল।

—একী? একী? তুমি কোথায় যাবে অপা? তুমি? পাগল হলে?একী বউদি। নামুন, নামুন। সময় নেই একেবারেই সময় নষ্ট করবার।

দাশ আর মাইতি একসঙ্গে বলে উঠল।

ব্যানার্জি সাহেব কী করবেন বুঝতে না পেরে চিৎকার করলেন, প্রাণেশ, ও প্রাণেশ কোথায় গেলে? তোমার বউকে সামলাও। মুনলাইট পিকনিক। কোথা থেকে এসে একেবারে জ্বালিয়ে দিয়ে গেল সবাইকে হে। হাড় জ্বালানে।

প্রাণেশ মাতাল হয়ে গেছিল। সাফল্যে, জয়ে, বহমান ভয়হীন জীবনে মানুষ বড়ো সহজে মাতাল হয়। হিসেবি যারা, তারা মাত্র এক রাউন্ড লড়াইয়ের কথাই জানে। প্রাণেশ

কখনও কল্পনা করেনি যে, জীবন একটা বক্সিং-রিং। যে কোনো রাউন্ডেই যে কেউই নক আউট হতে পারে ভাগ্যের হাতে।

অপা দৃঢ় গলায় বলল, আমি যাবই। আপনারা যাইই বলুন। এবার মেয়েরা সকলে দৌড়ে এলেন। এক সঙ্গে। অনেক কথা বললেন, সমস্বরে।

অপা অনুনয় করে বলল, প্লিজ, তোমরা আমাকে একটু বোঝো। শুধু আমাকেই না, তোমাদেরও...। আমাকে যেতে দাও।

ঘোষ সাহেব বললেন, অপা। আমাদের সময় নষ্ট হচ্ছে। অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে।

অপা স্থির শান্ত গলায় বলল, আমারও! চলুন ঘোষদা, আমরা যাই এবারে।

ধোঁকার ডালনা

ড্রাইভার শিউশরণ গাড়ি আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারাজে পার্ক করে এসে বলল, কাল কিতনা বাজে আয়েগা মেমসাব?

স্মিতা একটু ঝাঁঝালো গলাতে বলল, পুছনেকা ক্যা হ্যায়? রোজ সুব্বে যিতনা বাজে আতা হ্যায় ওহি টাইমমে আও।

জি হাঁ।

বিরক্তির সঙ্গে বলে, ফ্ল্যাটের দরজার ল্যাচটা খোলা রেখে দিয়ে কী ভেবে একটু হেসে সেটাকে লাগিয়েই দিল তারপর ইন্টারকমের রিসিভারটা তুলে একতলার রিসেপশনে ফোন করে জিজ্ঞেস করল, সেন সাহেব কি বাইরে গেছেন? নাইনথ্ ফ্লোর থেকে বলছি।

নীচ থেকে বলল, ম্যাডাম আমার ডিউটি তো বেলা চারটেতে শুরু হয়েছে। আমি আসার পরে যাননি। তবে যদি গ্যারাজের পেছনের দরজা দিয়ে সোজা গেট দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে থাকেন তা হলে পেছনের গেটের সিকিউরিটি গার্ড বলতে পারবে।

বলেই বলল, গাড়ি নিয়ে গিয়ে থাকলেও আমি আসার আগেই গেছেন। লাল মারুতি নিয়েই তো যাবেন গেলে। ও গাড়ি আমি যেতে দেখিনি। গ্যারাজ থেকে উঠে গাড়ি তো আমার সামনে দিয়েই যেত, গেলে। তবে চারটের আগে গিয়ে থাকলে জানি না।

পেছনের গেটের সিকিউরিটিকে একবার জিজ্ঞেস করুন। বড়ো বেশি কথা বলেন আপনি।

ঠিক আছে। জিজ্ঞেস করে আমি জানাচ্ছি।

সারাদিন এয়ারকন্ডিশন্ড ঘরে কাজ করার পর এয়ারকন্ডিশনড গাড়ি চড়ে বাড়ি ফিরেই গরমে গা একোরে প্যাচপ্যাচ করে। তবু বিমলেন্দুকে ফ্ল্যাটের সেন্ট্রাল এয়ার-

কন্ডিশনার চালাতে মানা করেছে ও। দুপুরটা বেডরুমের উইন্ডো-টাইপটা চালিয়ে বিমলেন্দু ঘুমোয় বা টিভি দেখে। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে দুজনে মিলে চা খাওয়ার পর দুজনেই এক সঙ্গে চানে যায়। বিমলেন্দু গেস্টরুমের বাথরুমে আর স্মিতা বেডরুমের বাথরুমে। বাথটাব-এ শুয়ে থাকে মিনিট পনেরো অনেকখানি বাথসল্ট ছড়িয়ে, সারাশরীর এলিয়ে দিয়ে। শরীরের অণু-পরমাণু থেকে ক্লান্তি অপনোদিত হলে তারপরই ভালো করে তোয়ালে দিয়ে গা-মাথা মুছে সর্বাঙ্গে ইউডিকলোন এবং পাউডার লাগিয়ে বারমুডাস আর কটন-এর ঢোলা টপ পরে বসার ঘরে আসে। না বলে তো কেউই আসে না কোনো ব্যস্ত মানুষের কাছে। আজ কারও আসার কথা নেই। অফিসের পরে কেউ এলে ক্লান্তও লাগে। শনি-রবির কথা আলাদা। বিমলেন্দুই তার হাউজকিপার হাজব্যান্ড, নিজের কিছুই প্রায় করতে হয় না, তবু উইকডেইজ-এ কারও আসার থাকলে টেনশন হয়।

রোজ খায় না, তবে সপ্তাহে দু-তিনদিন খায় একটা কি দুটো। ব্লাডিমেরি। খুব যত্ন করে বানিয়ে দেয় বিমলেন্দু। বিমলেন্দু হুইস্কি খায় সোডা দিয়ে। স্মিতা বলে স্কচ খেতে কিন্তু বিমলেন্দু খায় না। রয়াল চ্যালেঞ্জই খায়। বলে, পরের পয়সাতে অত ফুটুনি ভালো নয়।

আমি কি তোমার পর? স্মিতা বলে।

পরই তো। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে হলেই কি আপন হয়? তা ছাড়া যে স্বামী, স্ত্রীর আশ্রিত জীব, যে রোজগারের জন্যে কাজ করে না, যার আলাদা রোজগারও নেই, এ কাগজে সে কাগজে দুটো একটা ফিচার লিখে কখনও-সখনও সামান্য টাকা যে পায়, তার সমঝে চলাই উচিত।

স্মিতা উত্তরে বলে, তোমার নানারকম হ্যাং-আপস হয়ে গেছে ইদানীং। তুমি তো এরকম ছিলে না বিমু। তুমি কি ভুলে গেছে যে, একটা সময়ে তোমার টিউশনির টাকাটাই আমাদের একমাত্র রোজগার ছিল। তোমার সেই বহু-কষ্টার্জিত রোজগারে আমরা কত কষ্ট করে থেকেছি — আমার পড়াশোনা তোমার জন্যেই চালিয়ে যেতে পেরেছি। আমি ভুলিনি সে সব দিনের কথা। তখন আমাদের আরাম বলতে কিছুই ছিল না। কিন্তু কত আনন্দ ছিল বলো তো?

বিমলেন্দু উত্তর দেয় না। চুপ থাকে।

স্মিতা বলে, আজ কী মেনু?

টোম্যাটো স্যুপ, ব্রাউন ব্রেড, চিকেন রোস্ট উইথ মেশড পটাটো। আর রসগোল্লার পায়েস।

বাঃ। দারুণ। স্যুপটা কি ফ্রেশ টোম্যাটোর না নর-এর?

ফ্রেশ টোম্যাটোর। আমি যতদিন আছি, তোমার বিনি মাইনের কুক, ততদিন প্যাকেটের স্যুপে খাবে কেন তুমি?

যাই বল আর তাই বল, তোমার রান্নার হাতটা কিন্তু ক্রমশই ভালো হচ্ছে। না হলে যে চাকরি যাবে। খাব কী?

স্মিতা রেগে উঠে বলে, দ্যাখো সব সময়ে এক ইয়ার্কি ভালো লাগে না।

ইয়ার্কি?

ইয়ার্কি নয়?

এবারে জামাকাপড় ছেড়ে চানে যেতে হয়। বিমলেন্দু কোথায় গেল তাকে না বলে? কোনো নোটও রেখে যায়নি। ধীরে ধীরে অনেকেই বদলে যাচ্ছে ও। স্মিতা নিজেও কি বদলাচ্ছে না? বদলেছে? হয়তো। কিন্তু কিন্তু নিজের বদলটা নিজের চোখে পড়ে না তেমন করে। আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজের মুখটা একই রকম দেখায় নিজের চোখে।

স্মিতা বসার ঘরের সোফা ছেড়ে উঠে, দরজার ল্যাচটা খুলে দিল। বিমলেন্দু ফিরে এলে ওর ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে খুলে ঢুকবে। ল্যাচটা লাগানো থাকলে ঢুকতে পারবে না। তারপর সেন্ট্রাল এয়ারকন্ডিশনারটার সুইচ অন করে জামাকাপড় খুলতে বেডরুমে গেল। এয়ারকন্ডিশন একটা নয়, চারটে। Split Airconditioner। মেশিনগুলো সব বাইরে। যাতে শব্দ না হয় ভেতরে। তবে সুইচ একটাই। এ ছাড়াও প্রত্যেক বেডরুমে উইন্ডো-টাইপ মেশিনও আছে।

বাথরুমে ঢুকেই দেখল গিজারের সুইচটা অফ করা। রোজ বিমলেন্দু ওদের বেডরুমের গিজারেরর সুইচটা পাঁচটা নাগাদ 'অন' করে দেয়। সুইচটা অন করাই থাকে। অটো কাট-আউট আছে। লাল আলোটা জল গরম হলেই নিভে যায়। বাথটাব-এর কল খুললে তবেই আবার আলো জ্বলে ওঠে। গিজারের সুইচটা অফ করা আছে মানেই বিমলেন্দু অনেকক্ষণ হল বেরিয়েছে।

বেডরুমে যাওয়ার আগে একবার ড্রাইংরুমে গিয়ে কম্পিউটারটার ঢাকনি খুলে মাউসটা হাতে নিয়ে সামান্য সার্চ করে দেখল তার বাড়ির ই-মেইল-এ কোনো মেসেজ আছে কি না। হুস্টন থেকে মুন্নির ই-মেইল পাঠানোর কথা। একটি চাইনিজ ছেলের সঙ্গে তার এনগেজড হবার কথা গতকাল। ছেলেটির নাম চাং ওয়ান।

কম্পিউটারের কাছে গিয়েও কী ভেবে আবার বাথরুমেই ফিরে গেল। গিজারটা অন করে দিয়ে তারপর ফিরে এল। গরমের দিনে গরম জল না হলেও চান করা যায় কিন্তু অভ্যেস হয়ে গেছে। ড. চোপরা বলেছিলেন, ওর বাতের ধাত। সারা বছর গরম জলে চান করাই ভালো। তাই ...

কম্পিউটারের সামনে এসে সেটাকে খুলল। নাঃ কোনো মেইল নেই। একবার কিচেনে গিয়ে ফ্রিজটা খুলল। তরিতরকারি, ডিম, চিকেন, ল্যাম্বস লেগ, হ্যাম, বেকন, সসেজ-এ

ফ্রিজ ঠাসা। রেড মিট খেতে ডাক্তার চোপরা একেবারে মানা করেছেন দুজনকেই অথচ বিমলেন্দু রেড মিটই খাবে জেদ করে। ড. চোপরার কথা ও শোনে না, হাজরার মোড়ের এক হোমিয়োপ্যাথিকে দেখায়। বলে, গরিবের হোমিয়োপ্যাথিই ভালো। এক পাশে বিয়ারের বোতল। তার পাশে কাসুন্দির দুটি বড়ো বোতল। স্মিতা বলে যে, ইটালিয়ান মাস্টার্ড খাও। তা না, গড়িয়াহাট বাজার থেকে কাসুন্দিই কিনে নিয়ে আসবে। ব্রেকফাস্টে লিচু আর কালোজাম খাবে কাসুন্দি দিয়ে। সঙ্গে ডাবল ডিমের পোচ, সসেজ ও বেকনের সঙ্গে। দেদার কাসুন্দি ঢেলে। কিছুদিন হল লক্ষ করছে স্মিতা যে, ও যাই করতে বারণ করে বিমু ঠিক তাই করে। স্মিতাকে ডিফাই করার একটা চেষ্টা তো আছেই, চেষ্টাটা এগজিবিটও করে। সেটাই খারাপ লাগে স্মিতার।

দরজা খোলা ফ্রিজটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে স্মিতার মনে পড়ল বহুদিন ও নিজে হাতে ফ্রিজের দরজা খোলেনি। ভালো করেই দেখল ভিতরে, না, ধোঁকার ডালনা তো নেই।

কথাটা ছিল, শনি রবিবার ও ছুটির দিনে ও নিজেও দু-একপদ রান্না করবে কিন্তু সে কথা রাখা যায়নি। অভ্যেস একবার ছেড়ে গেলে তাকে ফিরিয়ে আনা বড়োই কঠিন। রান্না করার অবশ্য দরকার হয় না ছুটির দিনে। পার্টি তো লেগেই থাকে। তা ছাড়া, এখন কলকাতাতে খাওয়ার জায়গার অভাব? শুধু পকেটে টাকা অথবা ক্রেডিট কার্ড থাকলেই হল। ওবেরয় গ্রান্ডের থাই রেস্তোরাঁ, তাজ-এর চাইনিজ, নয়তো মেইনল্যান্ড চায়না, গুরুসদয় রোডে নতুন চাইনিজ রেস্তোরাঁ হয়েছে দ্যা বেস্ট ইন টাউন। এতদিন তাদের বার-লাইসেন্স ছিল না। এখন সেটাও পেয়েছে। তা ছাড়া ওটার মালিক নাকি এক বাঙালি — 'উজালা। চার বুঁদওয়ালার' যিনি মালিক, তিনিই। ফ্যানটাস্টিক। কে বলে বাঙালি ব্যাবসা করে না? 'মেইনল্যান্ড চায়না'-তে যখন খায় তখন কনজিউমার্স সারপ্লাসটা যেন বাঙালি মালিকানার কারণে অনেকখানি বেড়ে যায়।

ডাইনিং রুমের ঘড়িটাতে দেখল, সাড়ে সাতটা। ও প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট হল বাড়ি ফিরেছে। কী করে সময় যায়। এবারে সত্যিই একটু উদ্‌বিগ্ন হল স্মিতা বিমলেন্দুর জন্যে। সে কোথায় গেল সে জন্যে তো বটেই, ফ্রিজে রান্না করা কোনো খাবারই নেই যে, সে জন্যেও। ড্রাইভারকেও ছেড়ে দিয়েছে। নইলে, শরৎ বোস রোডের টুটু বসুর 'ট্যাংরা কাইজেন' থেকে কিছু চাইনিজ খাবার আনিয়ে নিতে পারত।

কিন্তু বিমু গেলটা কোথায়? চিরদিনের ইরেসপনসিবল লোক একটা। আক্কেল বলে কোনোদিনই কিছু ছিল না। এখন করে কী স্মিতা? এমন কখনও করেনি আগে বিমলেন্দু। চিন্তিত মুখে টেলিফোনের পাশের সোফাটাতে বসে প্রদ্যুম্নকে ডায়াল করল। ধরিত্রী ধরল। বলল, হাই স্মিতা। লং টাইম নো সি। গজদারের বাড়ির পার্টিতে যাচ্ছ তো আগামী শুক্রবারে। হোপ টু সি ইউ দেয়ার।

এখনও ঠিক নেই ধরিত্রী। একটা ব্যাপারে ফোন করছি এখন। বাই এনি চান্স বিমলেন্দু কি প্রদ্যুম্নর কাছে গেছে?

না তো! বিমলেন্দু তো গত ছ'মাসে একদিনও আসেনি, এমনকি একটা ফোনও করেনি। প্রদ্যুম্ন বলছিল, বিমলেন্দু নাকি ইংরেজিতে উপন্যাস লিখছে।

বুলশিট।

স্মিতা বলল। আকাশ-কুসুম অনেক কল্পনাই তো করল জীবনে, সত্যি সত্যি কোনটা আর করল। তারপর বলল, যে কোর্টশিপের সময়ও আমাকে একটা চিঠি লেখেনি সে লিখবে উপন্যাস! জিনিয়াস ইজ নাইনটি নাইন পার্সেন্ট পারসপিরেশন অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট ইন্সপিরেশন ধরিত্রী। মেহনত যে করতে না পারে, বা করতে না চায় তার কিছুই হয় না।

ইংরেজিতেই লিখুক কী বাংলাতে, লেখা কি অত সহজ কর্ম নাকি?

আই ডোন্নো।

তা হলে তোমাদের ওখানে যায়নি। প্রদ্যুম্নকে একবার জিজ্ঞেস করবে?

এই নাও কথা বলো।

হাই।

হাই।

বিমলেন্দু ইজ মিসিং।

লালবাজারে খবর দেব কি?

না, এখনও নয়, তবে ব্যাপারটা চিন্তার। এমন কোনোদিনও করে না। ফোন না করে একটা নোট না লিখে এমন নিরুদ্দেশ হওয়া, আনথিংকেবল।

যাই হোক, আমি বাড়িতেই আছি স্মিতা। দরকার হলে তো জানাবেই, বিমু বাড়ি ফিরলেও একটা ফোন করে আশ্বস্ত কোরো।

থ্যাংক ইউ প্রদ্যুম্ন।

আমি কি তোমার ওখানে চলে যাব?

প্রদ্যুম্ন বলল।

না না তার দরকার নেই। হলে, জানাব।

এই প্রদ্যুম্ন একজন ওভার-সেক্সড পুরুষ, বিমু যেমন আন্ডার-সেক্সড পুরুষ। আসলে সেক্সের ব্যাপারে মনটাই যে আসল এই সরল সত্যটা দুজনের একজনও বোঝে না। প্রদ্যুম্ন স্মিতাকে ফ্রেডরিক ফরসাইথ-এর 'দ্যা কাপলস' বইটি পড়তে দিয়েছিল। মানে, প্রেজেন্ট করেছিল ওর এক জন্মদিনে অনেক কিছু লিখে লিখে টিখে। বইটি ধীরেসুস্থে পড়ার পর স্মিথা বুঝেছিল কেন ওই বইটিই দিয়েছিল প্রদ্যুম্ন। পুরুষমাত্রই ছুকছুকে, পরের রান্নাঘরে ঢুকে হুলো বেড়ালের মতো ঢেকে-রাখা মাছ খেয়ে যেতে চায় চুরি

করে। সে সব অর্ডিনারি বেড়ালকে তাড়া দিলেই তারা জানলা গলে লাফিয়ে পালায় কিন্তু প্রদ্যুম্নর স্বভাবটা ছুকছুকে নয়। ওর স্বভাব ছেঁকা দেয়। গরম লোহার মতো ওর স্বভাব। ওকে শায়েস্তা করতে তাড়া দেওয়াই যথেষ্ট নয়, হাতুড়ির দরকার। হাতুড়ি খেয়েওছে সে একবার স্মিতার কাছে। পুরুষ জাতটার ওপরেই স্মিতার ঘেন্না ধরে গেছে। সেই প্রেক্ষিতে তার সঙ্গী বিমলেন্দু একেবারেই অন্যরকম। ভেরি রেসপেক্টেবল। ইন অল রেসপেক্টস। লিভ-টোগেদার করলে এমন পুরুষের সঙ্গেই করতে হয় যে মায়ের মতো তার নারীকে আগলে রাখে, কমলালেবুর পায়েস করে খাওয়ায়, আম-আইসক্রিম, চকোলেট স্যুফলে, যখনই আদর করতে বলে চেটেপুটে বিমলেন্দু আদর করে স্মিতাকে। স্মিতার সবরকম শারীরিক ও মানসিক সুখকে নির্বিঘ্ন করে। সে যে স্মিতার রোজগারে খায় সে জন্যে তার কিছুমাত্র কমপ্লেক্স নেই, ছিল না অন্তত এত বছর, কিছুদিন হল কী যে হচ্ছে।

এমন সময়ে ইন্টারকমটা বাজল।

বিমু এল কি?

পরক্ষণেই নিজেকে বলল, বিমু এলে নীচের সিকিউরিটি কাউন্টার থেকে ইন্টারকমে খবর দেবে কেন? সে তো নিজেই উঠে আসত।

রিসিভার তুলে বলল স্মিতা, গলার স্বরকে প্রয়োজনেরও বেশি গম্ভীর করে, ইয়েস।

মেমসাহেব, একজন এসেছেন একটা টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে। সঙ্গে সাহেবের চিঠি।

কোন সাহেবের? সেনসাহেবের?

হ্যাঁ মেমসাহেব। আমাদের সাহেবের। পাঠিয়ে দেব ওঁকে?

এক মুহূর্ত ভাবল স্মিতা, তারপর বলল, দিন, পাঠিয়ে দিন ওপরে। একটু পরে দরজার বেল বাজল। দরজা খুলতেই দেখল মলিন পোশাকের দীন চেহারার বছর ষোলো-সতেরোর একটি ছেলে টিফিন ক্যারিয়ার এবং একটি চিঠি নিয়ে দরজাতে দাঁড়িয়ে। ছেলেটি যে আলিপুরের এই ঝকঝক-তকতক মাল্টিস্টোরিড বাড়ির বৈভবে অত্যন্ত ক্লিষ্ট ও ভীত তা তার মুখ দেখেই বোঝা গেল। ওগুলি স্মিতার হাতে দিয়ে সে বলল, আমি যাই?

তুমি কে?

অত্যন্ত রূঢ়স্বরেই জিজ্ঞেস করল স্মিতা।

ছেলেটি বলল, চামেলি আমার দিদি হয়।

কে চামেলি? কোন চামেলি?

চেতলার চামেলি।

যে আমার ফ্ল্যাট ঝাড়পোঁছ করত, রান্না করত?

হ্যাঁ।

তার সঙ্গে সেন সাহেবের কী সম্পর্ক?

তা তো আমি জানি না। বিমুদা আপনাকে এই চিঠি আর টিফিন ক্যারিয়ারে করে ধোঁকার ডালনা পাঠিয়েছেন। দিদি সারাদিন ধরে বানিয়েছে।

বলেই বলল, আমি যাই এবারে?

টিফিন ক্যারিয়ারটা নিয়ে যাবে না? পরের জিনিস রাখি না আমি।

না, না, সে পরেই হবেখন। আমি এখন যাই।

স্মিতাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ছেলেটি দুড়দাড় করে সিঁড়ি বেয়েই চলে গেল দৌড়ে লিফট-এর অপেক্ষাতে না থেকে। আলিপুরের এই বারোতলা বাড়ি দেখে তার বোধহয় মাথা ঘুরে গেছিল। বাইরে থেকে দেখা এক, আর বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখা আর এক।

অপমানে, রাগে, ঘেন্নায় স্তম্ভিত হয়ে বসে পড়ল স্মিতা সোফার উপরে টিফিন ক্যারিয়াটাকে কিচেনে রেখে এসে।

টেলিফোনের পাশে খামে বন্ধ চিঠিটি বিমুর। তাতে কী আছে তা জানার এক তীব্র কৌতূহল হওয়া সত্ত্বেও চিঠিটা খোলার সাহস তার হল না তখুনি। চামেলির মুখটা মনে পড়ল। কালোর মধ্যে মিষ্টি মুখটি। লম্বা ছিপছিপে গড়ন। মাথা ভরা চুল। তাতে আবার গন্ধতেল মাখত। স্মিতা একদিন বলেছিল বিমুকে, 'ছুছুন্দরকি শরপর চামেলিকি তেল।' বিমু হেসেছিল। মেয়েটির চোখ দুটিও ভারী সুন্দর। বিমু চামেলি বহাল হওয়ার দিনই আড়ালে বলেছিল, এ যে বনলতা সেন। একে কোত্থেকে জোগাড় করলে?

সবসুদ্ধু বছর দেড়েক কাজ করেছিল চামেলি। নাস্তা, দুপুরের খাওয়া আর বিকলের চা খেত। রাতের রান্না করে দিয়ে চলে যেত। ক্লাস এইট-নাইন অবধি পড়েছিল চামেলি তারপর বাবা মারা যাওয়াতে আর পড়াশোনা করতে পারেনি। ভারী সভ্যভব্য ছিল। পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নও। মেয়ে ভদ্রঘরেরই, অবস্থা বিপর্যয়ে এমন কাজ নিতে বাধ্য হয়েছিল। মাইনেও নিত পনেরোশো টাকা। তবে ইট ওজ ওয়ার্থ। ওর ছোটো ভাইয়ের টাইফয়েড হওয়াতে ঘন ঘন কামাই করতে লেগেছিল বলেই হঠাৎই মেজাজ করে ছাড়িয়ে দিয়েছিল স্মিতা তাকে। বিমু কিছু বলেনি। তারপরে ভালো কাজের লোক আর পাওয়া যায়নি বলেই লোক আর রাখা হয়নি। বিমুই সব চালিয়ে নিত। চামেলি ফোনে এমনভাবে কথা বলত সকলের সঙ্গে যে সকলেই অবাক হয়ে যেত। ওরা বাড়িতে না থাকলে সুন্দর হস্তাক্ষরে ফোনের মেসেজ লিখে রাখত। সবই ভালো। কিন্তু বিমু! কী রুচি। পুরুষমাত্রই কি এরকম?

ফোনটা বাজল।

বিমু ফিরেছে? আমি কি যাব?

প্রদ্যুম্নর গলা।

একটু চুপ করে স্মিতা বলল, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ফিরেছে।

দাও তো রাসকেলটাকে। আই উইল গিভ হিম আ থ্রাংশিং।

স্মিতা বলল, চানে গেছে। কাল কোরো। আজ টায়ার্ডও আছে। যা হিউমিডিটি।

গেছিল কোথায়?

ওর এক বন্ধু মারা গেছে।

আই সি! তা বলে যেতে কী ছিল?

সেই তো ...। অস্ফুটে বলল, স্মিতা। ওকে তো জানই, ওইরকমই। তারপর আরও একটু চুপ করে বসে থেকে বিমলেন্দুর চিঠিটা খুলল ও।

স্মিতা মেমসাহেব,

কল্যাণীয়াসু,

ব্যাপারটা ঘটতই। আজ আর কাল। রাগ কোরো না। তুমি আমাকে যা খুশি তাই ভাবতে পার কিন্তু আমি জানি যে অন্যায় করিনি বরং তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছি। তোমার 'সঙ্গী' থেকে নামতে নামতে ক্রমশ আমি তোমার চাকরে পর্যবসিত হচ্ছিলাম। একজন চাকরের সঙ্গে থাকাটা তোমার মতো অ্যাকমপ্লিশড, অ্যাফ্লুয়েন্ট যুবতির পক্ষে আদৌ সম্মানের হত না। তুমি যখন গতকাল দুপুরে অফিস থেকে ফোন করে রীতিমতো অর্ডার করার ভঙ্গিতে আজ ধোঁকার ডালনা রাঁধতে বললে আমাকে তখনই আমি মনস্থির করেছিলাম যে আমাদের লিভ-টোগেদারের পালা এবারে শেষ করতে হবে। আশ্চর্য! কত সিদ্ধান্তর বীজই যে আমরা নিরন্তর বয়ে বেড়াই কিন্তু কোন মুহূর্তে যে সেই বীজ অঙ্কুরিত হবে তা আমরা নিজেরাই জানি না।

আগেকার দিনের মেয়েরা, যাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না, যেভাবে রোজগেরে স্বামীর আজ্ঞাবহন করে এসেছেন হাজার হাজার বছর ধরে, তাদের মর্মসহচরী এবং নর্মসহচরী হয়েছেন, তাঁদের সন্তান গর্ভে ধরেছেন, লালনপালন করেছেন হাসিমুখে কখনও একটুও হীনম্মন্যতা বোধ না করে, তেমন করে কোনো পুরুষ কোনো রোজগেরে নারীর সেবাদাস এখনও হতে পারে না। পারে না, কারণ, আমাদের রক্তে যে হাজার বছরের প্রভুত্ব রয়ে গেছে। It runs in the blood even today. এদেশীয় নারী স্বাধীনতার এই প্রথম অধ্যায়ে পুরুষের সেই বোধ পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারাটা হয়তো কোনো পুরুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। অন্তত আপাতত নয়। ভবিষ্যতে হয়তো অভ্যেস হয়ে যাবে। তোমার ভাষায়, 'অব্যেস'।

তা ছাড়া, তোমরা তোমাদের মধ্যে অনেকেই, তোমারই মতো, আর্থিক স্বাধীনতা নিয়ে ঠিক কী করবে, কেমন করে তা পুরোপুরি উপভোগ করবে তাও এখনও পুরোপুরি ঠিক করে উঠতে পারনি। 'নারী প্রগতি' মানেই যে জিনস পরা নয়, ক্রেডিট কার্ডে

সই করে যখনতখন যা তা কিনতে পারার স্বাধীনতা নয়, অফিসে কুড়ি-তিরিশ হাজারি পুরুষ অধস্তন কর্মীকে প্রছন্নভাবে হেয় করা নয়, চুল ছোটো করে ফেলা নয়, তেলকে বিসর্জন দিয়ে শ্যাম্পুকে মাথায় চড়ানো নয়, তোমাদের এই স্বাধীনতা এবং প্রগতির মূল যে অনেকেই গভীরে প্রোথিত তা বুঝতে পারার মতো সুবুদ্ধি এই হঠাৎ স্বাধীন হওয়া নব্যযুগের তোমরা হারিয়ে ফেলেছ।

চামেলিও কিন্তু অত্যন্ত স্বল্প-শিক্ষিত হলেও প্রগতিশীল নারী। এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীনও। তার অত্যন্ত কষ্টার্জিত অর্থ, (যদিও তার পুরো মাসের রোজগার তোমার দু ঘণ্টার রোজগারের সমান) তার বৃদ্ধা মায়ের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার মেধাবী ভাইয়ের পড়াশোনার জন্যে খরচ করে সে। নিজের জন্যে প্রায় বিন্দুমাত্রই না রেখে। এই 'করাটা' ও এক ধরনের স্বাধীনতাবোধ থেকেই সে করে। কে কী করে, কেমন করে করে, তার চেয়েও বড়ো কথা সেই করার পেছনে স্বাধীনতা থাকে কি না!

ওর রোজগারটা আসে কোথা থেকে জান? তোমার বাবা, শ্রীশকাকুর কাছ থেকে। কাকিমা মারা যাওয়ার পর থেকেই তো উনি একা। তুমি তো কলকাতাতে বাস করেও তাঁর জন্যে কিছু কর না ও করনি। বলেছ, 'দ্যাট ম্যান হ্যাজ নট ডান এনিথিং ফর মি হোয়াই শুড আই কেয়ার ফর হিম।'

স্মিতা, কিছু মনে কোরো না, যদি আমি বলি যে, তোমরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েই ব্যাবসাদার হয়ে গেছে। অনেক এন আর আই এরই মতো। 'আমি সর্বস্ব'। 'গিভ অ্যান্ড টেক' ছাড়া তোমাদের মধ্যে অনেকেই আর কিছুই বোঝ না।

তুমি শ্রীশকাকুকে কতবার গাড়ি পাঠিয়েছ তোমার সঙ্গে এসে ডে-স্পেন্ড করার জন্যে, কিন্তু উনি একবারও আসেননি। তোমার মতো স্টেটাস সচেতন মানুষের পক্ষে চেতলার ওই গলির মধ্যে বস্তির পাশের একতলা বাড়িতে গিয়ে বাবার সঙ্গে সারাদিন কাটানোও সম্ভব হয়নি। তোমার একমাত্র দাদা শোভন, অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে তার অস্ট্রেলিয়ান স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে সেটলড। সেও তো লেখে আমাকে, তার দেশ বলে কিছু নেই। কোনো পিছুটান নেই। আর কলকাতাতে থেকেও তোমারও নেই। তোমরা সবাই rootless হয়ে গেছ। তোমরা সবাই floatsome।

চামেলিকে তুমি ছাড়িয়ে দেবার পর ওর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আমার ছিল না। ওর ঠিকানাও আমার কাছে ছিল না। ওকে ভালো লাগত আমার কিন্তু তোমার সঙ্গে লিভ- টোগেদার করি যে-আমি তার চামেলির প্রতি অন্য কোনো ইন্টারেস্ট ডেভেলপ করেনি। সত্যি বলছি। আদৌ করেনি। ফুল ভালো লাগলেই কি তা ছিঁড়ে এনে ফুলদানিতে তোলা যায়? না তুললেও তা বাঁচে। কিন্তু শ্রীশকাকুর খোঁজখবর আমি নিয়মিত নিতাম। তোমার বাবা বলে তো বটেই তা ছাড়া ওঁকে আমি বাবার বন্ধু হিসেবেও পছন্দ করতাম বলেও। মাস তিনেক আগে একদিন দুপুরবেলা ওঁকে দেখতে গিয়ে চামেলিকে সেখানে

হঠাই দেখি। শ্রীশকাকু বলেন, আমার আর কোনো দুঃখ নেই বিমু, চামেলি আমার ছেলে ও মেয়ের অভাব পূরণ করেছে। কী বা দিতে পারি আমি ওকে। পেনশনে ক-টা টাকাই বা পাই। কিন্তু ও যা করে আমার জন্যে তা বলার নয়। ফুল কিনে এনে ঘর সাজায়, তোমার কাকিমার ফোটোতে ফুলের মালা পরায় রোজ সকালে। যা আমার ছেলেমেয়েরা কখনও করেনি। হাতের রান্নার তো কোনো তুলনাই নেই। ব্যবহার তো অত্যন্তই রেসপেক্টেবল। পাশের দুটো ঘর খালি হবে চাটুজ্যেমশায় তাঁর মেয়ে জামাই-এর কাছে চলে যাবেন। এলাহাবাদে। সেখানেই কাটাবেন মেয়ে-জামাই-এর আন্তরিক আমন্ত্রণে। ওই দুটো ঘর পেয়ে গেলে, আমি বলেছি, চামেলি ওর মা ও ভাইকে নিয়ে এখানেই চলে আসবে বস্তির ঘর ছেড়ে দিয়ে। ওর মতো সম্ভ্রান্ত মেয়ের পক্ষে ওই বস্তি পরিবেশে থাকা মুশকিল অথচ বস্তির সববয়সি মানুষই 'চামেলিদি' বলতে অজ্ঞান। বুঝলে বিমু, কিছু কিছু ফুল থাকে, যা সবরকম জমিতেই সমান সৌন্দর্যে ফোটে। তা মরুভূমিই হোক কী তুষারাঞ্চল।

শোনো স্মিতা, চামেলির প্রশস্তি করার জন্যে এই চিঠি লেখা নয়। চামেলি আজ ধোঁকার ডালনা করেছিল শ্রীশকাকুর জন্যে। ডাল আরও বাটা ছিল, আমিই বললাম। তোমার জন্যে আবার করতে। তুমি গতকাল খেতে চেয়েছিলে।

তোমার কুশল জিজ্ঞেস করেছে চামেলি সব সময়ই গত তিনমাসে। তুমি যে ওকে ওর বিপদের কথা না বুঝেই নিষ্ঠুরভাবে ছাড়িয়ে দিয়েছিলে সে জন্যে ওর মনে কোনো অভিযোগও আছে বলে লক্ষ করিনি। ভাবটা এমন, 'আবার ডাকিলেই যাইব।' কিন্তু ও চাইলেও শ্রীশকাকু, তোমার পিতৃদেব, তাকে 'কচ্ছপের কামড়ে' ধরেছেন। তোমার কাছে আপমানে অসম্মানে কাজ করার জন্যে চামেলিকে তিনি ছাড়বেন না। চামেলির জন্যে তিনি একটা সৎপাত্রও খুঁজছেন। গত তিনমাস ধরেই শুনছি। যদিও ও বয়সে আমার চেয়ে প্রায় এগারো বারো বছরের ছোটো তবু তোমার পিতৃদেব শ্রীশকাকুর মতে সেটাই নাকি বিয়ের পক্ষে 'আইডিয়াল ডিফারেন্স'। কাকিমা মানে, তোমার মা আর শ্রীশকাকুর মধ্যে নাকি ওইরকম ডিফারেন্সই ছিল। অ্যান্ড দে মেড আ ভেরি হ্যাপি কাপল।

বিবাহযোগ্য চামেলির পাত্র হিসেবে অ্যাপ্লাই করে কি খারাপ করলাম স্মিতা? লিভ-টোগেদার আর বিয়ে তো এক নয়। লাভ তো আমারই। আমিই তো শিশুবধ করলাম। তা ছাড়া, চামেলির সঙ্গে অন্যভাবে মিশে বুঝতে পারছি যে আমার মধ্যে একজন প্যাট্রিয়ার্ক -এর রক্ত বইছে। ম্যাট্রিয়ার্কাল সোসাইটিতে সামিল হতে আমার আরও দু-চার মানব জন্ম লাগবে।

সরি! আজ রাতে তোমাকে পেটে কিল দিয়ে শুয়ে পড়তে হবে কিন্তু তোমার চিঠি লেখার টেবলের ওপর 'বাল্টি আন্টিজ' কিচেনের ফোন নাম্বার আছে। আগামীকাল থেকে

ওদের বললে তুমি যেমন চাইবে তেমন ডিনার এবং ছুটির দিনেও লাঞ্চ ওঁরা হটকেস-এ করে পাঠিয়ে দেবেন, থাই, চাইনিজ, কন্টিনেন্টাল, ইন্ডিয়ান সব। আজ চান করে উঠে, ব্রাউন ব্রেড আছে, ব্রাউন ব্রেড দিয়ে ধোঁকা খেয়ে গোটা চারেক ব্লাডিমেরি, ওঃ তাও তো বানিয়ে দিতাম ছাই আমিই। তোমার বারম্যান না থাকলে তো বানাবেই বা কে? তার চেয়ে অ্যাংগুস্টুরা বিটার্স দিয়ে পিংক জিন বানিয়ে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো। জানতেও পারবে না কখন রাত পোয়াল। মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে একটু কান্না কান্না ভাব জাগতে পারে। জাগলে, আর একটা বড়ো জিন মেরে দেবে।

কোনোদিনও বলিনি, আজ বলি যে, আমিও অনেকদিন অনেক রাত কেঁদেছি যখন আমার আত্মসম্মান আমাকে চিমটি কেটেছে, কিন্তু তোমাকে কখনও জানতে দিইনি। ড্রইংরুমে গিয়ে বারান্দার দরজা খুলে তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে কেঁদেছি, এক হতভাগা পুরুষ।

নামি-দামি জিনিসের মুখ আর দেখা হবে না। খাওয়া হবে না গ্রান্ড-এ বা 'জারাংগা'-এও, তবে শ্রীশকাকুর বন্ধু, তোমার কর্নেল গোপেনকাকু আর্মি থেকে রিটায়ার করলেও আর্মির রাম পান সস্তায়। দু বন্ধুতে রোজ সন্ধেতে বসে খান আর টিভিতে ডিসকভারি চ্যানেল দেখেন। তাঁদের প্রসাদ পেলেই চলে যাবে। তবে এখন তো আমার নতুন দায়িত্ব-কর্তব্য হল, শ্রীশকাকুর দেখাশোনা। তা ছাড়া চামেলিকেও সুখে রাখতে হবে তো! তাই লেখালেখিতে মন দিতে হবে।

তোমার কীসের অভাব? তোমার কত পুরুষ আছে। মাসে দু লাখ মাইনে পাওয়া অনূঢ়া সুন্দরীর কোনো অভাব কী থাকতে পারে? ইচ্ছে করলেই ফুল ফুটবে। শুধু ইচ্ছে হওয়ার অপেক্ষা। আমার মতো অপদার্থ তোমার জীবন থেকে বিদেয় হয়েছে তো আপদ গেছে।

তুমি তো সন্তান চাওনি কখনই। বলতে, মাদার টেরিজার হোমের কাছ থেকে বাচ্চা অ্যাডাপ্ট করবে। মা হওয়ার কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাবে না তুমি। আমি কিন্তু চাই। ছেলেবেলা থেকেই চেয়েছি। চামেলিও চায়। আমাদের বেশ দুটো গাবলুগুবলু বাচ্চা হবে। তাকে তো মন্ট গ্রেস বা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল বা লা মার্টস বা সেইন্ট জেভিয়ার্স বা লরেটোতে ভরতি করাবার ঝামেলা করব না আমরা। পড়াব বাংলা মিডিয়াম স্কুলে। তারা বাংলা সাহিত্য পড়াবে। সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, শরদিন্দু, শীর্ষেন্দু। বাংলা গান শুনবে, কীর্তন, পুরাতনী, রবীন্দ্রসংগীত। একেবারে সাদামাটা বাঙালি করে মানুষ করব তাকে, যাতে সে তোমার বা তোমার দাদার মতো 'কৃতী' না হয়ে ওঠে।

আমরা যখন বুড়ো হব, মানে, আমি আর চামেলি, তখন সে আর তার বউ আমাদের দেখবে। আমাদের জীবনে আরাম বেশি থাকবে না অর্থের অভাবে, মানে অর্থ খুবই কম থাকবে, তবু অর্থের লোভ না থাকাতে আনন্দ থাকবে প্রচুর। আমার বা আমার

স্ত্রীর বা আমার ছেলেমেয়ের জীবনকে জীবিকা পুরোপুরি গিলে ফেলবে না, তোমাদের জীবনকে যেমন গিলে খেয়েছে। আমরা উপরে তাকাব না, নীচে তাকিয়ে আনন্দে থাকব। সকলেরই যে সব কিছু থাকতে হবেই তার কী মানে আছে।

প্রার্থনা কোরো স্মিতা। আমরা দুজনে যেন সুখী হই।

আজ বড়ো হিউমিডিটি। লিখতে লিখতে হাতের ঘামের চিঠি ভিজে যাচ্ছে। তবু, আমার এই সিদ্ধান্তের কথা তোমাকে জানানো তো আমার কর্তব্য।

ভালো থেকো। ধোঁকার ডালনাটা খেয়ো।